অদ্রীশ বর্ধন

সময়-গাড়ী

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৭২

প্রকাশক : ময়ূখ বসু, গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭
মুদ্রক: অ. বর্ধন, দীপ্তি প্রিণ্টার্স, ৪ রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলিকাতা ১
প্রচ্ছদ : আলোক দাশগুপ্ত □ অলংকরণ : ধ্রুব রায়

কে এই

প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র ?

হ্যাঁ

নামের যা ছিরি !

হাসি তো পাবেই !

কিন্তু

তাঁর কর্মকাণ্ড ?

পিলে চমকে দ্যায় !

আত্মভোলা

সরল, ফোক্‌লা বৈজ্ঞানিক....

অথচ

তাঁর

ব্রেনখানাকে ভয় পায়

অন্য গ্রহের আগন্তুকরাও !

বিজ্ঞান তাঁর কাছে খেলা,

আবিষ্কার করেই আনন্দ...

সেই সঙ্গে

পদে লোমহর্ষক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার

আশ্চর্য এই মানুষের

সুদীর্ঘতম অ্যাডভেঞ্চার

লেখা হল এই প্রথম !

সময়-গাড়ী

অদ্রীশ বর্ধন



প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র ! আধুনিক টাইম-মেশিন ! গ্রহে-গ্রহান্তরে অ্যাডভেঞ্চার ! ভিন্‌গ্রহীর দ্বারা ব্রেন-আক্রমণ ! পৃথিবীর ও সৌরজগতের অতীত ও ভবিষ্যৎ ! রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী ! বায়োলজির বিস্ময় ক্লোনিং মির‍্যাক্‌ল্‌ ! আসল প্রফেসরের 'ডবল' অভিযান চালাচ্ছেন অণু আকারে নিজের শরীরের মধ্যেই ! কল্পবিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য মজাদার উপন্যাস !

১ ॥ কল্পতরু

আমার এই ছোট্ট জীবনে অনেক দেখলাম, অনেক শিখলাম, অনেক ঘুরলাম। এই পৃথিবী নামক গ্রহটার ওপরে বহু চক্কর দিয়েছি, বহু দেশ দেখেছি, বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। বহু বিস্ময়, বহু বিচিত্র বিষয় প্রত্যক্ষ করেছি, মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত করেছি, তারই কিছু কিছু পরিবেশন করেছি ছোট্ট পাঠক পাঠিকাদের যারা বিস্মিত হতে জানে, অবাক পৃথিবীর অবাক ব্যাপার জেনে অবাক হতে পারে। অবিশ্বাস করে না। কেন না তারা জানে, শুধু তারাই জানে, পৃথিবীতে অবিশ্বাস্য কিছু নেই। সব সম্ভব, সব সম্ভব, সব সম্ভব।

আমার এই অসম্ভব অবিশ্বাস্য কাহিনীও লিখছি শুধু তাদের জন্যে। বিশ্বাসের যষ্টি উঁচিয়ে যারা এক পায়ে খাড়া, তাদের হাতে লগুড়াঘাত খাওয়ার বাসনা আমার নেই। আমি যে দেখেছি, এ পৃথিবীতে আজ যা অবিশ্বাস্য, কাল তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে, আজ যা অসম্ভব, কাল তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। এই বিচিত্র কাহিনীও তাই উৎসর্গ করছি আমার মতই মনের আর বিশ্বাসের মানুষদের উদ্দেশে—ছোট্ট মানুষরা অন্তত: তাচ্ছিল্যের বঙ্কিম হাস্য দিয়ে বিদ্ধ করবে না আমাকে, ব্যঙ্গের বিদ্রূপ-বাণে জর্জরিত করবে না আমার বহুদর্শী সত্তাটাকে।

অনেক দেখেছি বলেই আজ আমি জেনেছি, এই পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা প্রদীপের মত। তেল থাকে, সলতে থাকে, কিন্তু নিজে থেকে বিরামবিহীনভাবে কখনো জ্বলে যেতে পারেন না। মাঝে মাঝে কাঠি দিয়ে উসকে দিতে হয়। প্রদীপ তখন আবার প্রোজ্জ্বল হয়।

প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র হলেন সেই জাতীয় পুরুষ। বিপুল প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতিতে নির্ভরশীল শিশুর মতনই। সুবিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো কথা বলতে শিখেই কেবল 'পেন্সিল-পেন্সিল' করে চেঁচাতেন।* এই পেন্সিলকে সম্বল করেই উত্তর জীবনে তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন। খোঁজ নিলে হয়ত জানা যাবে শৈশবে প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রও 'ল্যাব-ল্যাব' করে চেঁচিয়েছিলেন। কেন না, এই ল্যাবোরেটরীকেই ধ্যান ধারণা করে তিনি আজ জগদ্বিখ্যাত। অন্তত:

---

*ওঁর প্রথম কথা ছিল piz, piz ; এটি স্পেনীয় ভাষায় lapizয়ের ভাঙ্গা অংশ। কথাটির অর্থ পেন্সিল।

ছোটদের কাছে—তাদের কাছেই তো প্রফেসরের কীর্তিকলাপ বারবার পেঁছে দিয়েছি।

তিনি বড় বৈজ্ঞানিক নিঃসন্দেহে। তাঁর মস্তিষ্কের গ্রে-ম্যাটারের ওজন নিলেও স্তম্ভিত হতে হবে অবশ্যই। আইনস্টাইনের মস্তিষ্ক সংরক্ষিত হয়েছে যখন, তাঁর মস্তিষ্কও একদিন না একদিন আরকে ভিজিয়ে রেখে দেওয়া হবে মহত্তর গবেষণার জন্য।

কিন্তু এত ধীশক্তি নিয়েও তিনি কখনো কখনো নিড়বিড়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে উস্‌কে দেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং এই কর্মটি করতে হয় আমাকে। আমি, শ্রীহীন দীননাথ, মাঝে মধ্যে তাঁর পশ্চাতে লাগি, সূক্ষ্ম বাক্যবাণে বিদ্ধ করি, কথার শরজালে নাস্তানাবুদ করি, প্রফেসর উত্তপ্ত হন, আমাকে বিবিধ অপ্রীতিকর বিশেষণে ভূষিত করেন। কিন্তু কাজ হয়। তাঁর ধীশক্তি নতুন তেজে আবার বিচ্ছুরিত হয়, প্রসাদ পায় বিশ্বের মানব। নতুন আবিষ্কার, নতুন অ্যাডভেঞ্চার, নতুন কীর্তিকলাপের সন্ধান পায় আমার ছোট্ট বন্ধুরা।

গত নভেম্বরে একটি কল্পবিজ্ঞানের শারদীয় সংখ্যায় এইচ. জি, ওয়েলস লিখিত অমর কাহিনী 'টাইম মেশিন' অনূদিত হয়েছিল। পত্রিকাটি একদল পাগল দ্বারা পরিচালিত হয়। পাগল অর্থে বিকৃত মস্তিষ্ক নয়—কল্পবিজ্ঞান পাগল। বলাবাহুল্য, আমিও সেই পাগলদের অন্যতম। তাই 'টাইম মেশিন' কাহিনীটা গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করেছিলাম।

করবার পর আমার মাথা ঘুরে গেল। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ পাড়ি দেওয়ার মত মেশিন নির্মাণ সম্ভব তাহলে? কল্পনায় যা সম্ভব হয়, বাস্তবে তা সম্ভব হবে না কেন? কেন সময়ের পথে পাড়ি দিয়ে ঘুরে আসা যাবে না বিস্মৃত অতীতে, অথবা অজ্ঞাত ভবিষ্যতে?

স্বর্গের কল্পতরুর নাম শুনেছি—চোখে কখনো দেখিনি। কল্পান্ত স্থায়ী এই তরু উত্থিত হয়েছিল সমুদ্রমন্থন থেকে—সমুদ্রগর্ভেই নিমজ্জিত হয় কল্পান্ত হলে। এই জন্যেই এর নাম কল্পতরু। অভীষ্টদায়ক এই বৃক্ষের কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তা বিফলে যায় না—কল্পতরু বাঞ্ছাপূরণ করে—অভীষ্ট লাভ হয়।

স্বর্গের কল্পতরু না দেখলেও, বসুমতীর কোলে লালিত এক কল্পতরুর সন্ধান আমি জানি। মহীরুহ তিনি নন—মানুষ। কিন্তু মহীরুহের

মতই বিশাল, উদার এবং বিস্ময়কর। তাঁর নাম প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র।

স্থির করলাম, কল্পতরু হেন এই অতিমানুষটির কাছেই হাত পাতা যাক। বড়ই কৃপণ এবং অলস মানুষ তিনি। ভিক্ষা দেন না—অনুরোধ রাখবার জন্যে সক্রিয় হতেও চান না। অতএব তাঁকে উদ্দীপ্ত করতে হবে।

তাই কল্পবিজ্ঞানের শারদীয় সংখ্যাটি হাতে নিয়ে হানা দিলাম তাঁর বীক্ষণাগারে।

যা ভেবেছিলাম, গিয়ে ঠিক তাই দেখলাম। ইজিচেয়ারে শুয়ে একটি আমেরিকান পত্রিকা বুকের ওপর রেখে ঘুমোচ্ছেন। বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা।

এতই অলস যে কয়েকদিন ক্ষৌরকর্ম করার প্রবৃত্তিও হয়নি। কর্কশ দাড়িগোঁফে গাল ছেয়ে গেছে। হাঁ করে ঘুমোনোর ফলে কষ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে পাঞ্জাবীতে। দন্তহীন মাড়ির শোভা তাতে প্রকটতর হয়েছে। তোবড়ানো গণ্ডদুটো অবশ্য স্পষ্টতর হয়নি অযত্নবর্ধিত আগাছার দৌলতে। দেখে মায়া হল। কর্মহীনতার অস্থিরতা কাটাতে শার্লক হোমস মর্ফিন ইঞ্জেকশন নিতেন—এই মানুষটি নিজেকে সেই সব মুহূর্তে নিক্ষেপ করেন নিদ্রার নিস্তল গহ্বরে।

আমি তাঁকে সেই গহ্বর থেকে টেনে তুললাম। তারপর কি কৌশলে কথার মারপ্যাঁচে সরল মানুষটাকে ক্ষিপ্ত করলাম, সেই কাহিনী বিন্যাস করে সুদীর্ঘ এই কাহিনীকে সুদীর্ঘতর করতে চাই না। সংক্ষেপে বলি, পরিশেষে তিনি আমাকে 'ইডিয়ট', মূর্খ', 'গবেট' ইত্যাদি বহুপ্রকার দিশি-বিদিশী বাক্যালংকারে সুসজ্জিত করে বীক্ষণাগার থেকে ঠেলে বার করে দিয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

টাইম মেশিনের আবির্ভাব ঘটল তার পরেই।

২ ।। অদ্ভুত যন্ত্র

"দীননাথ, খামটা খোলো।"

একটা লেফাপা এগিয়ে দিলেন প্রফেসর। বড় আকারের খাম এবং বেশ ভারী। মুখটা খোলাই ছিল। ভেতর থেকে টেনে বার করলাম চারটে ফটোগ্রাফ। প্রথমটা একটা ছেলের। দ্বিতীয়টায় দেখা গেল তার বয়স আরো বেড়েছে। তৃতীয়টায় সে প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। চতুর্থটা প্রৌঢ় বয়সের ছবি। একই ব্যক্তির চার বয়সের চারটে ছবি।

তা সত্ত্বেও প্রশ্ন করলাম—"এক জনেরই ছবি মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ," বললেন প্রফেসর। "আমার এক বন্ধু পুত্রের ছবি। চার বয়েসের চারখানা ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরার সামনে বসতে আপত্তি করেনি ছেলেমানুষ বলেই।"

ছবি চারটে নাড়াচাড়া করতে করতে বললাম—"কিন্তু চারখানা ছবিই দেখছি সদ্য তোলা। ছেলেবেলার ছবির কোয়ালিটি তো খারাপ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

"তা ছিল।"

"কিন্তু তা তো হয়নি। কেন?"

"কেন না. চারখানা ছবিই তোলা হয়েছে আধঘন্টার মধ্যে।"

"চার বয়েসের ছবি আধঘন্টার মধ্যে? ছেলেটা কি আধঘন্টার মধ্যে যুবক হয়ে প্রৌঢ় হয়ে গেল?,"

"তা গেল।" গম্ভীর ভাবে বললেন প্রফেসর। মুখে পরিহাসের বাষ্পটুকুও নেই। আমি বিমূঢ় চোখে কেবল চেয়ে রইলাম।

আমার মুখভাব নিরীক্ষণ করে মৃদু হাস্য করলেন প্রফেসর, ঠিক এই ধরনের নিগূঢ় হাস্যভাব লক্ষ্য করেছিলাম আজ যখন উনি আমাকে তাঁর এই নতুন বীক্ষণাগারে ট্যাক্সিতে চড়িয়ে নিয়ে আসেন। জায়গাটা সল্ট লেকের সেকটর্ চারে। ঝিলমিলের পূবে—চারপাশে ঝিল—মাঝখানে একটা দ্বীপ। নৌকোয় চাপিয়ে দ্বীপে এনেছেন মুখে একটিও বাক্য উচ্চারণ না করে। প্রায় একতলা সমান উঁচু শরবন দুলছে হাওয়ায় দ্বীপের চারদিকে। আর রয়েছে বিস্তর গাছ। তাই বাইরে থেকে বোঝা যায়নি ভেতরের কাণ্ডকারখানা। গাছ আর শরবনের মধ্যে দিয়ে সঙ্কীর্ণ পায়ে চলা পথ মাড়িয়ে দ্বীপের মাঝামাঝি জায়গায় আসতেই দেখেছিলাম একটা বিশাল কাঁচের গম্বুজ-গৃহ—অনেকটা মান-মন্দিরের মত। পরে জেনেছিলাম সেটা কাঁচ নয়—কাঁচের মতই স্বচ্ছ কিন্তু অভঙ্গুর প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ।

আঙুল তুলে প্রফেসর বলেছিলেন—"এই আমার নতুন খেলাঘর।"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেছিলাম—"কবে করলেন এত কাণ্ড?"

উদাসীন ভাবে প্রফেসর বলেছিলেন—"প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রের অঙ্গুলি হেলনেই সব হয়ে যায় হে দীননাথ। আমি শুধু হুকুম দিয়েই খালাস।"

তা আর জানি না। এই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের দাপট যে সময় বিশেষে কত প্রচণ্ড হতে পারে, তার সাক্ষী তো আমি স্বয়ং। তখন আর তিনি অকর্মণ্য, অকেজো, অন্যমনস্ক নন। তখন আর তাঁকে সংসারানভিজ্ঞ উদাসীন বলে করে সাধ্য !

বললাম—"কিন্তু খাস কলকাতা ছেড়ে এই বিজন বিভুঁয়ে কেন ?"

"কারণ এখানে উঁকিঝুঁকি মারার কেউ নেই, উৎসুকদের উৎপাত নেই, সকাল সন্ধ্যায় পাখীর ডাক শোনা যায়, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের অজস্র রঙের খেলা দেখা যায়, আর—"একটু থেমে গাঢ় স্বরে বললেন—"আপন মনে বিজ্ঞান নিয়ে খেলা করা যায়।"

বলতে বলতে মুখচ্ছবি পালটে গেল বৃদ্ধের। শিশুর মতই সরল সহজ সুন্দর হয়ে উঠলেন যেন। খেলতে ভালবাসে শিশুরা। এই বৃদ্ধও ভালবাসেন খেলা—বিজ্ঞানের খেলা। তাঁর কাছে যা নিছক খেলা, অবসর বিনোদন এবং চিত্তরঞ্জন ছাড়া কিছুই নয়—বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে তা পরম বিস্ময়—সভ্যতাকে লম্ফ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পন্থা।

এ ঘটনার শুরু প্রফেসরকে টাইম-মেশিন নিয়ে খেপিয়ে দেওয়ার বেশ কয়েক মাস পরে। এই ক'টা মাস প্রফেসর নিপাত্তা হয়ে গেছিলেন বল-লেই চলে। তারপরেই আজকে বাড়ী বয়ে হাজির—ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই ছিল বাইরে। আমাকে একবস্ত্রে গাড়ীতে তুলে এনে ফেললেন এই মনোরম প্রাকৃতিক নিকুঞ্জে।

মুগ্ধ চোখে নীরবে প্রফেসরের পেছন পেছন প্রবেশ করেছিলাম তাঁর বিজ্ঞানের খেলাঘরে।

এবং, তারপরেই বিনা আড়ম্বরে লেফাপা ভর্তি চারখানা ফটোগ্রাফ আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

অনিমেষে আমার হতচকিত মুখভাব কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন প্রফেসর। তারপর যেন দয়া পরবশ হয়ে বললেন—"দীননাথ, বিজ্ঞানের ভাণ্ডার অসীম, তাকে সসীম করে তুলেছে কল্পনাহীন কিছু বৈজ্ঞানিক। কিন্তু আশ্চর্য কি জানো, কল্পনার মন-পবনে গা ভাসিয়ে দিতে যারা ভালবাসে, যারা কৌতূহলী মন নিয়ে বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্পের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে—তারাই আবার কখনো সখনো অন্ধ বৈজ্ঞানিকদের চক্ষু উন্মীলন করে ছাড়ে। যেমন

করেছো তুমি। টাইম মেশিনে আগ্রহ জাগ্রত করেছো আমার।"

টাইম মেশিন! মনটা চাঙা হয়ে উঠল আমার। প্রফেসর সস্নেহ চোখে নীরবে চেয়ে রইলেন আমার পানে। আমি কথা বললাম না।

উনি বললেন—"আজকাল বিজ্ঞান-শিক্ষা নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে। কিন্তু কেউ বুঝছে না, ছোটদের মনে বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসা জাগাতে হবে সর্বাগ্রে—তত্ত্বকথা পরে। অনুসন্ধিৎসা জাগলেই তারা প্রশ্ন করবে—বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা আপনিই জেনে নেবে। দীননাথ, তোমার টাইম-মেশিনের গল্প সেই উপকারটাই করেছে আমার—এই বুড়ো বয়েসেও আমার ইচ্ছে হয়েছিল টাইম-মেশিন বানাবো।"

"বানিয়েছেন?" আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না আমার পক্ষে।

প্রফেসর বোধহয় শুনতে পেলেন না। নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে বললেন—"টাইম-মেশিন নির্মাণ করতে গেলে আগে প্রয়োজন ফোর্থ ডাইমেনশন সম্পর্কে সম্যক ধারণা। সংক্ষেপে, যে কোনো আদত বস্তুর চারদিকে চার রকমের ব্যাপ্তি থাকতেই হবে। অর্থাৎ, দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ ছাড়াও থাকবে স্থায়িত্ব। প্রথম তিনটে স্থানের বা স্পেশের ওপর। চতুর্থটা হ'ল সময় বা টাইমের ওপর। প্রথম তিনটে মাত্রা বা ডাইমেনশনের সঙ্গে সমকোণে রয়েছে সময় মাত্রা বা ডাইমেনশন। সুতরাং সময়ের ওপর পর্যটন কোনো বস্তুর পক্ষে অসম্ভব নয়।"

হেঁট হয়ে ফটো চারটে হাতে নিয়ে ফের বললেন প্রফেসর—"দীননাথ, ফটোগুলোর কোয়ালিটি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টির জন্যে প্রশংসা জানাই। কিন্তু যা তুমি বুঝতে পারো নি, তা এবার ব্যাখ্যা করি। চারটে ফটোই ফোর্থ ডাইমেনশনের ক্রশ-সেকশন; অর্থাৎ, সময় মাত্রার সঙ্গে সমকোণে কাটা অংশ!"

ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হল না। অথবা আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করল না। মুখে তা প্রকাশ করলাম না। প্রফেসর একচোখে কৌতুকতরলিত হাসি, আর একচোখে অপার গাম্ভীর্য নিয়ে চেয়ে রইলেন আমার পানে।

তারপর মৃদু অস্ফুট স্বরে বললেন—"সময়···চির রহস্যময় সময়! কিন্তু এ রহস্য আর রহস্য নয় আমার কাছে। এই যে ছবিগুলো দেখছ, এগুলো এক ত্রিমাত্রিক ব্যক্তির দ্বি-মাত্রিক প্রতিমূর্তি। প্রত্যেকটা ছবিতেই তুমি উচ্চতা আর বিস্তার দেখতে পাচ্ছো, বেধ সম্বন্ধেও সামান্য আভাস

পাচ্ছো—কিন্তু চ্যাপ্টা প্রতিমূর্তির বেশী তা নয়—দ্বি-মাত্রিক কাগজের টুকরো ছাড়া আর কিছু নয়। শৈশব থেকে প্রৌঢ়বয়স পর্যন্ত সময়-পথে পর্যটনের কোনো আভাসও আলাদা করে ফুটে ওঠেনি কোনো ছবিতে। কিন্তু একত্র অবস্থায় ফোর্থ ডাইমেনশন সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজি ধারণা সৃষ্টি করছে। ঠিক কিনা ?"

আমার জবাবের অপেক্ষা না রেখে ছবি চারটে হাতে নিয়ে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন প্রফেসর। এ ঘর তাঁর বীক্ষণাগার নয়—গ্রন্থাগার। দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো একটা বুককেসের মাথার ওপর ফটো চারটে পাশাপাশি রেখে বললেন—"টাইম আর স্পেশ—সময় আর স্থান আদতে একই জিনিস—আলাদা করা যায় না। এই যে ঘরের মধ্যে হেঁটে এলাম মাত্র কয়েক ফুট, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সময়ের ওপর দিয়েও সরে এলাম কয়েক সেকেন্ড। কি বলতে চাই বুঝতে পারছো তো ?"

"একটা গতি আর একটা গতির পূরক ?" বললাম আমতা আমতা করে।

"এক্কেবারে ঠিক !" সোল্লাসে বললেন প্রফেসর। পরীক্ষায় ছেলে ফুল মার্ক পেলে বাবার যে রকম আনন্দ হয়, যেন সেই আনন্দে ফেটে পড়লেন। বললেন—"আমি এই দুটোকেই আলাদা করতে চেয়েছি। যাতে সময়-পথ থেকে সরে এসে স্থানের ওপর ঘুরে বেড়াতে পারি, আবার স্থান থেকে সরে গিয়ে সময়-পথে পর্যটন করতে পারি। এই নিয়েই খেলা করেছি অ্যাদ্দিন আমার এই নতুন খেলাঘরে। খেলাটা তোমাকে না দেখালে বুঝবে না।" বলেই, বেগে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন প্রফেসর।

আমার বুক দুর-দুর করতে লাগল। দূরে দড়াম করে দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ায় শব্দ শোনা গেল। সেকেন্ড কয়েক পরেই আবার শোনা গেল সেই শব্দ পরম্পরা। পরক্ষণেই বায়ু বেগে ঘরে প্রবেশ করলেন প্রফেসর। হাতে একটা কাঠের হোমিওপ্যাথিক বাক্স। বেশ বড় সাইজের। বাক্সটা রাখবার জায়গা খুঁজছেন দেখে আমি লাফিয়ে গিয়ে একটা তেপায়া তুলে এনে রাখলাম তাঁর সামনে! বাক্সটা তিনি ঠিক মাঝখানে রেখে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন সামনে। খড়ের আগুন যেমন দপ্ করে জ্বলে উঠেই ধপ্ করে নিভে যায়, চকিতে তাঁর চোখ মুখের উত্তেজনা অপসৃত হয়ে ফুটে উঠল নিবিড় প্রশান্তি।

সস্নেহে বাক্সটার দিকে চেয়ে থেকে বললেন—"দীননাথ, তাকাও এদিকে।"

বললাম—"হোমিওপ্যাথির চর্চা করছেন নাকি ?"

নিমেষে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল প্রফেসরের—"ননসেন্স ! ফালতু কথা একদম বলবে না ! তাকাও এদিকে।"

সুবোধ বালকের মত তাকালাম। বুড়োর মুখনাড়া মাঝে মাঝে মর্মবেদনার কারণ হয়ে ওঠে। এখন খুঁচোনো ঠিক হবে না। খেলায় তন্ময় তো !

"শুধু তাকিয়ে থাকো—হাত দিও না। অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্র।"

সন্তর্পণে খুললেন ডালাটা। ভেতরটা মখমলের মত নরম বস্তুর প্যাড দিয়ে মোড়া। মাঝখানে রয়েছে একটা ছোট্ট যন্ত্র। প্রথম দর্শনে মনে হল একটা ঘড়ির যন্ত্র।

৩ ॥ টাইম মেশিন

আধার থেকে অতি সন্তর্পণে বস্তুটাকে বার করলেন প্রফেসর। কোহিনুর হীরে হাতে পেলেও এত মমতা দিয়ে হাতে নিতেন কিনা সন্দেহ। আস্তে আস্তে রাখলেন টেবিলের ওপর।

আমি ঝুঁকে পড়লাম। খুব কাছ থেকে সঙ্কুচিত চোখে চেয়ে দেখলাম। জিনিসটার বেশীর ভাগ নির্মিত হয়েছে অদ্ভুত এক কৃস্ট্যাল পদার্থ দিয়ে। প্রত্যেকটা দানার মধ্যে যেন রামধনুর সাতরঙের ঝিকিমিকি দেখা যাচ্ছে। পলকে পলকে বহুবর্ণ ঠিকরে যাচ্ছে। আশ্চর্য এই কৃস্ট্যাল কখনো দেখিনি।

প্রথম দর্শনে যাকে মনে হয়েছিল ঘড়ি-যন্ত্র, তন্নিষ্ঠ হয়ে দেখতে গিয়ে দেখলাম, ধারণাটা ভুল। ঘড়ি-যন্ত্র মনে হওয়ার কারণ জিনিসটার অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারিকুরি—যা কেবলমাত্র ঘড়ি-যন্ত্রেই দেখা যায়। ছোট্ট ছোট্ট অংশগুলো নিখুঁত ভাবে অতিশয় নিপুণ হাতে পরস্পর সংলগ্ন—ধাতুর পার্টস্ আর বিচিত্র সেই কৃস্ট্যালের সমভিব্যাহার নিতান্তই অনুপম, অতুলনীয় এবং অকল্পনীয়। কি বিপুল নিষ্ঠা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং কারিগরি দক্ষতার দৌলতে অদ্ভুত এই যন্ত্রের সৃষ্টি, তা কল্পনা করেও বিস্ময়ে অভিভূত হলাম।

ধাতুগুলোকে কিন্তু ঠাহর করেও চিনতে পারলাম না। পুঁচকে

কয়েকটা রড মনে হল নিকেল দিয়ে তৈরী। কয়েকটা যন্ত্রাংশ খুব চক্ চকে ভাবে পালিশ করা পেতলের। দাঁতের মত খাঁজকাটা একটা চেকনাই-দেওয়া কগ-হুইলকে মনে হল ক্রোম বা রুপোয় নির্মিত। কিছু অংশ গড়া হয়েছে একটা সাদা বস্তু দিয়ে—খুব সম্ভব তা হাতীর দাঁত। তল-দেশটা শক্ত, আবলুষ কাঠের মত শক্ত কাঠের—কালো, পালিশ করা।

জিনিসটার বর্ণনা দেওয়া সহজ নয়। যেদিক থেকেই দেখি না কেন, অদ্ভুত কোয়ার্জের মত বস্তুগুলোর সাতরঙা ঝিকিমিকি চোখ ধাঁধিয়ে দিল আমার। পলকাটা দামী পাথরের মত বহুপল বিশিষ্ট দুজ্ঞেয় এই কৃস্ট্যাল বিভিন্ন কোণ থেকে রকমারি জলুস ছড়িয়ে এমন চক্ষুভ্রমের সৃষ্টি করল যে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলাম আমি।

উঠে দাঁড়ালাম। কয়েক পা পেছিয়ে গিয়ে তফাৎ থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে রইলাম। তখন কিন্তু আবার জিনিসটাকে ঘড়ি-যন্ত্র বলেই মনে হল।

তফাৎ শুধু কলকব্জার অসাধারণত্বে—এমন মুন্সিয়ানা বিশ্বের সুক্ষ্ম-তম ঘড়ি-যন্ত্রেও দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

"ভারী সুন্দর তো," বললাম মুগ্ধস্বরে।

"বালক," (প্রফেসর মাঝে মধ্যে থিয়েটারী ঢংয়ে আমাকে এমন সব নামে সম্বোধন করেন যেন আমি একটা দুগ্ধপোষ্য অপোগণ্ড)—"এই পৃথিবীর তুমিই অন্যতম প্রথম ব্যক্তি যার সৌভাগ্য হল ফোর্থ ডাইমেনশন-কে সম্ভবপর করে তোলার যন্ত্র প্রত্যক্ষ করার।"

"কাজ হবে এতে?" সংশয় জড়িত স্বরে বললাম আমি। "সত্যিই হবে?"

কি ভাগ্যিস ফোঁস করে উঠলেন না প্রফেসর আমার সংশয়াচ্ছন্ন কণ্ঠ-স্বর শুনে। নিমীলিত নয়নে অনুপম যন্ত্রটার দিকে চেয়ে স্বপ্নের ঘোরে যেন বললেন—"হবে কি হে, হয়েছে। টেস্ট করেছি, সাকসেসফুল হয়েছি। সময়-পথে এই ইঞ্জিনের সাহায্যেই এখন আমি পর্যটন করতে পারব। সামনে যাবো কি, পেছনে যাবো—সেটা অবশ্য নির্ভর করবে আমার ইচ্ছের ওপর।"

"হাতে কলমে দেখান না কেন," সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেললাম আমি।

উত্তর দিলেন না প্রফেসর। হেলান দিয়ে বসলেন চেয়ারে। সুচাগ্র

চোখে চেয়ে রইলেন ঝিকমিকে নক্ষত্রপুঞ্জের মত বিচিত্র যন্ত্রটার দিকে। আবিষ্ট চক্ষু। কি যেন ভাবছেন। কপাল কুঁচকে গেল চিন্তার আলোড়নে। পুরো পাঁচ মিনিট ঠিক এইভাবে চোখ কুঁচকে, কপাল কুঁচকে বসে রইলেন। জলজ্যান্ত একটা মানুষ যে তাঁর সামনে বসে কৌতূহলে ছটফট করছে, তার অস্তিত্বও যেন তিনি ভুলে গেলেন। শুধু ঐ যন্ত্র ছাড়া তাঁর চোখের সামনে থেকে বিশ্বসংসার যেন মুছে গেল। একবার ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে, খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখলেন বাহারি কলকব্জাগুলো—এমনভাবে দেখতে লাগলেন যেন বিশ্বকর্মা কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছেন না নিজের শিল্পসৃষ্টিতে—বার কয়েক ঘাড় নাড়লেন আপন মনে। ইচ্ছে হ'ল, জিজ্ঞেস করি—খুঁত ধরেছেন বুঝি? কিন্তু নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করার সাহস হল না। বিশ্বকর্মা নিমেষ মধ্যে বিশ্বামিত্র হয়ে ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম করে দিতেন আমায়—এমন সব অগ্নিবাক্য প্রয়োগ করবেন যে গায়ে ছ্যাঁকা পড়বেই। তাই নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করলাম। উনি কল-টাকে দু'হাতে আলতো করে ধরে তুলে ধরলেন চোখের সামনে। জানলার দিকে ফিরিয়ে ধরলেন। দিনের আলোয় আরো ঝলমলে দুষ্প্রাপ্য দুর্মূল্য রত্নসম মনে হল বিচিত্র যন্ত্রটাকে। এক হাতে রুপোর কগ-হুইলটা স্পর্শ করতে গিয়েও করলেন না, যেন দ্বিধায় পড়লেন। হাত সরিয়ে নিয়ে যন্ত্র নামিয়ে রাখলেন টেবিলের মাঝখানে। আবার চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসে ধ্যানমগ্ন চোখে তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলেন। যন্ত্রের সত্তার সাথে তাঁর সত্তা যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে মনে হল।

এইভাবে এবার কিন্তু বসে রইলেন ঝাড়া দশ মিনিট। উসখুসুনি শুরু হল আমার। কাঁহাতক দারু-পুত্তলির মত ঠায় বসে থাকা যায়। এই মুহূর্তে আমি তাঁর কাছে অবাঞ্ছিত কিনা, সে চিন্তাও ঘুর ঘুর করতে লাগল মনের মধ্যে।

শেষকালে উনি আবার ঝুঁকে বসলেন, যন্ত্রটা কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখলেন এবং উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন—"কিছু মনে কোরো না, দীননাথ। ছোট্ট একটা মডিফিকে-শনের আইডিয়া মাথায় এসেছে।"

"আমি এখন আসি তাহলে?"

"না, না, যাবে কেন? বোসো।"

কাঠের বাক্সটা দু'হাতে তুলে নিয়ে দ্রুতপথে নিষ্ক্রান্ত হলেন প্রফেসর। ডোর-ক্লোজার ফিট করা দরজা আপনা হতেই বন্ধ হয়ে গেল।

দীর্ঘ এতগুলো মিনিটের টেনশন্ বড় কম যায় নি। উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে বসেছিলাম এতক্ষণ। এবার এলিয়ে পড়লাম চেয়ারে। প্রফেসর চিরকালই ছিটগ্রস্ত মানুষ। প্রতিভাধর এবং ছিটগ্রস্ত শব্দদুটো সমার্থক মনে হয় এই কারণেই। কিন্তু আজকে তাঁর যে ধ্যানতন্ময় মূর্তি এবং স্থির-প্রতিজ্ঞ মুখচ্ছবি দেখলাম, তেমনটি কখনো দেখিনি। তাঁর যুক্তি-পরম্পরা এবং আচরণের মধ্যেও খাপছাড়া কিছু দেখলাম না—যা তাঁর বৈশিষ্ট্য।

প্রফেসর বাস্তবিকই আবিষ্কার করেছেন টাইম-মেশিন। এখন বাকী শুধু সময় পথে পর্যটন।

কিন্তু তার আর কত দেরী?

৪ ॥ রামায়ণের সাল তারিখ

অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। দীর্ঘক্ষণ হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হল না। মিনিট দশেকের মাথায় আস্তে আস্তে খুলে গেল দরজা। স্খলিত চরণে প্রবেশ করলেন প্রফেসর। চোখ মুখের আলো যেন নিভে গেছে।

সোজা হয়ে বসলাম। এই দশ মিনিটের মধ্যে এমন কি ঘটল যে এত মিইয়ে গেলেন প্রফেসর?

শুধোলাম—"কি হয়েছে?"

দু'হাত উল্টে মুখখানা করুণ করে প্রফেসর বললেন—"তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে জবর একটা আইডিয়া মাথায় এসেছিল। কিন্তু একটা জিনিসের জন্য কেবল কাজ আটকে যাচ্ছে।"

এই কাণ্ড! উদ্বেগ খানিকটা কমল আমার। একেবারেই শিশুপ্রকৃতি প্রফেসরের! শিশুর মতই সামান্য কারণে ভেঙে পড়েন।

সহজ গলায় বললাম—"কি জিনিস? বলুন আমাকে, এনে দিচ্ছি।"

জ্বল জ্বল করে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। জবাব দিলেন না।

আমি আবার বললাম—"বিশ্বাস করতে পারছেন না বুঝি?"

প্রফেসর মুখ টিপে বললেন—"সে কি কথা! বিশ্বাস করি বলেই তো বর্তমান পৃথিবীর কাউকে যা দেখাইনি, তোমাকে তা দেখালাম।"

টিপে টিপে আস্তে আস্তে কথাগুলো বলেছিলেন বলেই একটা শব্দ কানে লেগে রইল। 'বর্তমান' শব্দটা যেন একটু জোর দিয়েই উচ্চারণ

করলেন প্রফেসর। বর্তমান পৃথিবীর কাউকে যা দেখাননি, আমাকে তা দেখিয়েছেন—কথাটার মানে কী? অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের প্রশ্ন তুলছেন কেন?

তাই একটু বাজিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল। সহজভাবে বললাম—"অতীত বা ভবিষ্যতের অনেককেই নিশ্চয় দেখিয়ে এনেছেন?"

বারকয়েক চোখের পাতা ফেলে নিরীহ গলায় প্রফেসর বললেন—"ভবিষ্যতে যাবো বলেই তো প্ল্যান করছি—তোমায় নিয়ে যাবো। অতীতে দেখিয়েছি কয়েকজনকে।"

ভেতর ভেতর চমকে উঠলেও বাইরে তা প্রকাশ করলাম না। মুখখানা যদ্দুর সম্ভব স্বাভাবিক রেখে জিজ্ঞেস করলাম—"কাদের বলুন তো?"

কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—"যেমন ধরো রামকে।"

"রাম!"

"হ্যাঁ, হে, হ্যাঁ। শ্রীরামচন্দ্রকে।"

"রামায়ণের রামচন্দ্রকে?"

"আঁৎকে উঠলে কেন?"

অভিনয় আমার দ্বারা কস্মিনকালেও হয় না। তাই আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে বিষম চেঁচিয়ে বললাম—"আ-আপনি রামায়ণের যুগে বেড়িয়ে এসেছেন?"

এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন প্রফেসর। এবার বসলেন। আমার থর-থর কম্পিত মুখচ্ছবি দেখে সস্নেহে আমাকে হাতের ইসারায় বসতে আজ্ঞা করলেন। ধপ্ করে বসে পড়লাম চেয়ারে। উনি পিট পিট করে চেয়ে থেকে বললেন—"দীননাথ, অতীত দেখবার ইচ্ছে হলেই সবাই ডাইনোসরের যুগ দেখে আসতে চায়। বড় একঘেয়ে ইচ্ছে। আমার ইচ্ছে ছিল আমার দেশের প্রাচীন মহাকাব্যের যুগগুলোয় ঘুরে আসা। কিন্তু আন্দাজে তা সম্ভব নয়। সাল তারিখ না জানলে কি করে যাই বলো। তাই অ্যাসট্রো-ম্যাথমেটিকস্'য়ের শরণ নিলাম। পুণার ডাক্তার পি-ভি-ভার্তাকের নাম শুনেছো?"

ঘাড় নাড়লাম। জীবনে অমন অদ্ভুত নাম শুনিনি।

প্রফেসর বললেন—"খবরটা ইউ-এন-আই থেকে প্রথম বেরোয়।

ডাক্তার ভার্তাক নাকি অ্যাসট্রো-ম্যাথমেটিক্‌স্‌ নিয়ে গবেষণা করছেন। তার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। বললাম, রামায়ণ আর মহাভারতের ঘটনাগুলো কোন্‌ কোন্‌ তারিখে ঘটেছে, অংক কষে আমাকে বলে দিতে হবে।"

"বলে দিলেন?" প্রফেসর দম নেওয়ার জন্যে থামতেই আমি দম ছেড়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, দিলেন। সে এক লম্বা লিস্ট। ডাইরীতে লিখে রেখেছি। দু-একটা মনে আছে। শুনবে?"

"নিশ্চয়।"

"তার আগে একটা কথা বলে রাখি। কার্বন-ডেটিং পদ্ধতিতে প্রাচীন কালের মহাযুগগুলির সাল তারিখের সঠিকতা কিন্তু এখনো প্রমাণিত হয় নি। গ্রহ অবস্থান বিচার করে তা নির্ভুলভাবে বলা যায়। ডাক্তার ভার্তাক ১১ বছর ধরে গবেষণা করছিলেন এই সম্পর্কে। বিভিন্ন প্রাচ্য এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক সম্মেলনে আর কংগ্রেসে তিনি তাঁর গবেষণার ফলাফলও প্রকাশ করেছেন।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," অধীর কণ্ঠে বললাম আমি। "আগে বলুন রাম কবে জন্মেছিল?"

"মঙ্গলবারে। চৌঠা ডিসেম্বর। যিশুখৃষ্ট তখনো জন্মাননি। তাঁর জন্মের ৭৩২৩ বছর আগে।"

চোয়াল ঝুলে পড়ল আমার—"এত সঠিক ভাবে বলা কি যায়?"

অবাক হয়ে প্রফেসর বললেন—"সঠিক কি বেঠিক, আমি তার প্রমাণ। আমি দেখে এসেছি ঠিক ঐ তারিখেই শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম দৃশ্য।"

অবিশ্বাসী গলায় বললাম—"চোদ্দ বছরের বনবাসে গেল কবে?"

"বেস্পতিবার, খৃষ্টপূর্ব ৭৩০৬ সালের ২৯শে নভেম্বর তারিখে।"

"দশরথ মারা গেল কবে?"

"তার ঠিক ছ'দিন পরে—পাঁচুই ডিসেম্বরের বুধবারে।"

আমার তখন খাবি খাওয়ার অবস্থা। হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম—"মহাভারতের সাল তারিখও জানেন?"

"সব কি আর মনে আছে? বুড়ো বয়েসে ব্রেনের কোষগুলো মরে গিয়ে তো আর জন্মাচ্ছে না।"

"কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হয়েছিল কবে?"

একটু ভেবে নিয়ে প্রফেসর বললেন—"ষোলই অক্টোবর, রোববার। যিশুখৃষ্ট জন্মাবার ৫৫৬১ বছর আগে।" বলেই আমাকে আর প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে সাত তাড়াতাড়ি বললেন—"কিন্তু সাল তারিখের পরীক্ষা দিতে বসলে কাজের কথা যে শিকেয় উঠবে। ডাক্তার ভার্তাক ভুল করেন নি—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখে তবে আমি সেখান থেকে টাইম-মেশিন নিয়ে গেছিলাম দণ্ডকারণ্যে।"

"দণ্ডকারণ্যে কেন গেলেন ?"

"সেটা আর বলতে দিচ্ছ কই। দণ্ডকারণ্যে গিয়েই তো পেলাম বিশেষ সেই উদ্ভিদ যার নির্যাস থেকে কৃস্ট্যাল বানিয়ে প্ল্যান করেছি ভবিষ্যতে টহল দিয়ে আসবো।"

"গাছের নির্যাস থেকে টাইম-মেশিনের কৃস্ট্যাল ! বলছেন কী ?"

"গতকাল কাগজে পড়লাম, কলকাতার নেভী ফেস্টিভ্যালে এক ভদ্র-লোক দু-মিনিটে বত্রিশটা রসগোল্লা খেয়ে বিশ্ব-রেকর্ড করেছে। তোমার হাঁ-য়ের সাইজ দেখে মনে হচ্ছে, বিশ্ব-রেকর্ড এবার তুমিও ভঙ্গ করবে।"

টপ্ করে হাঁ বন্ধ করে বললাম—"দণ্ডকারণ্য কখনো যাইনি। দেখা-বেন আমাকে ?"

"আমিও তো তাই ভাবছিলাম। আর একটু নির্যাস ওখান থেকে জোগাড় করে আনতে হবে—নইলে আইডিয়া অনুসারে টাইম-মেশিনের মডিফিকেশন সম্ভব হবে না।"

মনে পড়ল, মুখখানা চুন করে ঘরে ঢুকেছিলেন প্রফেসর। সে কি দণ্ডকারণ্যে ফের গিয়ে নির্যাস আনবার কথা ভেবেই ?

জিজ্ঞেস করলাম। উনি কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন—"ধরেছো ঠিক। বর্তমান যুগের দণ্ডকারণ্যে সে গাছ আর নেই—কাঠুরেরা কেটে সাবাড় করেছে। আমাকে যেতে হবে রামায়ণের যুগে।"

"তা যান।"

আমতা আমতা করে প্রফেসর বললেন—"বড় বিপজ্জনক জায়গা হে। রাক্ষস রাক্ষসীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেখানে। গতবার প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। তাই ভাবছিলাম, এবার তোমায় নিয়ে যাবো।"

লাফিয়ে উঠলাম। পরক্ষণেই বসে পড়লাম।

"ঐ টুকু মেশিনে যাবো কি করে ?"

অবাক হলেন প্রফেসর—"ঐটুকু মেশিন মানে ?"

"কাঠের বাক্সের মধ্যে যে মেশিন দেখালেন—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রফেসর বললেন—"তুমি একটা আস্ত ইডিয়ট। ওটা তো মডেল। আসল টাইম-মেশিন পাশের ঘরে।"

ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে গিয়ে বললাম—"কোথায় ? কোথায় ?"

"এসো আমার সঙ্গে।"

৫ ।। স্থির বিদ্যুৎ

গ্রন্হাগার থেকে গেলাম গবেষণাগারে—সরু একটা গলি পথের শেষে। দূর থেকে যে কাঁচের গম্বুজ ঘরটা দেখে চোখ কপালে তুলে ছিলাম—এই সেই ঘর।

ঘর তো নয়, একটা ইঞ্জিনীয়ারের কারখানা। মাথার ওপরে লোহার বীম থেকে চামড়ার ফিতেয় ঝুলছে ইলেকট্রিক মোটর। শক্তির জোগান যাচ্ছে সেখান থেকে নিচে একটা পেল্লায় বেঞ্চির ওপর রাখা সারি সারি অনেকগুলো ইঞ্জিনীয়ারিং কলকব্জায়—তাদের কয়েকটা চিনতে পারলাম। ধাতু চাঁচাছোলা করার লেদ। পাশেই ধাতুর পাত পিটোনোর একটা স্ট্যাম্প। একাধিক অ্যাসিটেলিন ওয়েল্ডিং যন্ত্র পড়ে আছে ঘরের এদিকে সেদিকে। দুটো অতিকায় 'বাইস' অর্থাৎ চেপে ধরার যন্ত্র দেখবার মত। অজস্র যন্ত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঘরময়। ঘরের মেঝে ভর্তি ধাতুর কুচি। এক কোণে বাতিল ধাতুর টুকরোটাকরার একটা স্তূপ। আর এক কোণে রাসায়নিক সরঞ্জাম সাজানো এলোমেলো ভাবে। কোথাও বোতল-ভর্তি কোহল, ফটকিরি আর পারদমিশ্র ; কোথাও রসাঞ্জন, কৃষ্ণসীস আর দস্তা-রজ কাচকুপী, মুচি আর কাচীয় পাত্রে রক্ষিত ; একপাশে রয়েছে একটা মারুত চুল্লী—বাঁকনল আর বকযন্ত্রের হিসেব নেই দেখলাম—যত্র তত্র গড়াগড়ি যাচ্ছে।

এ যেন এক পাগলের কারখানা—বৈজ্ঞানিকের খেলাঘর কে বলবে। মাথার ওপর কাঁচ সদৃশ সেই গম্বুজ—বিজাপুরের গোলগম্বুজের মত প্রকাণ্ড। আকাশ দেখা যাচ্ছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে। রাত্রে তারা আর চন্দ্রও দেখা যায়। বাদলার দিনে তো আরও মজা। গায়ে জল পড়বে না কিন্তু বৃষ্টির তলায় বসে থাকা যাবে।

কিন্তু টাইম-মেশিনটা কই ?

আমার মনের কথা টের পেয়েই যেন প্রফেসর বললেন—"তোমার পাশে দেখ।"

সচমকে দেখলাম বাতিল মেট্যালের আর একটা স্তূপ মনে করে যেদিকে আর ফিরেও তাকাইনি, সেটা আসলে একটা যন্ত্র। হঠাৎ দেখে বোঝা যায় না, ঠাহর করে বোঝা যায়—গ্রন্থাগারে যে মডেলটা দেখে এসেছিলাম—তার সঙ্গে মিল রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু পেল্লায় বলেই স্থূল আকৃতি নিয়েছে। বিচিত্র সেই কোয়ার্জ পাথর এর সারা গায়ে ফিট করা—রোশনাই ঠিকরে যাচ্ছে পড়ন্ত রোদের আলোয়। ঘরে ঢুকে এই রোশনাইকেই হরেক ধাতুর চেকনাই ভেবে ভুল করেছিলাম। ভুল হওয়াটা যদিও ঠিক হয়নি। কেন না, আশ্চর্য এই কৃস্ট্যালের ঝিলমিলে দৃশ্যের সঙ্গে বিশ্বের কোনো কিছুরই তুলনা হয় না। অদ্ভূত কারখানায় আচম্বিতে প্রবেশ করায় মাথা ঘুরে গিয়েছিল বলেই আসল জিনিসটাকেই বাজে জিনিস ভেবে বাজে জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়েছিলাম এতক্ষণ।

মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলাম বিশ্বের বৃহত্তম বিস্ময় টাইম মেশিনের দিকে—যে মেশিনের প্রত্যেকটা অংশ ঝকঝক করছে বার বার পালিশ করার ফলে। বৃদ্ধ প্রফেসর যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, তা ঐ চকচকে ঝকঝকে পার্টস্‌গুলো দেখলেই বোঝা যায়।

লম্বায় সময়-যন্ত্রটা সাত থেকে আটফুট। চওড়ায় ফুট পাঁচেক। মেঝে থেকে প্রায় ছ-ফুট উঁচু। মেট্যাল ফ্রেমের জন্যেই অত উঁচু মনে হচ্ছে। আসল কলকব্জা ফুট তিনেকের বেশী উঁচু নয়।

কাজের পার্টস্‌গুলো সবই দেখা যাচ্ছে—অথচ বর্ণনা করার মত ভাষা খুঁজে পেলাম না। প্রয়োজনও দেখি না। মডেলের মধ্যে যা-যা দেখেছিলাম, এখানেও ঠিক সেইসব যন্ত্রাংশই রয়েছে। যেন একটা প্রহেলিকা। যন্ত্রাংশের গোলকধাঁধা। সব কিছুরই গায়ে ফিট করা আশ্চর্য দ্যুতিময় সেই কোয়ার্জ পাথর—ফলে ঝিকিমিকি প্রভায় অনেকগুলো পার্টস্ ভালভাবে বোঝাও যাচ্ছে না। চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। হাজার হাজার সূক্ষ্ম তার আর পঁচকে রড নানান ভাবে পরস্পর সংলগ্ন থাকায় মাথার মধ্যে যেন গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর মাথা ঘুরে গেল। কিছু বুঝলাম না।

বুঝলাম শুধু সময়-যন্ত্র চালনার কন্ট্রোল ব্যবস্থা। চেনা-চেনা মনে

হল।

মেট্যাল ফ্রেমের প্রান্তে একটা চামড়া-ঢাকা গদী-আসন। মোটর সাইকেলের সিটের মত দুপাশে গোল করা—লম্বাটে ধাঁচের। তার চারদিক ঘিরে অনেকগুলো লিভার, রড আর ডায়াল।

মেন কণ্ট্রোলটা মনে হল একটা বড় সাইজের লিভার—রয়েছে গদীর ঠিক সামনে। তার মাথায় লাগানো রয়েছে এমন একটা জিনিস যা এই জটিল কলকব্জার পটভূমিকায় নেহাতই বেমানান—একটা সাইকেলের হ্যান্ডল-বার। আন্দাজ করে নিলাম, লিভারটাকে হাতের মুঠোয় কষে চেপে ধরার জন্যেই আজব হ্যান্ডল-বারটাকে ফিট করেছেন প্রফেসর। লিভারের দু-পাশে ডজন খানেক করে ছোট ছোট রড—প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার সঙ্গে জয়েন্টে লাগানো—যাতে লিভার নড়লেই প্রতিটা রডে চাপ পড়বে এবং ঘুরবে।

এইসব জটিলতায় নিবিষ্ট হয়ে থাকার ফলে প্রফেসরের অস্তিত্ব মুছে গেছিল মন থেকে। চমকে উঠলাম তাঁর কথায়—বেশ আত্মম্ভরিতার সঙ্গেই বললেন—"কি হে ছোঁড়া, জমাটি যন্ত্র, তাই না?"

"কদ্দিন লাগল বানাতে?"

"যেদিন আইডিয়াটা মাথায় ঢোকালে, তার পরের দিন থেকেই। পার্টসগুলো নানান লেদমেশিন ফার্ম থেকে করিয়ে এনে ফিনিশ করেছি এখানে—তাই এত তাড়াতাড়ি করতে পারলাম। মেশিনের মূল সূত্রটা জলের মত সোজা—এত সোজা যে তোমাকে বললেই তাই নিয়ে গল্প ফেঁদে বসবে—আমার সিক্রেট হাটে বাজারে ছড়িয়ে যাবে—তাই তোমাকে বলব না। ঐ যে কোয়ার্জ পাথরগুলো দেখছ, ওগুলোই কেবল এখানে বানিয়েছি। উপাদানগুলো কলকাতায় পাওয়া যায়—নাম জিজ্ঞেস কোরো না—বলব না।"

"বলতে আপনাকে হবে না। কিন্তু লোহালক্করের এই মেশিন অতীত আর ভবিষ্যতে পাড়ি দিতে পারে, ভাবতেও অবাক লাগছে।"

আহত কণ্ঠে প্রফেসর বললেন—"লোহালক্কর কি হে, ওর মধ্যে যে সব মেট্যাল আছে, তার মধ্যে এক চিলতে বাজে জিনিস নেই। এ আমার জীবন্ত যন্ত্র—হাত দিলেই বুঝবে।"

"হাত দিলেই বুঝব মানে?"

"হাত দিয়েই দেখ না।"

ভয় হল। মতলব কি বুড়োর? শক্-টক্ লাগবে নাকি? প্রফেসর আমার মুখভাব নিরীক্ষণ করে অভয় দিয়ে বললেন—"কিছু হবে না, এই রডটা কেবল ছুঁয়ে দেখ।"

বলে, আমার হাতটা টেনে নিয়ে ধরিয়ে দিলেন ফ্রেম-সংলগ্ন একটা পেতলের রডে। মুখখানা পেঁচার মত করে আঙুলগুলো সবে ছুঁইয়েছি, ...অমনি গোটা মেশিনটা সজীব প্রাণীর মতই দৃষ্টতঃ এবং স্পষ্টতঃ শিউরে উঠল। ঝট করে আঙুল টেনে নিলাম আমি।

অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এল গলা দিয়ে—"একী!"

"ফিজিক্সে 'অ্যাটেনুয়েশন' বলে একটা শব্দ আছে। জানা আছে?"

আমতা আমতা করে বললাম—"মনে পড়ছে না।"

"বস্তুর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে শক্তি হ্রাস পায় রেডিয়েশনের ফলে, তাকেই বলে অ্যাটেনুয়েশন। টাইম মেশিন ফোর্থ ডাইমেনশনে রয়েছে বলে তারও এখন অ্যাটেনুয়েশন অবস্থা প্রাপ্তি ঘটেছে। এ মেশিন বাস্তব, কিন্তু বাস্তব জগৎ বলে যে জগৎটাকে চিনি—তার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব নয়—এর অস্তিত্ব ফোর্থ ডাইমেনশনে। বিষয়টা তোমার মাথায় না ঢোকাতে পারলে সময় পথে পর্যটন সুখের হবে না।"

ঢোঁক গিলে বললাম—"আর একটু স্পষ্ট করবেন?"

করুণামিশ্রিত চাহনি দিয়ে আমাকে নিষিক্ত করে প্রফেসর বললেন—"সংক্ষেপে এই—টাইম মেশিন তোমার সামনে আমাদের মতই খাড়া আছে বলে ভেবো না—সে নিষ্ক্রিয়। টাইম মেশিন চলেছে এই মুহূর্তে সময়ের পথ বেয়ে—গড়িয়ে চলেছে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।"

"কিন্তু...কিন্তু সময় পথে সময়-যন্ত্র চালু থাকলে আমাদের সামনে খাড়া থাকে কি করে? এও কি সম্ভব?"

"খুব সম্ভব, বৎস, খুবই সম্ভব। টাইম মেশিন খাড়া আছে ঠিকই—কিন্তু সে চলছে, চলবে। এই দিকে দ্যাখো," বলে যে রুপোর কগ-হুইলটা উনি দেখালেন, তার সূক্ষ্ম সংস্করণ দেখেছি ক্ষুদে মডেলে। "কগ-হুইল কিন্তু ঘুরছে। দেখতে পাচ্ছো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘুরছে বটে।" ঝুঁকে পড়ে বললাম চাপা বিস্ময়ে—খুব বেশী ঝুঁকতেও সাহস হল না—সজীব যন্ত্র আরো কি করে বসে জানি না

তো।” স্পষ্ট দেখলাম, বিরাট খাঁজকাটা চাকাটা খুব আস্তে আস্তে আবর্তিত হচ্ছে—এত আস্তে যে ভাল করে ঠাহর না করলে বোঝাও যায় না।

“চাকা যদি না ঘুরত,” কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বললেন প্রফেসর—“সময়-যন্ত্র তাহলে সময়-পথে স্তব্দ হয়ে যেত। ফলটা কি হত জানো? মেশিনটা তাহলে অতীতে হারিয়ে যেত। কেন না, আমরা তো সময়-পথে নিরবচ্ছিন্নভাবে গড়িয়ে চলেছি—বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছি। সময়-যন্ত্রকে সেই গতিতেই বেঁধে রাখা হয়েছে। তোমার প্রিয় ওয়েল্স্ সাহেব কিন্তু এই ব্যাপারটা মাথায় আনতে পারেন নি। তাই তাঁর গল্পটা চমকপ্রদ হলেও অবাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে।”

লেখক সম্বন্ধে এ ধরনের কাদাছোঁড়া মন্তব্য হামেশাই প্রফেসরের মুখে শুনি—বিশেষ করে আমার লেখনীকে উনি বংশদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেন যখন তখন। কিন্তু প্রিয় লেখক সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি শুনে গা জ্বলে গেল আমার।

তীব্র গলায় বললাম—“ওয়েল্স্ সাহেব শুনলে কিন্তু দুঃখ পেতেন।”

“তা পেয়েছেন।”

“তার মানে?” ধোঁকা লাগল বৃদ্ধের বক্র কণ্ঠস্বরে।

“মানে অতি সোজা। আমি ইংলণ্ডে গিয়ে বলে এসেছি বাচ্চাদের মাথা খাওয়ার জন্য এই সব ছাইপাঁশ লেখা তাঁর উচিত হয়নি।”

“কিন্তু···কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন।”

“গেলেই বা। যখন বেঁচেছিলেন, সেই অতীতে গিয়ে তাঁকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে এলাম।”

মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল আমার—“এখান থেকে ইংলণ্ডে চলে গেলেন?”

“যাবোই তো। এই ব্যাপারেও তো টেক্কা মেরেছি তোমার ওয়েলস্ সাহেবকে। তাঁর আজব সময়-যন্ত্র এক জায়গাতেই থাকত। নড়ার ক্ষমতা ছিল না বলেই তো মর্লকদের খপ্পরে পড়েছিলেন তাঁর সময়-পর্যটক মশায়। কিন্তু আমার যন্ত্র শুধু সময়-পথে নয়, স্থান-পথেও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে। কলকাতা থেকে ইংলণ্ড তো সামান্য কথা, দরকার হলে মঙ্গলগ্রহ-শনিগ্রহেও ঘুরে আসতে পারে।”

নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। প্রফেসর উন্মাদ নন—বেখাপ্পা আচার আচরণ দেখে তাই মনে হয় অবশ্য। আসলে তিনি খেয়ালী। খেয়াল-খেলা নিয়ে উন্মাদের মত আচরণ করে থাকেন। কিন্তু এই খেয়াল-খেলা খেলতে বসেই তিনি যে যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসে আছেন, তা ভাবতেও মাথা-ঘুরে গেল আমার, বিস্ময় শ্রদ্ধায় মূক হয়ে গেলাম।

বাইরে তখন সূর্য ডুবছে। রক্তলাল অস্তাচলের কিরণ অজস্র অদ্ভুত বর্ণে অপরূপ করে তুলেছে সময়-যন্ত্রকে। মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি চেয়ে রইলাম সেদিকে। চোখের কোণ দিয়ে বুঝলাম, প্রফেসরও সস্নেহে চেয়ে আছেন সন্তান-সম সময়-যন্ত্রের পানে।

সময়-যন্ত্রের ঝলমলে রূপটা হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে এল। লাল পশ্চিমাকাশের লোহিত কিরণ বর্ষণ যেন সহসা হ্রাস পেল। অজ্ঞাতসারেই চোখ তুললাম আকাশের দিকে। দেখলাম, এক তাল কালো মেঘ ঢেকে ফেলেছে লাল আকাশকে। কালো বললাম বটে, কিন্তু এ যেন তার চাইতেও নিবিড়। এত মিশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ কখনো দেখিনি। মেঘের যে এরকম চেহারা হয়, তাও কখনো দেখিনি। মেঘ তো নয়, যেন অতিকায় একটা তমিস্রা-পিণ্ড ভাসছে রক্তলাল আকাশ আর মর্তের মাঝে। অরুণ-কিরণ শুষে নিচ্ছে নিঃশেষে।

খুটখাট আওয়াজে সম্বিৎ ফিরল। প্রফেসর উঠে বসেছেন সময়-যন্ত্রের গদী-আসনে। আমি তাকাতেই ফিক করে হেসে বললেন—"চলো, ঘুরে আসি একপাক।" এমন ভাবে বললেন যেন ট্রায়াল দিতে ময়দানে যাচ্ছেন।

বিদঘুটে মেঘের কথা বিস্মৃত হয়ে হাঁচড় পাঁচড় করে উঠে পড়লাম সময়-যন্ত্রে। আজও মনে আছে, ধাতুর ফ্রেমে পা দিয়ে হাত দিয়ে ফ্রেম চেপে ধরতেই আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। প্রতিটি অণু-পরমাণুতে বিচিত্র শিহরণ আমার মগজের কোষে কোষে একটা ধাক্কা দিয়ে গেছিল।

কিন্তু সে অনুভূতি ক্ষণেকের। পরমুহূর্তেই লাফিয়ে গিয়ে বসলাম বিজ্ঞান পাগল বৃদ্ধের পাশে।

ঠিক সেই সময়ে মাথার ওপর থেকে একটা বিদ্যুৎ নেমে এসে স্পর্শ করে রইল প্রফেসরের করোটি। বিদ্যুৎ চমক কথাটাই সৃষ্টি হয়েছে বিদ্যুতের চক্ষের পলকে আবির্ভূত হয়েই মিলিয়ে যাওয়া থেকে। বিদ্যুৎ আকাশ ফুঁড়ে নেমে আসে সহসা, মিলিয়েও যায় তৎক্ষণাৎ চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে।

কিন্তু এই বিদ্যুৎ লকলকে শুঁড় মেলে স্পর্শ করে রইল প্রফেসরের ব্রহ্মতালু। বেশ কয়েক সেকেন্ড।

প্রফেসর টের পান নি। উনি একহাতে হ্যান্ডল-বার খামচে ধরে, আর এক হাতে খুটখাট করে সুইচ টিপছিলেন, লিভারে চাপ দিচ্ছিলেন। আশ্চর্য বিদ্যুৎ শিখার উৎস অন্বেষণ করতে আমি তাই আকাশ পানে চাইলাম।

পিণ্ডাকারে নিরন্ধ্র তমাল কালো মেঘ পুঞ্জ ভেদ করে এঁকেবেঁকে বিদ্যুৎ শিখা নেমে আসছে···আসছে···আসছে! স্পর্শ করে রয়েছে প্রফেসরের ব্রহ্মতালু। তারপর, আমার চোখের সামনেই মিলিয়ে গেল বিদ্যুৎ শিখা।

চোখ নামিয়ে দেখলাম, প্রফেসরের মাথা ঘিরে বলয়াকারে দ্যুতিমান সেই বিদ্যুৎ শিখা। আংটির মত ঘিরে রয়েছে কপালের ওপর দিয়ে। বহু ছবিতে দেখেছি এই দৃশ্য। বড় সাধকদের মাথা ঘিরে জ্যোতির ছটা। ইংরেজিতে যাকে বলে 'হ্যালো'। কিন্তু সে জ্যোতির রঙ শুভ্র। আর চোখের সামনে দীপ্যমান এই জ্যোতি অশুভ রঙের—গাঢ় নীল—ঈষৎ কালচে। শক্তির বিস্ফোরণ ঘটছে যেন তার মধ্যে মুহুর্মুহু। কেঁপে কেঁপে উঠছে এবং চক্রাকারে পাক খাচ্ছে কপালের ওপর দিয়ে।

"প্রফেসর!" ভাঙা গলায় বিকট চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আমি। প্রফেসর সান্ত্বনার সুরে বললেন—"ভয় পেও না। এখুনি যাত্রা হবে শুরু।"

আমি প্রফেসরকে ধাক্কা মারতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিলাম। হঠাৎ সেই অশুভ অপার্থিব বর্ণের বিদ্যুৎ বলয় প্রফেসরের সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। আপাদমস্তক মণ্ডিত করে থির থির করে কাঁপতে লাগল। কালচে নীলাভ অগ্নিচ্ছটায় প্রফেসর ছেয়ে গেলেন।

উসখুস করে উঠলেন প্রফেসর। অন্যমনস্ক ভাবে বললেন নিজের মনেই—"মাথাটা টিপ টিপ করে কেন?" বলে, কি রকম অদ্ভুত চোখে তাকালেন আমার পানে। তাঁর দু চোখের মধ্যেও দেখলাম নেই ঘন কালচে-নীলাভ বিদ্যুতের স্ফুরণ। অপার্থিব সেই চাহনি প্রফেসরের চোখে অন্ততঃ কখনো দেখিনি।

বার কয়েক মাথা ঝাঁকালেন। আমার তখন চেঁচাবার শক্তিও লোপ পেয়েছে। তারপরেই কথা নেই বার্তা নেই, ঢিপ করে কন্ট্রোলের ওপর

মাথা ঠুকে পড়ে গেলেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র। আর নড়লেন না।

তার আগেই নিশ্চয় মেশিন চালিয়ে দিয়েছিলেন। ঢিপ করে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ঠোকায় এবং হাতের বেমক্কা ধাক্কায় অন্যান্য কলকব্জাও নিশ্চয় চালু হয়ে গেছিল।

আমার অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য এবং অবিস্মরণীয় অ্যাডভেঞ্চার পর্বের শুরু হল তৎক্ষণাৎ।

৬ ॥ সময়-গাড়ীর ব্যায়রাম

গোটা টাইম মেশিনটা আচম্বিতে সামনের দিকে টলে পড়ল। মনে হল যেন পাতাল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। প্রফেসরকে আঁকড়ে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললাম—"প্রফেসর! প্রফেসর!" প্রফেসর নিস্পন্দ হয়ে রইলেন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘিরে থাকা বিদ্যুৎ মণ্ডলটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল বললে সঠিক বলা হবে না, কালচে-নীল বর্ণচ্ছটা যেন তাল গোল পাকিয়ে গুটিয়ে যেতে লাগল। তারপর আতংক আমার চরমে উঠল যখন দেখলাম, মহাশূন্যের বিস্ময় তাঁর ভেতরেই প্রবেশ করছে। দ্রুত হতে দ্রুততর হচ্ছে ঢুকে যাওয়ার গতিবেগ। হু-হু করে সমস্ত ছটা যেন তাঁর প্রতিটি লোমকূপের মধ্যে দিয়ে উধাও হল শরীরের অভ্যন্তরে।

চোখের ওপর ঝিকিমিকি আঘাতে ফিরে তাকালাম ল্যাবোরেটরীর দিকে। সবিস্ময়ে দেখলাম, সময়-যন্ত্র তখনো খাড়া বীক্ষণাগারে। দৃঢ় অবস্থানে তিলমাত্র বিচ্যুতি ঘটেনি। বেঞ্চির ওপর রাখা বড় ঘড়িটার কাঁটা দুটো উন্মাদের মত সামনের দিকে ঘুরে চলেছে। গম্বুজ-ঘরের পেছন দিক থেকে সূর্য উঠে এসে মাথার ওপর দিয়ে দ্রুত চলে গেল সামনের দিকে। আমার দৃষ্টি তার গতি পথ অনুসরণ করার আগেই আবার অন্ধকার আবির্ভূত হল এবং গাঢ় আঁধারে ঢেকে গেল গম্বুজ গৃহ।

ভয়ে বিস্ময়ে অবশ হওয়া সত্ত্বেও মস্তিষ্ক সক্রিয় ছিল। তাই বুঝলাম, ফোর্থ ডাইমেনশনে এসে পড়েছি। ছুটে চলেছি সময়-পথে—প্রফেসর এই অবস্থাকেই বলেছিলেম অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশন। সীমাহীন নৈঃশব্দ্যে থমথমে সেই চার-মাত্রিক জগতের বর্ণনা দেওয়ার ভাষা আমার ভাণ্ডারে নেই।

সূর্য আবার উঠল। অস্তমিত হল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পরবর্তী অন্ধকারের সময় হ'ল সংক্ষিপ্ততর। তারপরের দিবালোক হ'ল আরও

সংক্ষিপ্ত। ভবিষ্যতের গর্ভে ধেয়ে চলেছে টাইম মেশিন!

দিন এবং রাতের শোভাযাত্রা পরম্পরা স্থায়ী হল মাত্র কয়েক সেকেণ্ড ব্যাপী। অবশেষে সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে এল দিন, এল রাত। তারপর এত দ্রুত হ'ল পরম্পরা যে চোখ দিয়ে ঠাহর করতেও আর পারলাম না। ধূসর গোধূলির মতই জাগ্রত রইল কেবল পরিপার্শ্ব। আবছা হয়ে এল চারপাশের বীক্ষণাগার। সূর্যের গতিপথ শুধু একটা স্থির আলোক-বর্ত্ম হয়ে ফুটে রইল গাঢ় নীল আকাশের বুকে।

প্রফেসর তো নড়বার নাম করেন না। বেঁচে আছেন তো? হেঁট হয়ে বুকে কান পাতলাম। চোখের পাতা টেনে দেখলাম। চক্ষুতারকা কপালের ভেতরে প্রায় ঢুকে রয়েছে বললেই চলে। কিন্তু বেঁচে আছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

টাইম মেশিন ছুটে চলেছে সময়ের পথে। কোথায় চলেছে? সুদূর ভবিষ্যতের কোন অধ্যায়ে আবির্ভূত হতে চলেছে? ডায়ালগুলোর দিকে তাকালাম। সমুজ্জ্বল ডায়ালের পর ডায়ালে সাল-তারিখ-সময়-গতিবেগ এবং বিস্তর অজানা বিষয় লেখা। একটা ডায়াল দেখলাম বছরের হিসাবে। কাঁটাটা বোধহয় হাতীর দাঁতে তৈরী। প্লাস্টিক অমন সুন্দর হয় না। কাঁটাটা থিরথির করে কাঁপছে ২৭৩২ সালের ঘরে!

২৭৩২ সালে পেঁছেছি তাহলে। কিন্তু বিচিত্র বিদ্যুতাহত প্রফেসরকে নিয়ে দূরভবিষ্যতের পৃথিবীতে পেঁছে কি সুবিধে করতে পারব? তার চাইতে নিজেই চেষ্টা করি না কেন টাইম মেশিন চালিয়ে ১৯৮১তে ফিরে আসার? চালাতে গিয়ে নতুন বিভ্রাট যদি ঘটে?

দোনামোনায় পড়লাম। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে অগুন্তি ডায়ালগুলো লক্ষ্য করলাম। প্রত্যেকটা ডায়ালের তলায় দেখলাম একটা করে ধাতুব ছোট্ট নব। দুহাতে সাইকেলের হ্যাণ্ডল-বারের মত কন্ট্রোল চেপে ধরলাম প্রথমে, তারপর সাল-লেখা ডায়ালের নবটা ধরে টানাটানি করতে গিয়ে দেখলাম নব অনড়।

সাল-লেখা পাশের আর একটা ডায়ালের ওপর কাঁটা এতবেগে ঘুরছে যে দেখাই যাচ্ছে না—যেন ফুলস্পীডে টেবিল ফ্যান ঘুরছে। এর তলায় ফিট করা নবটা ধরে টানাটানি করলাম—নড়াতে পারলাম না।

জেদ চেপে গেল। হ্যাণ্ডল-বার ছেড়ে দিয়ে দু-হাতে দুটো নব ধরে

হ্যাঁচকা টান মারলাম।

আচম্বিতে সময়-যন্ত্র প্রচণ্ড দুলে উঠল। পরক্ষণেই যেন ডিগবাজী খেল পর-পর কয়েকবার। আমি ধড়াম করে আছড়ে পড়লাম কন্ট্রোলের ওপর। পা দিয়ে সামলাতে গিয়ে বুটের ঠোক্কর লাগল পায়ের কাছে একটা নিকেল রডে—মূল লিভারের সঙ্গে লাগানো ছিলা লিভারটা। চোখের পলক ফেলার আগেই টাইম মেশিন এক পাশে হেলে পড়ে যেন তলিয়ে গেল নিতল খাদের মধ্যে। অন্ধকার নামল আমার চোখের পাতায়।

না, আমি জ্ঞান হারাইনি। কিন্তু ঘূর্ণিরোগে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। মাথার প্রতিটি কোষে একযোগে যেন জগঝম্প বেজে উঠল, উন্মাদ তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে গেল। আস্তে আস্তে কাটল চোখের আঁধার।

কিন্তু ল্যাবোরেটরী আর দেখতে পেলাম না। অদৃশ্য হয়ে গেছে। দিবস ও রজনীর শোভাযাত্রাও স্থগিত হয়েছে। আমি রয়েছি নিশ্ছিদ্র অন্ধকার এবং নিটোল নীরবতার মধ্যে।

ঘূর্ণিরোগ আর নেই, কিন্তু অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করলাম, ডাইনে বাঁয়ে দুলছি। অর্থাৎ সময় পথে সময়-যন্ত্রের উন্মাদ গতি রয়েছে অব্যাহত। দুলুনিটা মোটেই সুখপ্রদ নয়। অসহ্য। যা থাকে কপালে বলে দুহাতে আবার হ্যাণ্ডল-বার চেপে ধরে সাইকেলের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করার মতই টাইম দুলুনি বন্ধ করতে গেলাম।

ফল হ'ল উল্টো। নতুন গতিবেগের মধ্যে ঠিকরে গেলাম। অত্যন্ত জটিল উল্টে-উল্টে পড়ার গতিবেগ। সেইসঙ্গে তীব্রতর হল ডাইনে-বাঁয়ে দুলুনি।

হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, সময়-যন্ত্র সত্যিই যেন জীবন্ত প্রাণী। তার ইচ্ছায় বাদ সাধবার ক্ষমতা আমার নেই। ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মতই ছুটছে সে—আটকানোর ক্ষমতা আমার নেই। এ ক্ষমতা আছে কেবল প্রফেসরের —কিন্তু তিনি কি জীবিত?

পায়ের ঠোক্করে যে নিকেল রডটা এই অবস্থায় এনে ফেলেছে সময় যন্ত্রকে, হেঁট হয়ে সেটা খুঁজতে যাচ্ছি, এমন সময়ে ধড়মড় করে উঠে বসলেন প্রফেসর।

ইচ্ছে হল আনন্দে নৃত্য করে উঠি। পরক্ষণেই সংশয়াচ্ছন্ন হলাম।

সংজ্ঞালোপের আগে প্রফেসরের চক্ষুতারকায় যে নীলাভ স্ফুরণ দেখেছিলাম, যে অপার্থিব চাহনি লক্ষ্য করেছিলাম, এখন আর তা নেই বটে, কিন্তু সেই চিরপরিচিত চাহনিও নেই। উনি একান্ত অপরিচিতের মত চেয়ে আছেন আমার দিকে।

"প্রফেসর···প্রফেসর···আমি দীননাথ।"

প্রফেসরের দু-চোখ ঈষৎ কুঞ্চিত হল। ললাট ভাঁজ খেয়ে গেল। যেন ভাবছেন। চেনবার চেষ্টা করছেন।

"প্রফেসর···আমি দীননাথ···দীননাথ।"

সহসা উজ্জ্বল হল দৃষ্টি। স্খলিত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর—"দী··· দী—"

"দীননাথ।"

"দীননাথ," বলার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে সম্বিৎ ফিরে এল যেন প্রফেসরের, অপসৃত হ'ল মস্তিষ্কের ধোঁয়া। স্পষ্ট চাহনি মেলে স্পষ্টতর কণ্ঠে বললেন—"কি হয়েছে ?"

আনন্দে চোখে প্রায় জল এসে গেল আমার। গলা বুঁজে গেল। প্রফেসর আমাকে চিনতে পেরেছেন। মহাশূন্যের অপার্থিব বিদ্যুৎশিখা তাঁর চেতনা হরণ করতে পারেনি, যদিও সেই বৈল্লিক বিদ্যুৎ এখনো তাঁর শরীর আশ্রয় করে আছে নিশ্চয়।

সংক্ষেপে, ছোট্ট ছোট্ট কথায়, বিবৃতকরলাম আনুপূর্বিক ঘটনাবৃত্তান্ত। পরম্পরাক্রমে বলে গেলাম বদমাস বিদ্যুতের আবির্ভাব থেকে শুরু করে বর্তমান বেয়াড়া অবস্থা পর্যন্ত। ওঁর ললাট এবং চক্ষু কুঞ্চন অব্যাহত রইল। একটি কথাও বললেন না। হেঁট হয়ে হাতড়ে হাতড়ে ফুটবোর্ড থেকে একটা ভাঙা নিকেলের ডাণ্ডা তুলে এনে বললেন—"লাথি মেরে শেষকালে ভাঙলে, ছোকরা।"

ছোকরা কেন, সেই মুহূর্তে উনি আমাকে ওঁর নিজস্ব আভিধানিক বিশেষ বিশেষণমালায় ভূষিত করলেও হর্ষে রোমাঞ্চিত হতাম, উল্লাসে নৃত্য করতাম। উনি ওঁর সহজ অবস্থা ফিরে পেয়েছেন, এইটাই আমার বড় পাওয়া—গালাগাল নয়।

হাসিমুখে তাই বললাম—"হ্যাঁ, ভেঙেছি।" ভাবখানা, আরও একটু বকুন, তাহলেই ভয় ভাঙবে আমার।

উনি কিন্তু ততক্ষণে মেশিন নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়েছেন। অশুভ বিদ্যুৎ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কৌতূহল দেখালেন না—এ-ডায়াল সে-ডায়াল দেখতে লাগলেন, এ-নব সে-নব নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

তারপর বললেন—"মূর্খ।"

খুব খুশী হলাম আমি।

উনি ফের বললেন—"ইডিয়ট।"

আরও খুশী হলাম আমি।

উনি আবার বললেন—"গবেট।"

আনন্দে প্রাণটা জল হয়ে গেল। বললাম—"খামোকা গালাগাল দিচ্ছেন কেন?"

"খামোকা? বোকচন্দর, টাইম-মেশিন সাল-তারিখ বাঁধা হয়ে একবার ছুটে চললে আর তাকে ফেরানো যায়? সে নিজেই থামবে। মাঝ পথে তাকে থামতে গেলেই বিপত্তি তো ঘটবেই।"

"আপনিই তো খামোকা অজ্ঞান হয়ে গেলেন।"

"সে প্রশ্নে পরে আসছি।"

"সেই প্রশ্নটারই আগে সমাধান হোক।"

"বলছি না পরে কথা হবে?" খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর। আমি কিন্তু বড়ই পুলকিত হলাম। আহা, প্রফেসরের খাড়ি-খিঁচুনি যে এত মধুর, তাই এই ফোর্থ-ডাইমেনশন্যাল ট্র্যাভেলে এসে না পড়লে কি কখনো এমন ভাবে উপলব্ধি করতাম?

গজগজ করতে করতে লাগলেন প্রফেসর—"ভাগ্যিস মেশিনের বাইরে ছিটকে যাওনি—যতক্ষণ ভেতরে আছো, কোনো ক্ষতি নেই।"

"কিন্তু ধাক্কা লাগতে পারে তো?"

"না, লাগবে না। ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবো। অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশনে আছি যে।"

"কিন্তু কেন এমন হল জানতে পারি?"

"নিশ্চয় পারো, তোমার মত আকাট মূর্খের তা জানা দরকার বই কি। যে নিকেল রডটা তুমি লাথি মেরে ভেঙেছো, তার কাজ স্থানের মধ্যে দিয়ে টাইম মেশিনকে নিয়ে যাওয়া। তুমি তাকেই ভেঙে আমাদের এনে ফেলেছো স্থান-মাত্রায়—কলকাতা থেকে প্রচণ্ড বেগে সরে যাচ্ছি তাই।"

শুনে কিন্তু আর পুলকিত বোধ করলাম না। বিশেষ করে হতচ্ছাড়া মেশিনটার সমানে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে ঝাঁকুনির ফলে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্যন্ত মনে হচ্ছিল উগড়ে দিতে হবে যে কোনো মুহূর্তে।

প্রফেসরের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। এ হেন অস্বস্তিকর পরিস্থিতিও উনি যেন সমস্ত সত্তা দিয়ে উপভোগ করছেন মনে হল। যেন জেট বিমানে চেপে আকাশ বিহারে বেরিয়েছেন, ভাবখানা সেই রকম। সামনে-পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে দুলছেন আর নিশ্চিন্ত মনে কথা বলে যাচ্ছেন। অথচ যে কোনো মুহূর্তে প্রলয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হতে পারি। ভাবতেই অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল আমার।

জিজ্ঞেস করলাম—"তাহলে বলুন আপনার সাধের খোকা থামবে কোন চুলোয়? কবে? কোন সালে?"

কথাটা বোধ করি কানে ঢুকল না প্রফেসরের। বললেন—"কোনো ভয় নেই। পাগলের মত মেশিন ছুটছে বটে, কিন্তু আর কিছু গোলমাল ঘটেনি। কন্ট্রোলে হাত দিয়েই তুমি ওকে খেপিয়ে দিয়েছো। আর কখনো হাত দিও না।"

বয়ে গেছে আমার হাত দিতে, মনে মনে বললাম আমি।

উনি বললেন—"স্থানের মধ্যে দিয়ে ছুটছি যখন, এক সময় গাড়ী থামবেই। হাজার খানেক মাইল দূরে এলেও থামবে। তখন ফিরে যাওয়া যাবে। কিন্তু তখন যেন টপ করে গাড়ী থেমে নেমে পোড়ো না।'

"কেন?"

"অটোমেটিক রিটার্ন চালু হয়ে গেছে।"

"সেটা আবার কী?"

"আগে থেকেই যদি মেশিন 'সেট' করে দেওয়া যায়, তাহলে গন্তব্যস্থানে আর সময়ে পেঁছে আপনা থেকেই আবার শুরু হওয়ার স্থান আর সময়ে পেঁছে যেতে পারে টাইম মেশিন—মানে ১৯৮১ সালের ল্যাবোরেটরীতে। রডটা ভাঙবার আগে আর কিছুতে হাত দিয়েছিলে?"

আমতা আমতা করে বললাম—"তা দিয়েছিলাম।"

"উদ্ধার করেছো তাহলে," আবার সেই দাঁত, থুঁড়ি, মাড়ি-খিঁচুনি দর্শন করলাম—এবার কিন্তু পুলকিত হতে পারলাম না—ভয় পেলাম। দরকার নেই বাবা সময়-গাড়ী থেকে নেমে। বিদেশে বিসময়ে পড়ে প্রাণটা

হারাতে কে চায়।

ভাঙা নিকেল রডটা নিয়ে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছিলেন প্রফেসর। কিছুক্ষণ খুট খাট করে সিধে হয়ে বসে বললেন—"ভাঙেনি—প্যাঁচ খুলে গেছিল।"

"প্যাঁচে লেগেছে?" স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম।

"মনে তো হয়। ঠিক ভাবে প্যাঁচ কাটা হয় নি বলেই বেঁচে গেলাম এ যাত্রা। নইলে নির্ঘাৎ ভাঙতো—যা গোদা পায়ের লাথি। এ মেশিনে তোমাকে পা দিতে দেওয়াটাই ভুল হয়েছে।"

মেশিন তখনও টলমল করছে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে জাহাজ যেমন আছাড়িপিছাড়ি খায়, ঠিক সেই ভাবে। কিন্তু আগের চাইতে কম। অত্যুজ্জ্বল কতকগুলো আলোকবিন্দুর সঞ্চরণ দেখা যাচ্ছে—যদিও খুব অস্পষ্ট। চোখ পাকিয়ে দেখতে হচ্ছে। বিন্দুগুলো তীব্র দ্যুতিসম্পন্ন —চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। প্রফেসর কি শেষ পর্যন্ত সময় গাড়ীর ব্যায়রাম নিরাময় করতে পারলেন? সম্পূর্ণ বিশ্বাস হল না।

আমার ঠিক সামনেই ফ্লাই-হুইলটা তখনও আবর্তিত হচ্ছে দ্রুতবেগে। কিন্তু দিবস রজনীর শোভাযাত্রা পরম্পরার সেই পূর্বাবস্থা ফিরে আসেনি।

দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বললাম—"পরিস্থিতি এখন অনেকটা নিরাপদ মনে হচ্ছে।" মুখে বললেও মন কিন্তু বিশ্বাস করতে চাইল না।

প্রফেসর বললেন—"সময়-গাড়ী এখুনি হল্ট করবে। ছটফট না করে চুপটি করে বসে থেকো। অটোমেটিক রিটার্ন চালু আছে তো, তিন মিনিট পরেই টাইম মেশিন নিজে থেকেই ফিরে যাবে ১৯৮১র কলকাতায়।"

প্রাণটা নেচে উঠল ময়ূরের মত পেখম মেলে—"মাত্র তিন মিনিট?"

জবাবে প্রফেসর যা বললেন, শুনে পেখম গুটিয়ে নেতিয়ে পড়ল মন ময়ূর—মুখ শুকিয়ে গেল আমার—"অটোমেটিক রিটার্ন যদি বিগড়ে গিয়ে না থাকে, তাহলেই তিন মিনিট। নইলে যে কত মিনিট, তা আমিও বলতে পারব না।"

একি গেরোয় পড়লাম রে বাবা? অনন্তকাল টাইম মেশিনে বসে থাকতে হবে নাকি? যদি আর না ফেরে?

অপ্রত্যাশিত ভাবে আবার টলমল করে উঠল সময়-যন্ত্র। আমি তো বটেই, প্রফেসর অঁক করে দম বন্ধ করে ফেললেন। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস

দ্‌জনেরই। দেখলাম, সামনের ফ্লাই হুইল স্থির হয়ে আসছে।

ইন্সট্রুমেন্ট রীডিং দেখতে লাগলেন প্রফেসর ক্ষিপ্তের মত।

জ্বরগ্রস্তরুগীর মত আমিও চিৎকার করে উঠলাম অস্থির মস্তিষ্কে —"প্রফেসর—কোথায় এলাম বলুন।"

"পৃথিবীর সৌরজগতের কিনারায়—শনিগ্রহের কাছাকাছি···প্রায় ৫000 খৃস্টাব্দে।" চোখে চোখ রেখে বললেন অস্বাভাবিক ধীর মৃদু স্বরে —"দীননাথ ৫000 খৃস্টাব্দের শনিগ্রহে নামতে চলেছি আমরা।"

৭ ॥ সৌরজগতের কিনারায়

৫000 খৃস্টাব্দের শনিগ্রহ!

হতভম্ব হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। বলেন কি প্রফেসর! ৫000 খৃস্টাব্দের শনিগ্রহে নামতে চলেছে সময়-গাড়ী! আরে বাবা ১৯৮১ সালেই শনিগ্রহ সম্বন্ধে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা যে জ্ঞান সংগ্রহ করেছিলেন, তা এতই ভাসাভাসা এবং অসম্পূর্ণ যে নিজেরাই লজ্জিত ছিলেন। ৫000 সালে না জানি কি দেখব সেখানে!

আমি নিতান্তই সাধারণ মানুষ। কেতাব টেতাব পড়ে শনিগ্রহ সম্বন্ধে যা জানি, তা আরও অস্পষ্ট। শনিগ্রহ নাকি একটা অতিকায় গ্রহ। গ্যাসের একটা প্রকান্ড গোলক। পৃথিবী নামক গোলাটা মহাশূন্যে যতখানি স্থান জুড়ে রয়েছে তার সাড়ে সাতশ গুণ জায়গা জুড়ে রয়েছে একা শনিগ্রহ। অগণিত বরফ কনকনে কণিকা গঠিত সুবিখ্যাত 'আংটি' থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে নিষ্প্রভ সূর্যালোক। আংটি ছাড়াও শনিগ্রহ প্রখ্যাত তার অনেক গুলি চন্দ্রের জন্যে। মোট দশটা চাঁদ আছে। তাদের মধ্যে বৃহত্তমটির নাম টাইটান। টাইটান শুধু যে শনিগ্রহের সবচেয়ে বড় চাঁদ, তা নয়—তামাম সৌরপরিবারে তার চেয়ে বিপুলকায় চন্দ্রদেব আর নেই। বৃহত্তম উপগ্রহ বলা যায় এক কথায়। বুধগ্রহের চাইতেও বৃহৎ এই টাইটানের নিজস্ব মেঘবৎ বায়ুমণ্ডল আছে —যার মূল উপাদান হাইড্রোজেন আর মিথেন গ্যাস।

টাইটান··· চিররহস্যময় টাইটান আমার মন দখল করেছিল বলেই প্রফেসরের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিলাম। সহসা সম্বিৎ ফিরল কালচে নীলাভ বিদ্যুতের ঝলকে। অপার্থিব সেই বিদ্যুৎ ঝলক পৃথিবীর

বুকে প্রথম দেখেছিলাম আকাশের মেঘ থেকে এঁকেবেঁকে নেমে এসে প্রফেসরের করোটি স্পর্শ করে থাকতে।

চোখের কোণ দিয়ে হঠাৎ সেই বিদ্যুৎঝলকের পুনরাবির্ভাব দেখে সচমকে চোখ তুললাম উৎস সন্ধানে। এবং পাথর হয়ে গেলাম!

প্রফেসর···প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র···আমার একান্ত আপনজন, আমার পরম সুহৃদ, আমার পিতৃপ্রতিম প্রফেসর নাটবল্টু চক্র স্থির নয়নে অবলোকন করছেন আমাকে। চোখের পাতা সম্পূর্ণ খুলে গেছে। চক্ষুতারকা বিস্ফারিত। সম্পূর্ণ চাহনি নিবদ্ধ আমার ওপর।

কিন্তু সেকী চাহনি! সাগরের নিতলতা, মহাশূন্যের রহস্যময়তা দিয়েও পরিমাপ করা যায় না দুর্জ্ঞেয় সেই চাহনির। স্থির, নির্ভাষ সেই চাহনির মধ্যে পার্থিব ছাপ তিরোহিত হয়েছে পুরোপুরি—পৃথিবীর কোনো মানুষ, কোনো না-মানুষের চোখে এ-হেন চাহনি দেখা যায় না। অমানুষ, অতিমানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণীর চোখেও এ জাতীয় চাহনি কল্পনা করা দুষ্কর। আমার চিরপরিচিত প্রফেসরের চোখে একান্ত অপরিচিত সেই চাহনি লক্ষ্য করে থ হয়ে গেলাম আমি।

সেই সঙ্গে অসাড় হয়ে এল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। না, চাহনি-নিক্ষিপ্ত সম্মোহনী শক্তির-প্রসাদে নয়—ভয়ে। অপরিসীম আতংকে, নিঃসীম বিভীষিকায় আমার প্রতিটি স্নায়ুকোষ, প্রতিটি পেশীকোষ যেন সাময়িকভাবে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেল। কেন না···

অপার্থিব সেই বিদ্যুৎ লহরী এবারে এঁকে বেঁকে ধেয়ে আসছে প্রফেসরের ললাট-কেন্দ্র থেকে। যে বিদ্যুৎ-দাম মণ্ডলাকারে ঘিরে ধরেছিল প্রফেসরের সর্বদেহ ১৯৮১ সালের পৃথিবীতে, যা আমার চোখের সামনেই লক্ষ সর্পের মত, অযুত ঘূর্ণির মত পাক খেতে খেতে দ্রুত বিলীন হয়েছিল প্রফেসরের শরীর অভ্যন্তরে—অলৌকিক সেই বিজলীরেখাই এবার লকলকিয়ে স্পার্ক দিচ্ছে প্রফেসরের কপালের ঠিক মাঝখানে। শরীরের মধ্যে আশ্রিত অশুভ তড়িৎ-পুঞ্জ যেন এবার পুষ্ট এবং লালিত হয়ে দ্বিগুণ তেজে নির্গত হচ্ছে কপাল ফুঁড়ে। এবং···

ধেয়ে আসছে আমার ললাট লক্ষ্য করে!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমার ললাটই কৃষ্ণাভ নীলাভ এই তড়িৎ-রেখার লক্ষ্যস্থল। লকলকে স্থির বিদ্যুৎ ঝলসে ঝলসে উঠছে আমার কপাল স্পর্শ

করে। কিন্তু বিদ্যুতের আঁচ অনুভব করছি না···কোনো ভাবান্তরও ঘটছে না···শুধু বিস্মিত, ভীত এবং অবশ হয়ে গেছি চিরপরিচিত প্রফেসরের আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে। সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করছি, ইনি আমার চেনা প্রফেসর নন—তাঁর দেহ আশ্রিত আর একটা সত্তা নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে আমার পানে। এবং আমাকে কব্জায় আনার চেষ্টা করছে বিদ্যুৎ জালে জর্জরিত করে।'

ঠিক সেই সময়ে আচম্বিতে ভয়ানক ভাবে টলমল করে উঠেই পরপর কয়েকটা ডিগবাজী খেল সময়-গাড়ী। আমি ছিটকে গেলাম আচমকা সংঘাতে এবং মাথায় প্রচণ্ড চোট পেয়ে সংজ্ঞা হারালাম।

প্রথম জ্ঞান ফিরল আমার।

চোখ মেলে দেখলাম আমি শুয়ে আছি একটা অদ্ভুত দর্শন ঘরে। ঘর বলতে আমরা বুঝি চারটে দেওয়াল থাকবে, একটা মেঝে আর একটা সিলিং থাকবে। কিন্তু এই ঘরের সঙ্গে আমার সেই ধারণার কোনো মিল নেই। মেঝে একটা আছে, যে মেঝেতে শুয়ে আছি আমি, একমাত্র সেই মেঝেটাই যা চ্যাটালো। কিন্তু চার দেওয়ালের পরিবর্তে বহু দেওয়াল এবং সব গুলো দেওয়ালই বিভিন্ন কোণে বাঁক নিতে নিতে সিলিং বানিয়ে ফেলেছে। গম্বুজ নয়, ঘর নয়—মাঝামাঝি। একখণ্ড কাটাই হীরের ভেতরটা যদি ফোঁপরা হত, তাহলে যে রকম দেখতে হত, এ যেন ঠিক তাই। দেওয়াল, মেঝে, ছাত—সবই শুভ্র নরমদ্যুতি সম্পন্ন কোনো ধাতু দিয়ে নির্মিত। বহু দেওয়ালের প্রতিটির সঙ্গে সাঁটা রকমারি যন্ত্রপাতি—মায় বহু কোণ ওয়ালা ছাতেও। তারা মণ্ডলের প্রোজেকটর যারা দেখেছে, তারা অদ্ভুত মেশিনে ভর্তি এই ঘরটার খানিকটা ধারণা মনে মনে গড়ে নিতে পারবে।

আশ্চর্য এই ঘর নেহাত ছোট নয়—তারামণ্ডলের হলঘরের মতই প্রকাণ্ড। অতবড় ঘরের কোথাও কোনো আলো নেই, অথচ ঘরটা নরম আলোয় উদ্ভাসিত। ভালো করে ঠাহর করতে গিয়ে দেখলাম, আলো বেরোচ্ছে আশ্চর্য ধাতুর গা থেকে—এমন কি মেঝে থেকেও। পুরো ঘরটাই একটা আলোক বাতি—স্নিগ্ধ প্রভায় সমুজ্জ্বল প্রতিটি দেওয়াল—সমান আলোয় আলোকিত সমস্ত ঘরটা।

ভীষণ অবাক হয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়ে

প্রথমেই দেখলাম প্রফেসরকে—তারপর দেখলাম টাইম মেশিনকে।

অটল অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে টাইম মেশিন। প্রকাণ্ড ফ্লাইহুইল খুব আস্তে আস্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। গদী চেয়ারে ত্রিভঙ্গ মুরারির মত যন্ত্রপাতির মধ্যে লটকে আছেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র।

দেখেই তড়াক করে এমন ভাবে লাফিয়ে উঠলাম যেন পায়ে কাঁকড়া বিছে কামড়েছে। রবারের বলের মত ছিটকে গেলাম টাইম মেশিনের দিকে—হুমড়ি খেয়ে পড়লাম প্রফেসরের ওপর।

প্রফেসর চোখ বুঁজিয়ে যেন ঘুমোচ্ছেন। এই রকম অবস্থায় সময়-গাড়ীর মধ্যেও পড়েছিলাম। তখন বুকে কান পেতেও প্রাণের স্পন্দন টের পাইনি। পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রফেসর বিহ্বল চোখে তাকিয়েছিলেন—প্রথমটা আমাকে চিনতেও পারেন নি।

কে জানে আবার সেই হাল তাঁর হয়েছে কিনা। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই দুহাতে তাঁকে ধরে উপর্যুপরি কয়েকবার রাম-ঝাঁকুনি দিয়ে তারস্বরে ডাকলাম—"প্রফেসর···ও প্রফেসর···উঠুন···কোথায় এসেছি দেখুন।"

তারপরেই খেয়াল হল, জাগাচ্ছি কাকে! প্রফেসর কি আর প্রফেসর আছেন? এই তো কিছুক্ষণ আগেই অমানুষিক চাহনি দিয়ে আমার অন্ত-রাত্মা পর্যন্ত শুকিয়ে দেওয়ার উপক্রম করেছিলেন। কপাল থেকে হত-চ্ছাড়া বিদ্যুৎ নিক্ষেপ করে আমাকে দগ্ধ করার চেষ্টা করে ছিলেন। এখন কিন্তু তাঁর কপালে সেই বিদ্যুৎলতার চিহ্নমাত্র নেই। চোখমুখ বেশ প্রশান্ত। পাজীর পাঝাড়া বিদ্যুৎ-আগন্তুক কি তাহলে চম্পট দিয়েছে?

মনটা আশায় দুলে উঠল। আবার ওঁর নড়া চেপে ধরলাম। টেনে খাড়া করে বসালাম এবং কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কানের পর্দা ফাটানো স্বরে চেঁচিয়ে বললাম—"প্রফেসর···প্রফেসর নাট বল্টু চক্র···চেয়ে দেখুন···টাইম মেশিন থেমেছে।"

যার যা ওষুধ। অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধে জ্ঞান ফিরে আসে, প্রফেসরের জ্ঞান ফিরে এল টাইম মেশিন মন্ত্রটা উচ্চারণ করতে না করতেই। সটান চোখ খুলে স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন—"কি বললে? টাইম মেশিন থেমেছে?"

রাগ হয়ে গেল—"মটকা মেরে পড়েছিলেন নাকি? টাইম মেশিন নাম শুনেই চোখ খুলে ফেললেন?"

জুল জুল করে ইতি উতি তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর। আমার কথা এ-কান দিয়ে ঢুকে ও-কান দিয়ে বেরিয়ে গেল যেন। আশর্য ঘরের অপূর্ব শোভা নিরীক্ষণ করলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, উদ্ভট জটিল সৃষ্টিছাড়া যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন পরম আগ্রহে, তারপর খুট খুট করে নেমে এলেন টাইম মেশিন থেকে। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন যন্ত্রপাতিতে, মুদু-ঘুরন্ত ফ্লাইহুইলটা দেখলেন কিছুক্ষণ।

বললেন ঘাড় নেড়ে—"নাহে, অটোমেটিক রিটার্ন বিগড়েছে মনে হচ্ছে। তিন মিনিট তো কোনকালে পার হয়ে গেল—মেশিন তো জগদ্দল।"

বলতে বলতে নিজের রগ টিপে ধরে মাথা ঝাঁকুনি দিলেন প্রফেসর।

"কী হ'ল ?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধোই আমি। মনের চোখে ভেসে ওঠে প্রফেসরের সেই নির্নিমেষ অপার্থিব চাহনি। আবার উৎপাতটা ফিরে আসছে নাকি ?

"আমার কি হয়েছে বলো তো ?" স্খলিত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর।

"প্রশ্নটা আমিই আপনাকে করব ভাবছিলাম।"

আনমনে প্রফেসর বললেন—"সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে।"

"কি রকম গোলমাল বলুন তো ?"

"সঠিক বলতে পারব না। কিন্তু টের পাচ্ছি কিছু একটা হয়েছে।"

"আমি জানি কি হয়েছে।"

চকিত চোখে প্রফেসর বললেন—"তুমি জানো ?"

"হ্যাঁ, জানি," বলে সংক্ষেপে বললাম কালচে-নীলচে লক্ষ্মীছাড়া বিদ্যুতের কাহিনী। কলকাতার আকাশ থেকে ছিনেজোঁকের মত পেছন নিয়েছে। প্রফেসরের মাথা ঘিরে থেকেই আশ মেটেনি, শরীরের মধ্যে ঢুকে ঘাঁটি গেড়েছে তাতেও বিটলে বিদ্যুতের খাঁই মেটেনি—কপাল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে আমাকেও কুপোকাৎ করার চেষ্টা করেছিল। পারেনি কেবল আমার এই মজবুত ইস্পাত কঠিন শরীরটার জন্যে—বুড়ো হাবড়া হলে কি রেহাই থাকত ?

গড় গড় করে বলতে বলতে থেমে গেলাম। গলায় কথা আটকে গেল বলেই থেমে গেলাম। প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রের সারা শরীর ঘিরে আবার জ্যোতির্বলয় দেখা দিয়েছে। কালচে-নীলাভ দীপ্তিটা প্রখর হতে হতে আবার নিভু-নিভু হয়ে মিলিয়ে গেল। জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রফেসর

খেঁকিয়ে উঠলেন—"চোখ দুটো ওরকম ছানাবড়ার মত হয়ে গেল কেন ?"

"সেই আলোটা—"গলা কেঁপে গেল আমার—"আপনার সমস্ত শরীর ঘিরে সেই আলোটা ফুটি-ফুটি হয়েও আবার মিলিয়ে গেল।"

"ও কিছু নয়। স্পেশ-স্ট্যাটিক। গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপারই নয়।"

"কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম সারা শরীর ঘিরে একটা ছটা—"

"সেন্ট এলমোর আগুনের মত কিছু একটা হবে। সমুদ্রে আকছার দেখা যায়।"

"সেন্ট এলমোর ?"

"হ্যাঁ। মাস্তুলের ডগায় জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করে।"

"আকাশের নচ্ছার মেঘ থেকে যে বিটকেল বিদ্যুৎটা নেমে এসে আপনার ভেতরে ঢুকে পড়ল, সেটাও কি সেন্ট এলমোর আগুন ? আপনি যে কিছুক্ষণ মড়া হয়ে থেকেও আবার জ্যান্ত হয়ে উঠলেন, সেটাও কি সেন্ট এলমোরের আগুনের জন্য ? বিচ্ছিরিভাবে চেয়ে থেকে কপাল থেকে স্পার্ক ছাড়লেন, তাও কি সেন্ট এলমোর বলে চালাবেন ?" রাগে ফুঁসতে থাকি আমি।

"ছিঃ দীননাথ, বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে ওরকম মাথা গরম করতে নেই। তোমার প্রশ্নের জবাব হাজার হাজার বছর আগে বোলতারা দিয়ে গেছে।"

"বোলতা ! বোলতাদের কথা এখানে আসছে কি করে ?"

"মানে, ঠিক এই ধরনের অ্যানাসথেসিয়া তারাও আবিষ্কার করেছিল হাজার হাজার বছর আগে স্রেফ জীব বিবর্তনের তাগিদে।"

"অ্যানাসথেসিয়া !"

"ইয়েস মাই বয়, অ্যানাসথেসিয়া। আকাশের বিদ্যুৎ আমাকে মারেনি কিন্তু মড়া বানিয়ে রেখেছিল—তার জের এখনো চলছে—হ্যাঙ্গওভার বলতে পারো। বেশী মদ গিললে যা হয় আর কি। ব্রেশ কাটেনি এখনো—এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে—"

"প্রফেসর—"

আমাকে আর কথা বলতে না দিয়ে তড়বড় করে প্রফেসর বলে গেলেন—"শিকারী বোলতাদের বহু হাজার বছর আগেকার এই আবিষ্কার-কেই মানুষ সম্প্রতি নতুন করে আবিষ্কার করেছে—যার নাম দিয়েছে অ্যানাসথেসিয়া—"

"ধ্বত্তোর অ্যানাসথেসিয়া— ।"

"শিকারী বোলতা বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে যখন কোনো মাছি বা মাকড়শার ওপর পড়ে তখনই তাকে খতম করে না পুট করে একটা হুল ফুটিয়ে ইঞ্জেকশন দেয়। কিন্তু কী আশ্চর্য ! হতভাগ্য মাছি বা মাকড়শা তাতে মোটেই অক্কা পায় না—শুধু অবশ অসাড় হয়ে যায়। মা-বোলতা তখন সেই অচৈতন্য প্রাণীটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় নিজের বাসায়। এইভাবে সাত-আটটা অচৈতন্য মাছি বা মাকড়শাকে পর-পর সাজিয়ে রেখে সীল করে বন্ধ করে দেয় বাসার মুখ। অদ্ভুত ব্যাপারটা কি জানো ?"

বলে, দম নেবার জন্যে একটু থামলেন প্রফেসর। কিন্তু আমি দম ছাড়বার আগেই আবার শুরু করে দিলেন—"দেখা গেছে, ঐ অচৈতন্য জীবগুলোর সংখ্যা আর বোলতার ডিমের পরিমাণ হুবহু একটা অংকের হিসেবে ছকে নেওয়া—অর্থাৎ ডিম্বস্থ অজাত শিশু বোলতারা 'লারভা' অবস্থায় যেন খাবারের অভাবে পটল না তোলে, অথবা গেণ্ডে মুণ্ডে গিলে যেন পেট ফুলে পঞ্চত্বপ্রাপ্তও না হয়—সে হিসেব পাকা গণিতবিদের মতই করে নেয় অশিক্ষিত মা-বোলতা।"

"বোলতা···বোলতা···বোলতা ! আমি জানতে চাই—"

"চেঁচিও না। ব্যাড হ্যাবিট। জীববিজ্ঞানীরা ঐ বাসা ভেঙে অচৈতন্য প্রাণীগুলোকে পরীক্ষা করে দেখে তাজ্জব হয়ে গেছেন। দেখেছেন, তারা মারা যায়নি, অথচ প্রাণের যে সব লক্ষণ বাইরে থেকে দেখা যায়, তাও দেখা যাচ্ছে না ! এমনই ইঞ্জেকশনের মহিমা যে প্রাণীগুলো জ্ঞান হারিয়ে মড়ার মত পড়ে থাকে, অথচ খাবারের অভাবে নিজেরা অক্কা পায় না ! পুরো সাত-আট সপ্তাহ তারা পড়ে থাকে অসাড় অবস্থায় মড়ার মত। মরণ-ঘুমের মধ্যে জানতেও পারে না কখন বোলতার বাচ্ছা ডিম ছেড়ে লারভা হল, কখন তারা এগিয়ে এল, এবং ধীরে সুস্থে 'ফ্রিজ' করা সারবন্দী তাজা জ্যান্ত খাবার খেতে শুরু করল। মৃত্যু আসে জ্যান্ত অবস্থাতেই, কিন্তু টের পায় না। অদ্ভুত, তাই না দীননাথ ?"

"যেমন আপনাকে মরণঘুম পাড়িয়ে ভুতুড়ে বিদ্যুৎ দখল করছে আপনার সত্তাকে—তখন আর আমাকে চিনতেও পারেন না—উল্টে আমাকেও মরণঘুম পাড়ানোর মতলব আঁটেন। কিন্তু এই হাতের গুলিটা দেখেছেন তো,"

বলে বাইসেপ্স ফুলিয়ে দেখাই আমি—"বিদ্যুতের বাবার ক্ষমতা নেই আমাকে কুপোকাৎ করার।"

অন্যমনস্ক চোখে আমার হাতের গুলির দিকে চেয়ে থেকে প্রফেসর বললেন—"উঁহু, হাতের মাস্‌ল্‌ মোটা বলে তুমি রেহাই পেয়েছো বলে আমার মনে হয় না। বুদ্ধি মোটা বলেই—"

"কী বললেন?"

প্রফেসর আর কিছু বললেন না। একেবারে স্থির হয়ে গেলেন। এতক্ষণ মুখে খই ফুটছিল, অকস্মাৎ বোবা হয়ে গেলেন। মুখের চামড়া ঝুলে পড়ল। চোখের চাহনি পালটে গেল আস্তে আস্তে। আস্তে আস্তে চোখ তুললেন আমার দিকে। সভয়ে দেখলাম, ভয়াবহ সেই কৃষ্ণাভ নীলাভ দ্যুতি দেখা দিয়েছে চোখের তারকায়—প্রফেসর আর চেয়ে নেই আমার পানে। হঠাৎ সমস্ত শরীরটা বিপুলভাবে ঝাঁকুনি খেল একবার…দুবার… তিনবার। প্রফেসর দু'হাতে নিজের দুটো রগ টিপে ধরে ভাঙা গলায় ককিয়ে উঠলেন—"না…না…না!" পরক্ষণেই আবার সেই অশুভবর্ণের বিদ্যুৎ বলয় মাথা ঘিরে ঝলসে উঠেই মিলিয়ে গেল—পরমুহূর্তেই শরীর ঘিরে বিদ্যুৎ বহ্নি চাপা আভার মত বিচ্ছুরিত হল সেকেণ্ড কয়েকের জন্যে। তাও মিলিয়ে গেল অবশেষে।

প্রফেসর কিন্তু সমানে নিমেষহীন নয়নে চেয়ে আছেন আমার পানে। না, প্রফেসর চেয়ে নেই—সেই অলপ্পেয়ে বিদ্যুৎটাই তাঁর ঘাড়ে ভর করে চেয়ে আছে আমার পানে। কেন না হাজার চেষ্টা করেও প্রফেসর হেন সরল মানুষ অমন বক্র কুটিল, ভয়ংকর চাহনি দুচোখের তারায় ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না।

অকস্মাৎ হেসে উঠলেন প্রফেসর। খলখল করে সেকী অট্টহাসি। বিকৃত কণ্ঠের ভয়াল সেই অট্টহাসি শ্রবণ করে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। হাতের বাইসেপ্স ফুটো বেলুনের মতই চুপসে গেল। বুড়ো হাবড়া বলে যে বৃদ্ধকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিলাম, অজ্ঞাতসারেই কয়েক পা পেছিয়ে এলাম তাঁর সামনে থেকে।

প্রফেসরের চোখ দিয়ে দুরাত্মা পামরটা তা অবলোকন করল এবং আর এক পশলা অট্টহাসি বর্ষণ করল নির্মম ভঙ্গিমায়।

তারপরেই যেন কেট্‌ল্‌-ড্রাম বেজে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরে। কোনো

প্রাণীর কথা বলা যে এমন কর্কশ কানঝালাপালা করা বিকট হতে পারে তা না শুনলে প্রত্যয় হবে না। কট্-কট্-ক্যাট্-ক্যাট্ ঝন্-ঝন্-ঝন্ শব্দে 'প্রফেসর' বললেন—"ছোকরা, তোমার গুরু ঠিকই বলেছেন, বুদ্ধি তোমার মোটা বলেই রেহাই পেয়ে গেলে।"

উচ্চারণ জড়িত, শব্দগুলোও অস্ফুট, প্রফেসর সাত জন্ম ভেনট্রিলো-কুইজ্ম্ সাধনা করলেও অমন রক্ত-জল করা কণ্ঠস্বর রপ্ত করতে পারবেন না।

গলা শুকিয়ে গেছিল। ঢোক গিললাম কেবল।

কণ্ঠস্বর বললে—"আমি দখল করি কেবল মনকে, মেধাকে—তোমার মত নিরেট মাথায় তাই আমার ব্রহ্মাস্ত্র প্রবেশ করল না। আশা করি তোমার মত হেঁড়ে মাথা পৃথিবীতে খুব বেশী নেই।"

গা-পিত্তি জ্বলে গেল। রেগে তিনটে হয়ে বললাম—"তুমি কে হে ছোকরা?"

"ছোকরা!" আবার সেই কাড়া-নাকাড়া মার্কা কর্কশ হাসি। "ছোকরা কি হে! আমার বয়স শুনলে যে এখুনি ভিরমি খাবে।"

"কত বয়স?" একটু একটু সাহস সঞ্চিত হতে থাকে আমার। রেগে গেলে যা হয় আর কি!

"তা কি আর আমারও মনে আছে ছাই। কত লক্ষ বছর যে মহাশূন্যে ভেসে ভেসে বেড়িয়েছি, সে হিসেব আমিও ভুলে মেরে দিয়েছি।"

"মহাশূন্যের জীব তুমি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তুমি কি ভেবেছিলে?"

"ভূত-প্রেত হবে," তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম বটে, কিন্তু গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

"ভূত প্রেত? তোমাদের পৃথিবীর অভিধানে যাকে বলে অশরীরী? বিদেহী? হাঃ হাঃ হাঃ অশরীরী তো আমিও। আমার শরীর নেই—কিন্তু আমি ভয়ংকর! আমার দেহ নেই বলেই তো চাই এমন একটা দেহ যার মাথায় গোবর নেই—বুদ্ধি আছে মন আছে, মেধা আছে। আমার ক্ষিদে শুধু মন আর মেধা—আর কিচ্ছু নয়। হাঃ, হাঃ, হাঃ!"

"যে চুলোয় ছিলে অ্যাদ্দিন, সেই চুলোয় বিদেয় হও। প্রফেসরকে রেহাই দাও।"

"আমার চুলোর কি ঠিক আছে হে ? আমি ভেসে ভেসে বেড়িয়েছি নক্ষত্রদের পাশ দিয়ে, ছায়াপথের পর ছায়াপথের মধ্যে দিয়ে, কত তারকার জন্ম দেখেছি, কত তারকার বিস্ফোরণ দেখেছি, কত ধূমকেতুর উড়ে যাওয়া দেখেছি, কত গ্রহকে ধূমকেতুর ধাক্কায় নতুন রূপ নিতে দেখেছি—যেমন ঘটেছিল তোমাদের পৃথিবীর ক্ষেত্রে—ধূমকেতুর ধাক্কায় মহাপ্লাবন হল, অগ্ন্যুৎপাত ঘটল, আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি হল, পেট্রল বৃষ্টি হল, পৃথিবীটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল—আমি তখন পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলাম। দেখলাম সমুদ্র ফুটছে, মহাদেশ তেতে লাল হয়ে গেছে, পাথর গলে যাচ্ছে, জঙ্গল পুড়ছে। আমি দেখলাম বৃহস্পতি গ্রহের খানিকটা অংশ ছিটকে এসে ধূমকেতু হয়ে গেল—পৃথিবীটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে নিজে হয়ে গেল আর একটা গ্রহ—তোমাদের শুক্রগ্রহ। পৃথিবীতে পালে পালে মানুষ মরছে দেখে টহল দিতে গেলাম ছায়াপথের অন্য অঞ্চলে। ফিরে এসে দেখি পৃথিবীতে আবার মেধার সৃষ্টি হয়েছে। সারা গ্রহটাকে চাঁকপাক দিয়ে সন্ধান পেলাম তোমার এই গুরুদেবের—যার চাইতে বড় মেধা আজও কোথাও পাইনি। হে মূর্খ, আমার মধ্যে শক্তি আছে। তবুও আমি অসহায়—কারণ আমার দেহ নেই। আমি সর্বশক্তিমান হয়েও নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকেছি। প্রাণময় হয়েও নিষ্প্রাণ হয়ে থেকেছি—মন আর মেধার সন্ধানে বুভুক্ষের মত হন্যে হয়ে এক নক্ষত্র জগৎ থেকে আরেক নক্ষত্র জগতে পাড়ি জমিয়েছি। আজ আমার অভিযান সার্থক হয়েছে—পেয়েছি উপযুক্ত আধার—প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র এখন আমার।"

"না, আমার!" ক্ষিপ্তের মত চিৎকার করে বললাম আমি।

অট্ট অট্ট হাসি হাসল কণ্ঠস্বর—"বালক, তোমাকে আমার দরকার নেই। তোমার মন নেই, মেধাও নেই। আছে গুচ্ছের মাংসপেশী—যা সংহার করতে পারি চোখের নিমেষে।"

ধূর্ত চোখে তাকিয়ে মুখ বেঁকিয়ে হাসলাম এতক্ষণ পরে—"কচু পারো। তা পারলে কি আর এতক্ষণ টিকিয়ে রাখতে? তোমার কুচুটে বিদ্যুতের দৌড় তো দেখলাম। আমার এই গুচ্চের মাংসপেশীর কাছে তোমার অশরীরী কেরামতি—"

আমার গলার আওয়াজ ডুবিয়ে এমন একখানা বিচ্ছিরি হাসি হাসল হতচ্ছাড়া কণ্ঠস্বর যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল আমার। কট্-

কট্-ক্যাট্-ক্যাট্ ঝন্-ঝন্ ঝ্যান-ঝ্যান মার্কা সৃষ্টি ছাড়া জগঝম্প বাজনা বাজিয়ে হাসতে হাসতে বললে—"হে বিখ্যাত মূর্খ, শরীর দরকার তো সেই জন্যেই।"

"শরীর! মূর্খাধিপতি কুচুণ্ডে, তোমার শরীর তো এক বৃদ্ধের। আমার এই বাইসেপ্সের মাপটা জানো?"

এবার গোটা ঘরটাই ঝন্ ঝন্ করে উঠল হাসির দমকে। মহাকাশের ভূত বাবাজী খুব রসিক যা হোক। কথায় কথায় তামাশা করতে পারে। হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়ে আর কি। তাল সামলাতে না পেরে টলমল করে ঠিকরে গেল দেওয়ালের দিকে। দড়াম করে ধাক্কা খেল দেওয়ালের গায়ে। এবং পরক্ষণেই ঝড়াং করে সিধে হয়ে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে।

হাতের মুঠোয় দেখলাম একটা রে-গান। ১৯৮১-র পৃথিবীতে বাচ্চারা যে রে-গান নিয়ে লড়াই-লড়াই খেলা করে, অবিকল সেই ডিজাইনের। দেওয়ালের গায়ে অগুন্তি বিদঘুটে যন্ত্রের মাঝে ক্লিপে আটকানো ছিল, মহাশূন্যের ভূত আমার সঙ্গে মস্করা করার অছিলায় ছিটকে গিয়ে এই অস্ত্রটিই দেওয়াল থেকে খসিয়ে এনে তাগ করে ধরেছে আমার দিকে।

খেলনা দেখে ভয় পাওয়া উচিত নয়। তবুও ভয় পেলাম। ১৯৮১-র মেদিনীতে যা খেলনা, ৫০০০ সালের টাইটান উপগ্রহে তা কি আর নিছক খেলনা? সুতরাং হুঁশিয়ার হওয়াই ভাল।

বাইরে কিন্তু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম—"লড়াই-লড়াই খেলবে বুঝি? কিন্তু কিরকম আক্কেল তোমার? শুধু হাতে খেলা যায়? দাও আমাকে আর একটা।"

বলেই এক-পা বাড়ালাম দেওয়ালের দিকে—যেদিকে আর একখানা রে-গান দেখেছিলাম ক্লিপে-সাঁটা অবস্থায়।

কিন্তু ঐ এক-পা-র বেশী আর এগোতে হল না। যেন সর্পরাজ কালীয় গর্জে উঠল সহস্র ফণায়। শ্রীকৃষ্ণ কালীয় হ্রদে ঝাঁপ দিলে কালীয়'র সহস্র ফণা দিয়ে আগুন আর ধোঁয়া ঠিকরে এসেছিল—কিন্তু ভূতাবিষ্ট প্রফেসরের দুটো চোখ দিয়ে কেবল ঠিকরে এল কালচে-নীল স্ফুলিঙ্গ—ধোঁয়াটারই যা কেবল আবির্ভাব ঘটল না ব্যাদিত মুখগহ্বরে।

ভীষণ গর্জে উঠে, রে-গান আমার দিকে নির্ভুল লক্ষ্যে তাগ করে

বললে মহাশূন্যের ভৌতিক কণ্ঠস্বর—"খবরদার! তোমার হাড় মাস পিণ্ডি পাকাতে বাহুবলের প্রয়োজন হবে না—অস্ত্রবলই যথেষ্ট। এখন বুঝেছো দেহধারণ করার প্রয়োজন কেন?"

আমার তখন হাঁটু পর্যন্ত অবশ হয়ে এসেছে। ঐ গর্জন আর ঐ স্ফুলিঙ্গ দেখে আমি তো আমি, ভীম-কুম্ভকর্ণ-হারকিউলিসরাও পিঠটান দিত।

এমন সময়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। আচমকা থরথর করে কেঁপে উঠল প্রফেসরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত। খুবজোরে বার দুয়েক মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর—এত জোরে যে ভয় হল ঘাড় থেকে মাথাখানা খসে না পড়ে। ঐ তো পলকা ঘাড়!

পরক্ষণেই চোখ বুজে ককিয়ে উঠলেন প্রফেসর তাঁর চির-পরিচিত কণ্ঠস্বরে—"না···কক্ষনো না! দীননাথ, আমি পারছি না···সরে যাও··· পালাও!"

বলতে না বলতেই আবার সেই ঝাঁকুনি। বুড়োর ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যাবে যে! আবার কয়েক ঝলক নীলাভ-কালচে বিদ্যুৎ বহ্নি বিচ্ছুরিত হ'ল সারা গা ঘিরে—সেই সঙ্গে মাথা বেড় দিয়ে লিকলিক করে উঠল অলক্ষণে সেই বিদ্যুৎ বলয়। নেতিয়ে পড়লেন প্রফেসর—ক্ষণেকের জন্যে ঠিক যেন গলা টিপে ঘাড় গুঁজে ধরে পায়ে টিপে শায়েস্তা করা হল বেচারী প্রফেসরকে। চোখ আবার খুলে গেল, আবার নির্গত হল স্ফুলিঙ্গ, সিধে হল শিরদাঁড়া। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল ভয়াল কণ্ঠস্বর—"জাহান্নমে যা!"

বলেই, রে-গানের ট্রিগার টিপে দিল প্রফেসরের আঙুল।

কিন্তু তার আগের কয়েক সেকেণ্ডের প্রচণ্ড খেঁচুনি আর দুটো সত্তার মধ্যে ধস্তাধস্তির ফলে লক্ষ্য আর ঠিক থাকেনি। একচুলের জন্যে বেঁচে গেলাম আমি। কড়-কড়-কড়াৎ শুধু একটা আওয়াজ হল, আগুন-টাগুন কিচ্ছু দেখতে পেলাম না রে-গানের মুখে। আমার পায়ের কাছ থেকে খানিকটা মেঝে হঠাৎ শূন্যে মিলিয়ে গেল। দেখা গেল একটা গহ্বর। ভক্ করে একতাল কটু গ্যাস ঘরে ঢুকল তার মধ্যে দিয়ে। আমার নাকে লাগতেই খক-খক করে করে কাশতে কাশতে চোখে ধোঁয়া দেখলাম। টলে পড়ে যেতে যেতে যেন কুয়াশার মধ্যে দেখলাম ভূতাবিষ্ট প্রফেসরও সটান

আছড়ে পড়লেন মেঝেতে—রে-গান ঠিকরে গেল হাত থেকে। তারপর আর মনে নেই।

৮ ॥ মহাশূন্যের ভূত

চোখ মেলে দেখলাম আমার ওপর ঝুঁকে রয়েছে অনেকগুলো মুণ্ড। মাথার ওপর জ্বলছে ঘরের ছাদ—পুরো ছাদটাই মৃদু আলোয় আলোকিত। মুণ্ডগুলোর মুখে মৃদু হাসি। অভয়ভরা স্নিগ্ধ দৃষ্টি। কারও মুখ কালো, কারও সাদা। চুলও হরেক রঙের। প্রত্যেকের কপালে একটা সাদা পাঁট—তাতে লাল রেড ক্রশ।

দেখে তো অবাক! এ আবার কোথায় এলাম? জ্ঞান হারানোর আগে তো মুণ্ডধারীদের কাউকে দেখিনি। প্রত্যেকটা মুণ্ডই মানুষের। পোশাকও বিংশশতাব্দীর পোশাকের মত—শুধু যা ঢিলেঢালা এবং মসৃণ উজ্জ্বল কোনো ধাতু নির্মিত। বয়ন শিল্পেও অভিনবত্ব আছে। এক-এক জনের পোশাক এক এক রকমের। তাক লেগে যায়। পোশাকের ডেস্-ক্রিপ্শন দিতে গেলে এ কাহিনী লম্বা হয়ে যাবে—তাই বাদ দিলাম।

একটা মুণ্ড হাসি হাসি মুখে বললে—"স্বাগতম।"

স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে ছিটকে উঠে বসলাম। বলে কি লোকটা! স্বাগতম! টাইটান উপগ্রহে খাঁটি বঙ্গভাষায় আপ্যায়ন জানায়, এ কোন আদমী রে বাবা!

বিষম বিস্ময়টা কথা হয়ে ঠিকরে এল গলা দিয়ে—"মানে?"

"মানে, টাইটানে স্বাগতম জানাই পৃথিবীর মানুষকে।"

এবার কিন্তু আমি বাক্‌রহিত হয়ে গেলাম। বাক্‌যন্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। চোখ দুটোও নিশ্চয় ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল এবং হাস্যকর হয়ে উঠেছিল মুখভাব। কেননা, মুণ্ডধারী অভয়দ চাহনি দিয়ে নিষিক্ত করতে করতে ফিক্ করে হেসে ফেলল—"এত অবাক হচ্ছেন কেন?"

বিদ্রোহী বাক্‌যন্ত্রকে দমন করে আবার সরব হল আমার কণ্ঠস্বর—"এর পরেও বলছেন অবাক হচ্ছি কেন?"

"কেন বলুন তো?"

"এ সালটা খেয়াল আছে?"

"পৃথিবীর হিসেবে, মানে, যিশুখৃষ্টের জন্মের হিসেব ধরে, ৫০২১ সাল।"

"আমি এসেছি পৃথিবীর ১৯৮১ সাল থেকে।"

"তাতে হয়েছে কী ?"

"হওয়ার আর বাকী রাখলেন কী ? তিন হাজার তিনশ চল্লিশ বছর পরেও বাংলা শুনতে হচ্ছে বারো হাজার সাতশ পঁয়ষট্টি লক্ষ কিলোমিটার দূরের গ্রহ শনিগ্রহের উপগ্রহ টাইটানে ! আমি কি পাগল হয়ে গেলাম ? নাকি আমি মরে ভূত হয়ে গেছি ?"

"কোনোটাই হ'ন নি। আমরি বাংলা ভাষা আরও হাজার হাজার বাঁচবে —ছায়াপথের যেখানে যেখানে মানুষ কলোনী গড়ে তুলছে—সব জায়গায় বাংলাভাষাই আমাদের কথোপকথনের একমাত্র ভাষা।"

"তার মানে আপনি বলতে চান আপনি···আপনারা বাঙালী ?"

"আমরা পৃথিবীর মানুষ।"

সাদা কালো মুখ এবং হরেক রঙের চুল লক্ষ্য করলাম। মুখের গঠনও বিভিন্ন রকমের। নিগ্রো, ককেশীয়, ভারতীয়—সব জাতের মানুষই আছে এদের মধ্যে।

বললাম—"পৃথিবীর সব জাতের মানুষ ?"

হাজার হাজার বছর আগে অনেক জাত ছিল বটে পৃথিবীতে, এখন নেই। এখন সেখানে একটাই জাত—মানুষ জাত। একটাই ভাষা—বাংলা ভাষা।"

"কিন্তু সামান্য একটা প্রাদেশিক ভাষা বিশ্বজনীন ভাষা হ'ল কি করে তাই তো বুঝতে পারছি না।"

"খুব সহজে। বিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষাই ছিল একমাত্র ভাষা যার মধ্যে উন্নাসিকতা ছিল না, সংকীর্ণতা ছিল না, কূপমণ্ডুকতা ছিল না। বাংলা ভাষাই ছিল একমাত্র ভাষা যে ভাষার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছিল বিবিধ অনুবাদের মধ্যে দিয়ে। মনে প্রাণে বাঙালীরা ছিল উদার এবং প্রেমিক। নিজেদের দেশে বিশ্বের সব জাতকে ঠাঁই দিয়ে তাদের যেমন আপন করে মাটির মানুষ করে নিয়েছিল, বিশ্বের সব ভাষাকেই বাংলা ভাষায় মিশিয়ে আদি ভাষার পুষ্টি সাধন করে উন্নত করেছিল। একদল গোঁড়া সংরক্ষণশীল বাঙালী যদিও পরিভাষা নিয়ে খুব মাতামাতি জুড়েছিল—কিন্তু খটমট দাঁতভাঙা দুর্বোধ্য পরিভাষার চাইতে বিদেশী শব্দগুলো যে অনেক অর্থবহ, প্রাঞ্জল এবং সহজ, এই সত্য হাড়ে

হাড়ে টের পেয়েছিল দেশের মানুষ—তাই পরিভাষা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ধোপে টেঁকেনি—ভাষা সম্প্রসারিত হয়েছে, চৌহদ্দি বিস্তৃত হয়েছে, ক্রমশঃ তা সমৃদ্ধ হয়েছে। শেষে এমন একটা অবস্থায় পেঁছেছে যখন বিশ্বের সব মানুষই তাদের ভাষার ভাণ্ডার দেখতে পেয়েছে বঙ্গভাষার মধ্যেও, বঙ্গভাষাকে আর বিদেশী ভাষা বলে মনে হয়নি—উপরন্তু ক্রম বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃত-ভিত্তিক বঙ্গভাষা এমন উৎকৃষ্ট পর্যায়ে পেঁছেছিল যে বিশ্বের সব মানুষকে যখন একভাষার সূত্রে গাঁথার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন ভাষাবিদরা বঙ্গভাষার বিকল্প আর খুঁজে পেল না। হাজার হাজার বছর পরে তাই বাংলাভাষাই মানুষ জাতের একমাত্র ভাষা—যে ভাষার মধ্যে পাবেন বাংলা বানানে বহু বিদেশী শব্দ—প্রতিশব্দ নয়। ফলে প্রতিটা শব্দই প্রকৃত অর্থবোধক। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের ঐশ্বর্য তাই এত বৃদ্ধি পেয়েছে, আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক শব্দ সম্ভার বাংলাভাষার অঙ্গীভূত হয়ে অনেক অসুবিধে দূর করেছে।”

দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বক্তা স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন আমার পানে। ভদ্রলোক দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ, খাড়া নাক, চওড়া কপাল, ধারালো চিবুক এবং চাহনি বেশ তীক্ষ্ন। মুখের গড়ন দেখে বোঝা যায় না কোন দেশের মানুষ। খাড়া নাকের জন্য মনে হয় ইউরোপীয়ও বটে, আবার পুরু ঠোঁট আর উঁচু হনুর জন্য নিগ্রোও বটে, কৃষ্ণ চক্ষুর জন্যে স্পেনীয় বা ভারতীয়ও হতে পারে। অমন খাসা সোনালী রেশমী চুলের জন্যে ইংরেজ বলেও ভাবা যায়। হাজার হাজার বছরের ক্রমবিবর্তনের ফলে সব জাত মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে—তার জীবন্ত নিদর্শন চোখের সামনে।

প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে বক্তা বললে—“আরও জিজ্ঞাস্য আছে নাকি ?”

“ক্রমশঃ প্রকাশ্য,” বললাম আমি। “সবার আগে যা জানতে চাওয়া উচিত ছিল, এবার তা জিজ্ঞেস করছি। প্রফেসর কোথায় ?” বললাম খুব কুণ্ঠার সঙ্গে। বিস্ময়ের তাড়নায় মূল জিজ্ঞস্যটাই বিস্মৃত হয়েছিলাম এতক্ষণ।

ভ্রূ কুঞ্চিত হল বক্তার। জ্বল জ্বল করতে লাগল ভুরু জোড়ার ওপরে লাল রেডক্রশ। হাজার হাজার বছর আগেকার রেডক্রশ। চিকিৎসার প্রতীক। আজও তা অব্যাহত—এবং সুদূর টাইটানে। আমিও যে চিকিৎসা কেন্দ্রে আছি, তা ঐ রেডক্রশ চিহ্ন দেখেই মালুম হয়েছিল। এদের জিম্মায় বহাল

তাঁর মতে নিশ্চয় আছেন—অবচেতন মনের কারসাজিতেই তাঁর কথা নিশ্চয় এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। কুণ্ঠা ঈষৎ স্তিমিত হল।

ভ্রূভঙ্গি করে বক্তা বললে—"বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহলে শিক্ষাবিদ্? কিসের প্রফেসর?"

"কিচ্ছুর না। উনি সখের বৈজ্ঞানিক।"

"নাম?"

"প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র।"

"প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র।" চিন্তান্বিত মুখে স্বগতোক্তি করল বক্তা।

"নামটা যেন শুনেছি মনে হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর অনেক অদ্ভুত কাণ্ড কারখানার স্রষ্টা দ্য গ্রেট বেঙ্গলী ব্রেন?"

বুকটা দশ হাত হয়ে গেল প্রফেসরের সুখ্যাতিতে। পাঁচ হাজার তিনশ একুশ সালে সুদূর টাইটান গ্রহেও তাহলে ওঁর নাম পেঁছেছে!

বললাম বুক ফুলিয়ে—"হ্যাঁ, তিনিই।"

সাগ্রহে বললে বক্তা—"আমাদের পরম সৌভাগ্য তাঁকে আমাদের মধ্যে পাওয়ার জন্যে। কিন্তু তিনি হঠাৎ ঐ জবরজং টাইম মেশিনটা আবিষ্কার করতে গেলেন কেন?"

বেশ শরীফ ছিল মেজাজটা, গেল খিঁচড়ে সময়-গাড়ীকে জবরজং বলায়। যদিও ঐ বিদখুটে কলখানা বিকল হওয়ার ফলেই সময় স্রোতে এবং ঘটনা স্রোতে ভাসতে ভাসতে এতদূরে চলে এসেছি, তবুও তাকে জবরজং বললে রাগ তো হবেই।

কাষ্ঠকণ্ঠে বললাম—"জবরজংয়ের কি দেখলেন? অমন মেশিন পারবেন আপনারা আর একটা আবিষ্কার করতে?"

আমার উষ্মা দেখে মৃদু হাসিতে মুখ ভরিয়ে বক্তা বললে—"আপনাকে আঘাত দেওয়ার জন্যে কথাটা বলিনি। অন্যায় হয়েছে, মাপ চাইছি, কিন্তু কি জানেন—আপনার নামটা কিন্তু জানা হয়নি।"

"দীননাথ।"

"আমার নাম কৌ। ডক্টর কৌ।"

"কৌ! এ আবার কি নাম? ছেলেবেলায় আমার ক্লাসে কৌস্তুভ নামে একটা ছেলে ছিল। তাকে শর্টকাটে ডাকতাম কৌ বলে – আপনারাও ঐ ভাবে নাম শর্টকাট করেছেন নাকি?"

"ঠিক ধরেছেন। আজকাল নামকেও কেটে ছেঁটে ছোট করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে আপনারা যেমন 'কুমার' বাদ দিয়েছিলেন নামের প্রথম আর শেষ শব্দ দুটোর মাঝখান থেকে—সেই রকম ভাবে আমারও পুরো নামটাকেই সংক্ষিপ্ত করে এনেছি সময় বাঁচানোর জন্যে। যাক, যা বলছিলাম দীননাথবাবু।"

"বলুন, বলুন। টাইম মেশিনকে জবরজং বললেন কেন? জানেন ১৯৮১-র পৃথিবীতে টাইম মেশিন এখনো একটা কপোল কল্পনা? অলীক বিস্ময়? টাইম মেশিন যে সম্ভবপর হতে পারে, কোনো সিরিয়াস বৈজ্ঞানিক তা বিশ্বাস করেন না? কিন্তু প্রফেসর সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছেন স্রেফ ঝোঁকে পড়ে। আর আপনি বলছেন কিনা মেশিনটা জবরজং? প্রথম আবিষ্কার ঐ রকমই হয়। পরে ঠিক হয়ে যায়। যেমন মোটর, এরোপ্লেন, সাবমেরিন '

নরম হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে নিশ্চুপে আমার কথার ফুলঝুরি শুনছিলেন ডক্টর কো। আমি গজগজ করতে করতে স্তব্দ হতেই বললেন মোলায়েম গলায়—"খুব রেগেছেন দেখছি। কিন্তু আপনি খাঁটি কথাই বলেছেন।"

"তবে?"

"প্রথম আবিষ্কার ঐ রকমই হয়। এখনকার টাইম মেশিন অনেক উন্নত।"

চোয়াল ঝুলে পড়ল আমার—"টাইম মেশিন আপনারাও করেছেন নাকি?"

চোখ নাচিয়ে ডক্টর কো বললেন "করেছি বইকি। কিন্তু আমরা তাকে টাইম মেশিন বলি না।"

"কি বলেন?"

"স্পেশ মেশিন।"

"কেন?"

"কেন না ওই মেশিনে চেপেই গ্রহ গ্রহান্তরে চক্ষের নিমেষে উপস্থিত হই আমরা। স্পেশ শিপে চেপে গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়া আর ডিঙ্গি নৌকোয় চেপে মহাসাগর পাড়ি দেওয়া একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, তাই নয় কি? গতির যুগে তাই স্পেশ শিপ এখন অচল—এসেছে স্পেশ মেশিন।"

"স্পেশমেশিনে চেপে গ্রহগ্রহান্তরে পাড়ি।" বিমূঢ়ের মত বললাম আমি।

"এতে অবাক হওয়ার কি আছে? ভর্টেক্সের নাম শুনেছেন?"

"ভর্টেক্স! ঢোক গেলে বললাম—"না তো!" সেই মুহূর্তে মনে পড়ল আমার প্রতি প্রফেসরের একটি প্রিয় গালাগাল। খুব রেগে গেলে সংস্কৃত ঝাড়েন প্রফেসর। আমাকে সংস্কৃত গালাগালি দিয়ে বলেন—কিং জীবিতেন পুরুষস্য নিরক্ষরেণ। ব্যংলাটাও করে দেন সঙ্গে সঙ্গে—মূর্খ পুরুষের জীবনধারণ নিষ্ফল। ডক্টর কৌয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে মরমে মরে গেলাম আমি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! প্রফেসর থাকলে কি এ অবস্থায় পড়তে হত!

আমার মুখভাব অবলোকন করে আমার মনের কথা যেন আঁচ করে ফেললেন ডক্টর কৌ। এবং কী আশ্চর্য! জবাবও দিলেন সংস্কৃতে।

বললেন—"ন হি সর্ববিদঃ সর্বে।"

"মানে?" আচমকা প্রশ্নটা ছিটকে বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। বলে ফেলেই কানের ডগা পর্যন্ত লাল করে ফেলেছিলাম নিশ্চয়, কেন না ডক্টর কৌ অনেকটা সান্ত্বনার সুরে বললেন—"মানে হ'ল সকলেই সব বিষয় জানে না।"

"তা ঠিক" বললাম কাষ্ঠ হেসে—"কিন্তু ঐ কর্টেক্স মানেটা?"

"কর্টেক্স নয়—ভর্টেক্স" মোলায়েম হাসি হাসলেন ডক্টর কৌ। ভর্টেক্স হল স্পেশ আর টাইমের মধ্যে সেই রহস্যজনক অঞ্চল যেখানে এই দুটো মিলে এক হয়ে গেছে। আমাদের স্পেশ মেশিন এই ভর্টেক্সের মধ্যে দিয়ে ট্র্যাভেল করে—চকিতে পৌঁছে যায় এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে—ছায়াপথের দূর দূরান্তের গ্রহে। কোটি কোটি টাকার জ্বালানি পুড়িয়ে গরীব পৃথিবীকে আরও গরীব করার আর দরকার হয় না। ভর্টেক্স নামটা কিন্তু আপনার জানা উচিত ছিল দীননাথবাবু। প্রফেসরের সঙ্গে যখন টাইম মেশিনে সময়পথের পর্যটক হয়েছেন, সায়েন্স ফিকশনে নিশ্চয় অনুরাগ আছে?"

"আছে বইকি। আমি নিজে তো লিখি।" গর্বের সঙ্গে বললাম।

"তাহলে তো ভর্টেক্স নামটা জানা উচিত ছিল। এই নামেই বিংশ শতাব্দীর বৃটেনে একটা সায়েন্স ফিকশন ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া, ভর্টেক্স হাইপার স্পেশ ইত্যাদি শব্দগুলো আপনার যুগের সায়েন্স

ফিকশন মহলেই তো বেশী প্রচলিত—বিজ্ঞানী মহল নিশ্চয় নাক সিঁটকোন ?"

লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলাম মৃদু ভর্ৎসনায়। কি করে ভদ্রলোককে বলি যে আমরা যারা সায়েন্স ফিকশন লিখি তারা না পড়ে না জেনেই লিখি। তাই তো বাংলার সায়েন্স ফিকশন অপাংক্তেয়ই হয়ে রইল—জাতে আর উঠল না। এই সুযোগে কিছু ব্যক্তি সায়েন্সকে ঠেসেঠুসে সায়েন্স ফিকশনের মধ্যে ঢুকিয়ে ফিকশনকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিচ্ছেন। ফলে সায়েন্স ফিকশন হচ্ছে না-সায়েন্স না-ফিকশন—সে এক উদ্ভট বস্তু। কিন্তু ডক্টর কৌ-য়ের কাছে আমাদের দুরবস্থার কথা ফাঁস করা ঠিক হবে না। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে বিষম উদ্বিগ্ন হওয়ার অভিনয় করে বললাম—"কিন্তু প্রফেসর কোথায় ?"

সৌম্যদর্শন ডক্টর কৌ অতিশয় ধড়িবাজ। আমার মতলব বুঝে শুধু একটু মুচকি হাসলেন। বললেন—"দেখবেন ?"

"নিশ্চয় ! চলুন, যাই।"

"যেতে হবে না। এখানে বসেই দেখবেন।"

৯ ॥ অজ্ঞাত জীবাণু

আশ্চর্য শৃঙ্খলাবোধ বটে ডক্টর কৌ-য়ের সঙ্গীদের। এতক্ষণ কথা বলে গেলেন ডক্টর কৌ একাই, ঘরশুদ্ধ কেউ টুঁ শব্দটি করেনি। হাজার হোক আমি তাদের দেশে আগন্তুক। মামুলি আগন্তুক নয়—তিন হাজার তিনশ সাত চল্লিশ বছর আগেকার প্রাচীন পৃথিবী থেকে এসেছি। ১৯৮১-র পৃথিবীতে পৌরাণিক যুগের বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা কণাদমুনি সহসা টাইম মেশিনে চেপে উপস্থিত হলে নিশ্চয় কেউ মুখে চাবি এঁটে বসে থাকতাম না। পরমাণুবাদী কণাদকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করতাম। জিজ্ঞেস করতাম, সত্যিই কি তিনিই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পরমাণুবাদের প্রচারক ? জানতে চাইতাম, কেন তাঁর দর্শনে, মানে কণাদ-দর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় না ? কোন্ তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি 'বিশেষ' নামক এক অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেছেন ? কোন প্রমাণের বলে তিনি বলেন যে একমাত্র পরমাণুই সৎস্বরূপ নিত্যপদার্থ, তার আর কারণ নেই ? কী-কী পরীক্ষা করবার পর তিনি বলতে শুরু করেন যে সমস্ত জড়পদার্থই পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হয়েছে—বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে বিশেষ

নামে একটি পদার্থ আছে—তারই শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণু ভিন্ন বলে প্রতীতি হয়? হাজার জিজ্ঞাসা আর কৌতূহলে নাজেহাল করে দিতাম তণ্ডুলকণা ভক্ষক মহর্ষি কণাদকে—বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আমাদের এতই বড় প্রবল—প্রবলতর আমাদের শৃঙ্খলা বোধ-হীনতা। কিন্তু টাইটানের এই এক-জাত এক-মানুষ সম্প্রদায়ের মানুষগুলি যেন অন্য ধাতুতে গড়া। দীর্ঘ বাক্য বিনিময়ের মধ্যে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল—বাক্যস্ফূর্তি ঘটল না কারো কণ্ঠে—আঙুল পর্যন্ত নাড়িয়ে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করল না। ক্রম বিবর্তন মানুষকে দেখছি অনেক সম্পদ দান করেছে, তার মধ্যে পেয়েছে তিনটি মহাশক্তি—ধৈর্য, তিতিক্ষা আর সহিষ্ণুতা।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করে বললাম—"কই দেখান?"

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আন্দোলনে সংকেত করলেন ডক্টর কো। শ্যামল বরণ না-নিগ্রো না-ইউরোপীয় এক পুরুষ গিয়ে দাঁড়াল মৌচাকের খোপের মত দেওয়ালের সামনে। হাত বাড়িয়ে একটা বোতাম স্পর্শ করতেই ডক্টর কো বলে উঠলেন—"ঋ, দাঁড়াও। ভিসিফোন পরে, আগে স্পেশ রাডার স্ক্রীন।"

হাত সরিয়ে নিয়ে তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়ে প্রায়-অদৃশ্য একটি বোতাম স্পর্শ করল ঋ নামক না-নিগ্রো না-ইউরোপীয় যুবকটি। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের একটা আয়তাকার অংশ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল বহুবর্ণের ছটায়। অপরূপ দৃশ্য ভেসে উঠল পর্দার বুকে। কালার-টেলিভিশন যারা দেখেছে, তারাও হতবাক্ হয়ে যাবে সেই বিচিত্র বর্ণসমাহার দেখে। চুলের মত সূক্ষ্ম রেখাগুলি পর্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠল পর্দার ছবিতে। ছবিটা শনিগ্রহের। বিশাল গ্রহ ভাসছে মহাশূন্যে। জ্যোতির্বলয়ের মত একটা আংটির বেড় রয়েছে চারদিকে। এত কাছ থেকে এত স্পষ্টভাবে রহস্যাবৃত এই গ্রহকে ১৯৮১-র কোনো বৈজ্ঞানিক আজ পর্যন্ত দেখেননি। তাঁরা দেখেছেন উড়ন্ত মহাকাশযান থেকে পাঠানো ঝাপসা ছবি—আর আমি দেখছি সরাসরি সুস্পষ্ট শনি-চিত্র। মুগ্ধ চোখে তাই চেয়ে রইলাম।

সম্বিৎ ফিরল ডক্টর কো-য়ের কণ্ঠস্বরে। আত্মসমাহিত ভাবগম্ভীর স্বরে তিনি বললেন—"এই আমাদের বর্তমান উপনিবেশ। হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবী থেকে অভিযানে বেরিয়েছিল আমাদের পূর্ব-

পুরুষ। মহাশূন্যের বহু গ্রহ উপগ্রহে কলোনী সৃষ্টি করেছিল—মর্তের মানুষ তাই আজ স্বর্গকেও অধিকার করেছে। পৌরাণিক যুগে আকাশ-কেই তো আপনারা স্বর্গ বলতেন, তাই না দীননাথবাবু? সেই আকাশ, মহাকাশ, মহাশূন্য, ছায়াপথ এবং কোটি কোটি নক্ষত্রলোকে আজ আমরা ঘুরেছে বিচরণ করি শুধু স্পেশ মেশিনের দৌলতে। পৃথিবীতে আর আমরা ফিরে যেতে চাই না স্বর্গলোক ছেড়ে।—ঋ, টাইটান দেখাও।"

ঋ স্পর্শ করল আর একটা বোতাম। সমুজ্জ্বল হ'ল আর একটা ধাতব পর্দা। বিপুল উপগ্রহ টাইটান ঝলমল করতে লাগল চোখের সামনে। দ্রুত তা কাছে এগিয়ে এল···আরও কাছে···আরও। দানবিক ফ্যান দেখলাম অনেকগুলো। সারা উপগ্রহ-পৃষ্ঠ জুড়ে খাড়া রয়েছে অতি-কায় ফ্যানের পর ফ্যান।

গাঢ় স্বরে কানের কাছে বললেন ডক্টর কৌ—"হাইড্রোজেন-মিথেন বায়ুমণ্ডলকে শুষে নেওয়া হচ্ছে, সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে দিয়ে জমা করা হচ্ছে স্টোরেজ ট্যাঙ্কে। এই থেকেই তৈরী হচ্ছে কেমিক্যাল বুস্টার ফুয়েল—এর শেষ নেই—শেষ নেই আমাদের শক্তিরও। বিংশ শতাব্দীর পাওয়ার প্রব্লেম, পেট্রল সমস্যা, ইলেকট্রিসিটির বিপর্যয় আমাদের পীড়িত করে না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ইলেকট্রিসিটিও একদিন এইভাবে আহরণ করে সমস্ত গ্রহটাকে ঝলমলে করে তোলা হয়েছিল—সেই পদ্ধতিই আমরা প্রয়োগ করেছি টাইটানে। এখানকার পাথরের গভীরে যন্ত্রপাতি আর ঘর বাড়ী বানিয়ে থাকি—পেট্রল আর কয়লার জন্যে খোঁড়াখুঁড়ি করি না। জ্বালানী আসে মাথার ওপরকার বায়ুমণ্ডল থেকে। গ্যাস পাইপ, মেট্যাল করিডর, গোলক ধাঁধার মত সুড়ঙ্গে ঝাঁঝরা করে রেখেছি টাইটানকে—এই আমাদের ঘরবাড়ী, এই আমাদের স্বর্গ, এই আমাদের সব।"

আবেগে গমগমে হয়ে উঠল ডক্টর কৌ-য়ের কণ্ঠস্বর। টাইটানকে যে তিনি কি পরিমাণে ভালবাসেন, তা এতক্ষণ বুঝিনি। বুঝলাম, টাইটান প্রসঙ্গ আসতেই তাঁর বিচলিত হওয়া দেখে, আবেগ মথিত থর থর কণ্ঠস্বর শুনে। সংযত করে নিলেন নিজেকে সেকেণ্ড কয়েকের মধ্যে। সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন—"ঋ, এবার গ্যালাক্সি হাসপাতালের দ্বিতীয় স্তর।" বলেই বললেন—"না, দাঁড়াও, দীননাথবাবুকে তার আগে একটা কথা বলে নিই।—দীননাথবাবু, আমার সম্পূর্ণ পরিচয় এখনো আপনাকে

দেওয়া হয়নি। আমি পৃথিবীর ধন্বন্তরী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টাইটানে এসেছি অ্যাসটেরয়েড বেল্টে নতুন আর দুষ্প্রাপ্য ব্যাধির সন্ধানে। জীবাণু গবেষণাই আমার সাধনা। আপনাদের নিয়ে তাই আমার এত আগ্রহ।"

"কেন?" ঔৎসুক্য বাঁধভাঙা বন্যার মত তোড়ে বেরিয়ে এল ঐ একটিমাত্র শব্দের মধ্যে।

ডক্টর কৌ নিবিড় চোখে কিছুক্ষণ আমার পানে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন—"আপনাদের দুজনকেই পেয়েছি প্রকোষ্ঠের একটিতে অজ্ঞান অবস্থায়। যদিও আপনারা ফোর্থ ডাইমেনশনের মধ্যে দিয়ে এসেছেন, কিন্তু কোনো অজানা জীবাণু বহন করে এনেছেন কিনা, তা আমার দেখার দরকার ছিল। তাই আপনাদের দুজনকে আলাদা রেখে পরীক্ষা চলেছে। আপনাকেও এতক্ষণ পরীক্ষা করছিলাম।"

"পরীক্ষা করছিলেন!" বলে কি লোকটা! বক বক করার নাম পরীক্ষা!

গম্ভীর মুখে ডক্টর কৌ বললেন—"আপনি সুস্থ। সম্পূর্ণ সুস্থ। প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন, আপনি তা থেকে মুক্ত। ধাঁধাটা সেইখানেই। ,একই পথের সঙ্গী হয়ে আপনি নীরোগ, কিন্তু তিনি এত অসুস্থ হয়ে পড়লেন কেন?"

"বলব?" ধড়ফড় করে বললাম আমি।

উজ্জ্বল হল ডক্টর কৌ-য়ের চাহনি—"আপনি জানেন?"

"হাড়ে হাড়ে জানি," বলে বিবৃত করলাম সমস্ত ঘটনা। কলকাতার আকাশে সেই অলক্ষুণে বিদ্যুতের আবির্ভাব থেকে টাইটানে মহাকাশভূতের সঙ্গে রে-গান যুদ্ধ পর্যন্ত—কিচ্ছু বাদ দিলাম না। নিবিড় আগ্রহ নিয়ে প্রতিটি কথা শ্রবণ করলেন ডক্টর কৌ—বাগড়া দিলেন না, কৌতুহল প্রকাশ করলেন না অযথা প্রশ্ন করে। আমি সবশেষে বললাম—"ঐ ব্যাটা ভূতটাই সব নষ্টের মূল। ভূতে মেধা চায়, এই প্রথম শুনলাম। আমি বেঁচে গেছি, ঐ বস্তুটা আমায় মাথায় একটু কম আছে, তাই।" সত্যি কথা বলতে কি, শেষের কথাগুলো বলবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ডাক্তার-উকিলের সামনে কিছু গোপন করতে নেই—পৃথিবীতে শেখা এই আপ্তবাক্যটি স্মরণ করেই নিজের নিন্দা নিজেই করলাম স্রেফ প্রফেসরের নীরোগ কামনায়।

ডক্টর কৌ-য়ের অটল আত্মবিশ্বাসে যে চিড় ধরাতে পেরেছি, তা লক্ষ্য

করে কিন্তু পরক্ষণেই উল্লসিত হলাম। কেন না, উনি মস্তক কণ্ডুয়ন করলেন—মানে, মাথা চুলকোলেন। স্পষ্টতঃ, ধাঁধায় পড়েছেন। খুব যে বড়াই করে বলছিলেন একটু আগে, নতুন আর দুষ্প্রাপ্য রোগ সন্ধানই তাঁর সাধনা। এখন এমন বিরল ব্যাধির খপ্পরে পড়েছেন যে সাধনা মাথায় উঠেছে মনে হল।

মাথা-টাথা চুলকে চুল উস্কখুস্ক করে ফেলে অবশেষে বললেন কাষ্ঠ-হেসে—"খুবই জটিল কেস। ভিসিফোনে দেখে আর কাজ নেই, চলুন, স্বচক্ষে দেখবেন চলুন।"

আমিও তো তাই চাই!

১০ ॥ অমানুষ প্রফেসর

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন, অসম্ভব কাণ্ড চোখে দেখলেও খবরদার কাউকে বলতে যেও না। অজ্ঞানীরা তো বিশ্বাস করবেই না—শুধুমুধু হাস্যাস্পদ হবে, মিথ্যুক বদনাম রটবে। কিন্তু আমার আক্কেল জিনিসটা চিরকালই একটু কম—বিশেষ করে অসম্ভব কাণ্ড বলার ব্যাপারে। তাই লোকে হাসে, টিট-কিরি দেয়। কিন্তু দুনিয়ায় আর একশ্রেণীর মানুষ আছে যারা সব অসম্ভবই সম্ভবপর হতে পারে বলে মনে করে—তাদের অভিধানে অসম্ভব শব্দদুটো নেই। তারাই আমার কথা বিশ্বাস করে—আমি যা দেখেছি, তা সাগ্রহে শুনতে চায়। তারা আমার দুরন্ত দুঃসাহসী ছোট্ট বন্ধুরা—যারা এই পৃথিবীতে চিরকাল ছিল···আছে···থাকবে। অবিশ্বাস্য এই কাণ্ড শুধু তাদের জন্যেই লিখছি। তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যে গ্যালাক্সি হাসপাতাল সম্বন্ধে দু-চারটি কথা আগে বলে নিই—তারপর এই কাহিনীর যবনিকা তোলা হবে বিচিত্রতর এক অধ্যায়ে।

টাইটানে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়েছিল কোনো এক সময়ে। সে কাহিনী যথা সময়ে বিবৃত করব। লোমহর্ষক সেই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী আমার ছোট্ট বন্ধুরা আজ পর্যন্ত কোনো অ্যাডভেঞ্চার গ্রন্থে পাঠ করেনি। একটু ধৈর্য ধরতে হবে কিন্তু। ঘটনা পরম্পরার তাল কেটে গেলে রসভঙ্গ ঘটতে পারে।

সেই সময়ে ব্ল্যাস্টার (রে-গান বলে যাকে এর আগে লিখেছি আসলে তার নাম ব্ল্যাস্টার) হাতে টাইটান পৃষ্ঠের মিথেন কুয়াশা আমি দেখেছিলাম

ভিসিফোনে। প্রাণটাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে। আফ্রিকার জঙ্গলে, হিমালয়ের বরফে অথবা সাহারার মরুপ্রান্তরে অ্যাডভেঞ্চারের চাইতেও সে অ্যাডভেঞ্চার অনেক রুদ্ধশ্বাসী, অনেক ভয়াবহ। টাইটান পৃষ্ঠে অবতরণের সময়ে টাইম মেশিন থেকে গ্যালাক্সি হাসপাতালের বহু সহস্র আলোকিত জানলা আমি দেখেছিলাম। শূন্যে ভাসছে যেন একটা বৃহদাকার প্রস্তর গোলক। মহাশূন্যের নিবিড় তমিস্রার মধ্যে ঝলমলে বাতায়নগুলোর ঠেলে বেরিয়ে থাকা দৃশ্য দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না একটা ক্ষুদে উপগ্রহের মধ্যস্থল ফোঁপরা করে নির্মিত গ্যালাক্সি হাসপাতালের এলাহি কাণ্ডকারখানা। গ্যালাক্সি অর্থাৎ ছায়াপথের বৃহত্তম রিসার্চ হাসপাতাল এটি। দেখে অভিভূত হওয়ার মত। পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবসায়িক সূত্রে আবদ্ধ এই হাসপাতালে বিবিধ বিচিত্র ব্যাধি নিরাময় এবং আহতের সেবা শুশ্রূষার চমকপ্রদ ব্যবস্থা আছে। পৃথিবী থেকে বেরিয়ে অন্যান্য গ্রহে অভিযানের সময়ে মঙ্গল আর বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যস্থ গ্রহাণুপুঞ্জে অনেক অদ্ভুত অসুখে আক্রান্ত হয়ে অথবা জখম হয়ে অভিযাত্রীরা আসে এখানে। রুটিন চিকিৎসায় যা সারে না—গবেষণামূলক চিকিৎসায় তা আরোগ্য করা হয়।

হাসপাতালটার বহুস্তর। স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট হয়েছে গ্রহের কেন্দ্র পর্যন্ত। সে যে কি বিরাট ব্যাপার, বলে বোঝাতে পারব না। বাইরের হাজার হাজার আলোকিত জানলা দেখে যাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়, তারা ভেতরে প্রবেশ করবার পর থ হয়ে যায়। ১৯৮১-র পৃথিবীতে নির্মিত কোনো হাসপাতাল দিয়ে সেই বিরাট হাসপাতালের আন্দাজ করা যাবে না। হাসপাতাল অট্টালিকার ঠিক মাঝখানে অষ্টপ্রহর জ্বল জ্বল করছে একটা অতিকায় রেডক্রশ—মানবজাতির রোগ নিরাময়ের আদিমতম প্রতীক।

ডক্টর কৌ কেবল আমাকে নিয়ে রওনা হলেন এই গ্যালাক্সি হাসপাতালের অন্য এক স্তর অভিমুখে। ঘর থেকে বেরোনোর সময়ে সেকি বিপত্তি! দরজা খুঁজে পাই না। দেওয়াল তো মৌচাকের খোপের মত বাঁক নিতে নিতে সিলিং হয়ে গেছে। মসৃণ ধাতব দেওয়ালে দরজা বলে পরিচিত বস্তুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে না পেরে কাঁচুমাচু মুখে হাল ছেড়ে দিলাম। তাড়াতাড়ি শয্যা থেকে লম্ফ দিয়ে নেমে বেরোতে গিয়ে এই ঝামেলা। ডক্টর কৌ তখন সঙ্গী সাথীদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আমি দেওয়াল হাতড়াচ্ছি দেখে এগিয়ে এসে বললেন—"কি খুঁজছেন?"

"বেরোনোর পথ।"

দেওয়ালের গায়ে মিলোনো একটা ছোট্ট চাকা দেখিয়ে ডক্টর কো বললেন—"এটা ঘোরান।"

লকিং মেক্যানিজম! চাকাটা একপাক ঘোরাতে না ঘোরাতেই দেওয়ালের একটা অংশ ধীরে ধীরে সরে গেল দেওয়ালেরই মধ্যে। সামনেই করিডর। শ্বেত পরিচ্ছদ পরা একজন নার্স ট্রলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কপালে রেড-ক্রশ আঁকা পটি। ডক্টর কো-কে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করে ট্রলি নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল একটা ছোট্ট কুঠরির সামনে। ট্রলি ঠেলে ঢোকাল ভেতরে। পরক্ষণেই একটা হু-উ-উ-স্ শব্দ শুনলাম। দেখলাম, ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ উধাও হয়েছে নার্স এবং ট্রলিকে নিয়ে।

লিফ্ট নাকি? জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম ডক্টর কো-য়ের দিকে। উনি মৃদু হেসে বললেন—"প্রশ্ন আছে?"

"লিফ্ট্ এ-যুগেও?"

"আপনাদের যুগে যে-লিফ্ট্, সে-লিফ্ট্ নয়। আপনাদের ছিল ইলেকট্রিক লিফ্ট্—আমাদের হল নিউম্যাটিক লিফ্ট্।"

"নিউম্যাটিক লিফ্ট্! নিউম্যাটিক মানে তো বায়ুবিজ্ঞান।"

"এ-লিফ্ট্ও বায়ুচালিত লিফ্ট্। তাই ঐ হু-উ-উ-স্ আওয়াজটা শুনলেন।"

"অ," বলে চুপ মেরে গেলাম। আমার এই 'অ' বলা নিয়ে প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র আমাকে কম ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন নি। যখনি কোনো জটিল বিষয় বোঝান, আমার মোটা মাথায় বিন্দু বিসর্গ ঢোকে না। তখন প্রশ্ন করলে পাছে যা মুখে আসে তাই বলে বসেন, এই ভয়ে বলে উঠি—'অ'। ভাব খানা যেন, সব বুঝেছি। প্রফেসর কিন্তু শিশুর মত সরল হলেও মাঝে মাঝে যাচ্ছেতাই রকমের ঘোড়েল হয়ে ওঠেন। আমার ঐ 'অ' অক্ষরটির অপার অর্থ যে আমার সীমাহীন অজ্ঞানতা তা উনি চকিতে হৃদয়ঙ্গম করে নিয়ে টিটকিরি দেন সঙ্গে সঙ্গে—"অ, মানে, বোঝা গেল না—এই তো?"

ভাগ্যিস ডক্টর কো এখনো আমার 'অ' অক্ষরের সম্যক অর্থ অনুধাবন করতে পারেন নি! বায়ুবিজ্ঞান নিয়ে তাই আর বাড়াবাড়ি করলেন না। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

নিউম্যাটিক লিফ্ট্ অগুন্তি রয়েছে করিডরে। আমাকে নিয়ে প্রফে-

সর ঢুকলেন একটার ভেতরে। দেওয়ালের গায়ে বোতাম ছুঁতে না ছুঁতেই হু-উ-উ-স্ শব্দ শুনলাম এবং মনে হল খাদে পড়ে যাচ্ছি। কামান থেকে গোলা নিক্ষেপের মত গতিবেগ। এ গতিবেগ বিংশ শতাব্দীর লিফ্‌ট্ নির্মাতা এখনো অর্জন করতে পারেন নি। সিক্রেটটা শিখে নিয়ে যাব মনে মনে ঠিক করেছিলাম—কিন্তু মস্তিষ্কের জড়তা আর সময়-সুযোগের অভাবে তা সম্ভব হয়নি। নইলে বিংশ শতাব্দীর লিফ্‌ট্ বিজ্ঞান এক ধাপে এগিয়ে যেত অনেকখানি।

ধাবমান প্রকোষ্ঠ স্তব্দ হল এক সময়ে। আমরা বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম একটা প্রশস্ত কক্ষে। কক্ষ মানে মৌচাকের খুপরি। এখানকার সব ঘরই এইরকম ডিজাইনের। চতুষ্কোণের ভক্ত নয় এ যুগের মানুষ—বহু কোণের সমাদর বড্ড বেশী।

রিসেপসন ডেস্কের মত একটা লম্বা টেবিলের সামনে বরফ ঠাণ্ডা মুখে বসেছিল একটি তরুণী। ভাবলেশহীন মুখ। টেবিল ভর্তি হাজার রকম যোগাযোগের যন্ত্রপাতি—কমিউনিকেশন ডিভাইস। পেল্লায় হাসপাতালের ঘরে ঘরে যোগাযোগ রেখে চলেছে এই একটি মেয়ে একটি মাত্র টেবিলের সামনে বসে। অনেক রঙের পোশাক পরা ডাক্তার আর নার্সরা ব্যস্ত ভাবে যাতায়াত করছে ঘরের মধ্যে দিয়ে। এদিকে সেদিকে ছড়ানো বেঞ্চিতে বসে রুগীরা। হাজার হাজার বছর পরেও হাসপাতালের মূল দৃশ্যটা দেখছি একটুও পালটায়নি।

আমার পৌরাণিক পরিচ্ছদ দেখে বিস্মিত হল সবাই। কিন্তু প্রশ্ন-বর্ষণে বিড়ম্বিত করার প্রয়াস দেখা গেল না কারোর মধ্যেই। শৃঙ্খলা বোধের আর একটি নিদর্শন।

ডক্টর কোঁ গট গট করে দাঁড়ালেন রিসিভিং অফিসার সেই তুহিন-আনন ললনাটির সামনে—"আইসোলেসন চেম্বারেই আছেন তো তিনি?"

"হ্যাঁ। লেভেল টু।" বলেই মেয়েটি একটা কন্ট্রোল স্পর্শ করল। মিউজিক্যাল বীপ-বীপ-বীপ ধ্বনি শোনা গেল প্রথমে। সঙ্গীতময় বিচিত্র শব্দলহরী শেষ হতে না হতেই উদ্ভাসিত হ'ল একটা মনিটর স্ক্রীণ। দেখলাম শয্যায় শায়িত প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রকে। চারপাশে স্বয়ংক্রিয় ডায়াগনোসটিক ইন্সট্রুমেন্টের সরঞ্জাম—রোগ নিদানের বিপুল আয়োজন। মেয়েটি বললে—"এখনো ড্যাটালাইজ করা হচ্ছে ওঁকে।"

"ড্যাটালাইজ ! সেটা আবার কী ?" ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা। সজনে ডাঁটার সঙ্গে সম্পর্ক আছেন নাকি ?

মেয়েটি আমার অজ্ঞতার জবাব না দিলেও পারত। কিন্তু সৌজন্য প্রদর্শন হাসপাতাল কর্মচারীদের একটা বড় সম্পদ—যা বিংশ শতাব্দীর কলকাতার হাসপাতালে একেবারেই অনুপস্থিত। রুগীর ধৃষ্টতা সেখানে সহ্য করা করা হয় না—সৌজন্য দেখানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। মেয়েটি কিন্তু সুমিষ্ট হাসি ফুটিয়ে তুলল তুহিন-শীতল মুখে। বললে—"চিকিৎসা চলেছে। ডক্টর কৌ যখন আপনার সঙ্গে রয়েছে, উনিই সব বুঝিয়ে দেবেন। উনি আমাদের এক্সট্রা-টেরেসট্রিয়াল প্যাথলজিক্যাল এনডোমরফিজম স্পেশ্যালিস্ট।"

দমাদম শব্দে কানের কাছে মেশিনগান বর্ষণ করলেও কানটা বুঝি এতটা ঝালাপালা হত না। হতভম্ব মুখে তাকালাম ডক্টর কৌ-য়ের পানে। উনি সস্মিত মুখে বললেন—"বুঝতে পারলেন না বুঝি ? আপনাদের যুগের বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দগুলোর অনুপ্রবেশ ঠেকিয়ে রাখার ফলেই দুর্বোধ্য মনে হল। যাকগে, মানে করে দিচ্ছি আমি। আভ্যন্তরীণ মরফিন আসক্তি যখন অপার্থিব ক্ষেত্রে দেখা যায় তখন তার রোগানিরূপণ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ আমি।" একটু থেমে আমার অসহায় মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করে সকৌতুকে বললেন—"আরও খটমট লাগল তো ? লাগবেই তো। এই অসুবিধের জন্যেই তো বাংলাভাষাকে পরিভাষা কবল মুক্ত করেছিলেন আপনার পরবর্তী যুগের ভাষা. সংস্কারকরা। যাকগে, আস্তে আস্তে সব সয়ে যাবে, সব বুঝতে পারবেন। এখন চলুন প্রফেসর কি অবস্থায় আছেন দেখা যাক।"

সবিস্ময় অনুকম্পার চোখে ললনাটি চেয়ে রইল আমার পানে। আমার সীমাহীন অজ্ঞতা যে শেষ পর্যন্ত তার তুহিন-কঠিন ভাবলেশ-হীনতার অবসান ঘটাতে পেরেছে দেখে ঐ অবস্থাতেও যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনা অনুভব করলাম।

বিংশশতাব্দীর পাঠকপাঠিকাদের কিন্তু আমার মত বিড়ম্বনায় ফেলার অভিপ্রায় আমার নেই। তাই 'আইসোলেসন' শব্দটার তর্জমা করে দিচ্ছি। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অর্থাৎ পৃথকভাবে রুগীদের যেখানে রাখা হয়, হাসপাতালের সেই অঞ্চলটিকে বলা হয় আইসোলেসন ওয়ার্ড বা আইসোলেসন উইং।

রিসেপসন প্রকোষ্ঠ থেকে রশ্মিরেখার মত বিচ্ছুরিত বহু অলিন্দ পথের একটিতে প্রবেশ করে ডক্টর কো আমাকে নিয়ে এলেন এই আইসোলেসন ওয়ার্ডে।

অচৈতন্য প্রফেসর শুয়েছিলেন শয্যায়। বিরল এবং নবীন রোগের সন্ধানী ডক্টর কো ঝুঁকে দাঁড়ালেন শয্যাপার্শ্বে। আবিল মুখচ্ছবি দেখে স্পষ্ট বুঝলাম প্রফেসরের বিরল ব্যাধি তাঁকে যথেষ্ট পীড়িত করে তুলেছে।

শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে রইল ম্যা—ডক্টর কো-য়ের তরুণ সহকারী—নামটা বোধহয় কোনো কালে ম্যাকসন বা ঐ জাতীয় কিছু ছিল। এখন তার সংক্ষেপিত রূপ 'ম্যা' হাস্যউদ্রেককারী সন্দেহ নেই—কিন্তু গুরু গম্ভীর থমথমে পরিবেশে হাসতে পারলাম না। ম্যা-য়ের পাশে দাঁড়িয়ে একজন সিনিয়র নার্স। উৎকট গম্ভীর মুখ। ছোট্ট এই দলটায় আছে আর একটি জীব। এর প্রসঙ্গে আসার আগে আবার বলি, ছোট্ট বন্ধুরা যেন ভুলেও মনে না করে যে আমি মিথ্যার বুনট রচনা করে চলেছি। মিথ্যার এমনই মহিমা যে এক মিথ্যাকে ঢাকতে হলে আরেক মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। আমার এই বিচিত্র কাহিনী অবিরাম মিথ্যা কখন মনে হতে পারে—কেন না বিংশ শতাব্দীর পার্থিব কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গেই তো তার সাদৃশ্য নেই। কিন্তু আমি নিরুপায়। এ ঘটনা পাঁচ হাজার তিনশ একুশ সালের টাইটান উপগ্রহের। পৃথিবী বহির্ভূত আখ্যায়িকা তো অপার্থিব হবেই। তাছাড়া মিথ্যাচার করলে যে যমালয়ে গরম তেলে আমাকে ভাজবে যম-দূতেরা, আমার তা জানা আছে। অন্ততঃ সেই ভয়াবহ নরক যন্ত্রণার ভয়েই যে মিথ্যা বলছি না, এইটা যেন খেয়াল রাখে কল্পনা-পিয়াসী ছোট্ট বন্ধুরা।

আমাদের ছোট্ট দলের অন্যতম শরিকটি একটি বেঁটেখাট চ্যাপ্টা চৌকোনো ধাতুর তৈরী কুকুর। শয্যার তলদেশে পায়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বিচিত্র জীবটাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। দেখতে তাকে অদ্ভুত রকমের ধাতুর তৈরী চৌকোনা সারমেয়র মতন। চোখের জায়গায় কম্পিউটারের কারসাজি, কানে আর লেজের জায়গায় তিনটে খাড়া অ্যান্টেনা। আমি যখন তাকে দর্শন করে হতভম্ব সে তখন নিবিষ্ট ভাবে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে প্রফেসরের নিস্পন্দ দেহটাকে নিয়ে। পর্যবেক্ষণ করছে মাথার সেট

করা একসারি ব্যাটারি চালিত ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে। অতশত সেই মুহূর্তে আমার মাথায় ঢোকেনি—ডক্টর কো পরে প্রাঞ্জল করে দিয়েছিলেন। হঠাৎ খর্-খর্-খর্-খর্ আওয়াজ হতেই আর একদফা চমকে উঠলাম। তারপরেই দেখি মেট্যাল-কুত্তার মুখ-বিবর দিয়ে বেরিয়ে আসছে কম্পিউটারে ছাপা ফিতে-কাগজ—আচমকা দেখলে মনে হবে যেন লকলকে জিভ বার করেই চলেছে বিরামবিহীনভাবে।

আপনা থেকেই এক সময়ে স্তব্দ হল ফিতে কাগজের বেরিয়ে আসা। হেঁট হলেন ডক্টর কো। ধাতব-সারমেয়র মস্তক চাপড়ে আদর জানালেন এবং পড়াৎ করে মুখের কাছ থেকে ছিঁড়ে নিলেন কাগজখানা।

বেশ বার কয়েক কাগজে ছাপা-তথ্যবলীতে দৃষ্টি সঞ্চালন করে হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন প্রফেসর কো। শান্ত সৌম্য মানুষটার এ হেন আকস্মিক পরিবর্তন দেখে তখন অবাক হলেও পরে জেনেছিলাম, উনি দ্বৈত ব্যক্তিত্বের পুরুষ। রোগ আর রুগীর সান্নিধ্যে এলে খিটখিটে, অন্য সময়ে সহজ, স্বাভাবিক। অধিকাংশ প্রতিভাধর যা হয় আর কি। আমরা সাধারণ মানুষরা এঁদের বলি ক্ষ্যাপা উন্মাদ। আমাদের প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রই বা কম যান কিসে! তাঁর মেজাজের নাগাল ধরতেই তো জান কয়লা হয়ে গেল আমার।

যা বলছিলাম, কাগজখানা বারকয়েক পাঠ করবার পর ক্ষিপ্ত হলেন কো। বললেন তিরিক্ষে গলায়—"ইডিয়ট কোথাকার।"

কে ইডিয়ট? আমি বিমূঢ় চোখে চেয়েছিলেন ম্যা আর নার্সের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে। দুজনেই ডক্টরের এই জাতীয় মেজাজী বিস্ফোরণের সঙ্গে সমধিক পরিচিত ছিল বলেই নির্বিকার মুখে চেয়ে রইল শূন্য পানে। বুদ্ধিমত্তার প্রশংসিকাটা যেন কর্ণ কুহরে প্রবেশই করেনি।

এবার আমাকেই উদ্দেশ করলেন ডক্টর কো—"আপনার গুরু তো দেখছি মহা-ঘোড়েল লোক।"

হাড়-পিত্তি জ্বলে গেল আমার। এ কী অশিষ্ট মন্তব্য। প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি, উনি তার আগেই বলে উঠলেন—"এই বুড়ো বয়েসেও সেল্ফ-ইনডিউস্ড্ কোমা প্র্যাকটিস করে বসে আছেন!"

"কমা?" রাগের চেয়ে বিস্ময়টাই এবার প্রবল হল। কমা দাঁড়ি সেমিকোলনের প্রশ্ন আসছে কেন এখানে?

"কমা নয়, কোমা" খেঁকিয়ে উঠলেন ডক্টর কো। "কোমা কি তাও জানেন না? জ্বালাতন! কোমা মানে হল ডীপ স্লীপ—গভীর নিদ্রা। সংজ্ঞার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি মৃগীর আক্রমণ হওয়ার পর, অথবা বেশী মদ খেলে, ডায়াবেটিস হ'লে ইউরিসিয়া রোগে কোমা দেখা যায়। আর আপনার গুরুদেব আত্ম-ঘটিত কোমায় সংজ্ঞা হারিয়ে রয়েছেন—নিজেই নিজের কোমা ঘটিয়েছেন! গুরুদেব লোক বটে!"

শুনে রাগ হওয়া দূরে থাক, খুশীর প্রাণ ফুর্তিতে গড়ের মাঠ হয় আর কি! প্রফেসর গুণবান পুরুষ নিঃসন্দেহে, নিজের জ্ঞান নিজেই লোপ করার বিদ্যে যে আয়ত্ত করেছেন, তা আর আশ্চর্য কী! নাট-বল্টু-চক্র একটা জীবন্ত বিস্ময়—ওঁকে বুঝে উঠতে আমি পারলাম না—আর ডক্টর কো, তুমি পারবে? মনটা তাই খুবই হাল্কা হয়ে গেল, কিন্তু খামোকা কোনো উদ্ভট ক্রিয়াকর্ম তো উনি করেন না, স্বেচ্ছা-সংজ্ঞালোপের আশ্রয় নিলেন কেন? প্রশ্নটা করতে যাচ্ছি ডক্টর কো নামক দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের বৈজ্ঞানিকটিকে—তার আগেই উনি গজর গজর করতে করতে বললেন—"ভাগ্যিস পরিচয়টা পেয়েছিলাম আপনার কাছে, নইলে ধরে নিতাম অপদার্থ স্পেশনিক জুটেছে আর একটা।"

স্পেশনিক আবার কিরে বাবা! থতমত খেয়ে চুপ করে গেলাম। ডক্টর কো হঠাৎ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু দেখে ফেললেন ভ্যাবা-চাকা মুখখানা। চোখ কপালে তুলে বললেন—"সেকী কথা! স্পেশনিক কাকে বলে তাও জানেন না?"

আরে সর্বনাশ! এযে দেখছি প্রফেসরের ওপরে যায়! তুলোধোনা করে ছাড়ছে আমার অজ্ঞতা নিয়ে। আমতা আমতা করে কাষ্ঠহেসে বললাম—"না···মানে···ঐ আর কি····· ।"

"থাক, থাক বুঝতে পেরেছি। বিংশশতাব্দীর মানুষ যখন বিটনিকদের নাম নিশ্চয় শুনেছেন?"

"বিটনিক!" বীট-চিনির নাম জানি, বীট-শেকড়ের বৃত্তান্তও জানা আছে, কিন্তু বিটনিক! সে কী বস্তু?

আমার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আর তিলমাত্র সংশয় রইল না ডক্টর কো-য়ের। বঙ্কিম ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন—"শব্দটা আমেরিকান। ১৯৫০-য়ের দশকে যে-সব বোহেমিয়ান কবি ইত্যাদি সমসাময়িক সমাজের লক্ষ্য

থেকে নিজেদের আলাদা করে এনেছিল, তাদের নিয়েই গড়ে ওঠে বিট জেনারেশন। পরে বিটনিক বলা হত সেই সব তরুণ তরুণীদের যাদের আচরণ, পোশাক প্রচলিত রীতির সঙ্গে খাপ খেত না। এখন বুঝেছেন কাকে বলে বিটনিক ?"

ঢোক গিলে মাথা নেড়ে সায় দিলাম নীরবে।

ডক্টর কৌ জের টেনে নিয়ে বললেন একই রকম হাড়-জ্বালানো গলায় —"বিংশশতাব্দীর বিটনিকদের উত্তরসূরী হল এই যুগের স্পেশনিক। তখন ছিল যারা হিপি আর বিটনিক—এখন তারাই হয়েছে স্পেশনিক। গাঁজা চরস খেয়ে বাউন্ডুলে হয়ে হিপি আর বিটনিকরা ঘুরত দেশে দেশে, স্পেশনিকরা কপর্দকহীন অবস্থায় চুপিসারে ঢুকে পড়ে নানা ধরনের স্পেশ মেশিনে—ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ধারের অভিযানে বেরিয়ে পড়ে স্পেশ মেশিনের পর স্পেশ মেশিন—হতচ্ছাড়া স্পেশনিকগুলো সেই সুযোগে বেড়িয়ে নেয় মহাকাশের দিকে দিকে। কিন্তু ব্যাটাদের ভাঁড়ে তো মা ভবানী, ট্যাঁক গড়ের মাঠ—কারিগরি বিদ্যেও অষ্টরম্ভা। ফলে ঝামেলায় পড়ে শেষকালে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে তাদের ফেরৎ পাঠানোর ভার নেয় পৃথ্বী সরকার।"

শেষ শব্দ দুটোই কেবল ভাল করে বুঝলাম। পৃথ্বী সরকার মানে, পৃথিবীর গভর্ণমেণ্ট। পৃথিবীটায় তাহলে গভর্ণমেণ্ট বলতে একটাই—শ-য়ে শ-য়ে গভর্ণমেণ্টদের যুগ ফুরিয়েছে। অহো! সুসংবাদ নিঃসন্দেহে! সেই আদ্দিকালে পৃথিবীতে ছিল মোট দুটো গভর্ণমেণ্ট—অসুর আর দেবতা। অসভ্য আর সভ্য দুই গভর্ণমেণ্টে লড়াই লেগেই থাকত। তারপর গণ্ডায় গণ্ডায় গভর্ণমেণ্টে ছেয়ে গেল ভূপৃষ্ঠ। এখন আর দুটোও নেই—মোটে একটা। পৃথিবী তাহলে নিশ্চয় এখন শান্তির রাজ্য। দেশে দেশে অ্যাটম বোমার স্তূপ রচনার প্রলয়ংকর প্রতিযোগিতাও নিশ্চয় আর নেই! অহো! স্বর্গরাজ্য তাহলে স্থাপিত হয়েছে পৃথিবীতে।

আমাকে জ্ঞান দেওয়া সাঙ্গ করে প্রফেসরের নোংরা কলেবরের দিকে তাচ্ছিল্য-কুঞ্চিত মুখে ডক্টর কৌ এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন বলেই সুখ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। সম্বিৎ ফিরল তাঁর অস্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠস্বরে—"কী আপদ! কী আপদ! খামোকা এতটা সময় নষ্ট করলাম! এতক্ষণে অনেকটা এগিয়ে যেত আমার গবেষণা!"

মরণ দশা আর কী! ছাই গবেষক তুমি! প্রফেসরের কি হয়েছে,

তাই এতক্ষণ ধরতে পারো নি, বচনই সার তোমার! ভাগ্যিস ঐ কলের কুকুরটা কম্পিউটার দিয়ে বলে দিল—তার আগে পর্যন্ত তো মুখ কালো করে দাঁড়িয়েছিলে!

ফের খেঁকিয়ে উঠলেন ডক্টর কৌ। না, আমার দিকে নয়—ঐ রোবট কুকুরটার দিকে।

"ক-৫।"

অনেকটা কুত্তার ডাকের মতই কুঁই-মুই করে উঠল ক-৫। আসলে সেটা ইলেকট্রনিক আওয়াজ।

"আর কিছু খবর আছে?"

ক-৫-য়ের মুখ দিয়ে খর্-খর্ শব্দে আবার বেরিয়ে এল এক ফালি ছাপা কাগজ। ম্যা হেঁট হয়ে পড়াৎ করে কাগজখানা ছিঁড়ে নিল। পড়ল। বললে—"স্যার—"

"বলো, বলো।"

"ক-৫ বলছে, রুগী মানুষ জাতির মধ্যে পড়ে না।"

অ্যাঁ! আঁৎকে উঠলাম আমি! প্রফেসর মানুষ নন! বলে কী?

ভুরু কুঁচকে ফ্যাঁস করে উঠলেন ডক্টর কৌ পর্যন্ত—"ননসেন্স! নিজের চোখ দিয়ে দ্যাখো উনি মানুষ কিনা।"

ম্যা কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বললে—"পড়ে দেখুন। দুটো হৃৎপিণ্ড রয়েছে। কোষের গঠন এমন যে নিজেই নিজেদের নতুন করে সৃষ্টি করতে পারে।"

কাগজ হাতে না নিয়ে ক-৫-য়ের দিকে চোখ নামালেন ডক্টর কৌ।

"কিরে, তাই নাকি?"

ঠন্ ঠন্ শব্দ করে কাঁসি বাজানো গলায় ক্ষুদে রোবট বললে—"নির্জলা সত্য, প্রভু।"

ডক্টর কৌ এবার যেন ধাতস্থ হলেন মনে হল। কৌতূহল জাগ্রত হল। তন্ময় হয়ে পরীক্ষা করলেন প্রফেসরকে। আর আমি ভাবতে লাগলাম, এ-ও কি সম্ভব? দুটো হৃৎপিণ্ড আছে প্রফেসরের? মানুষের থাকে একটা হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস হয় এক জোড়া। প্রফেসরের জোড়া হৃৎপিণ্ড আবার কবে হল? রোবট-কুকুর যান্ত্রিক সিদ্ধান্তে তাই তাঁকে বলছে অমানুষ। কিন্তু—

ডক্‌টর ঠাণ্ডা মেরে গেলেন। বললেন গলা নামিয়ে—"অ-মানুষ! বটে! উৎপত্তি কোথায়?"

"সৌরজগতের বাইরে," কাঁসি বাজানো গলায় বললে ক-৫।

ব্যঙ্গের সুরে ডক্‌টর কো বললেন—"বহুৎ ধন্যবাদ, ক-৫।"

রোবটদের ব্যঙ্গ করলে তারা তা বোঝে না। যন্ত্র তো! ঠন্‌ ঠন্‌ শব্দে কৃতার্থ স্বরে ক-৫ বললে—"ধন্যবাদ, প্রভু।"

নার্সের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন ডক্‌টর কো—'এনকেফালোগ্রাফ লাগান রুগীর ওপর।''

নামটা আমার পরিচিত। ব্রেনের রেখাচিত্র দেখতে চান ডক্‌টর। দেখা যাক।

একটা নমনীয় যান্ত্রিক বাহুর ওপর ফিট করা জটিল একটা যন্ত্র ঝুরিয়ে প্রফেসরের মাথার ওপর রাখল নার্স।

রেজাল্ট বেরিয়ে এল কিন্তু ক-৫য়ের মুখ দিয়ে—''ভাইরাস ধরনের সংক্রমণ। অজ্ঞাত ভাইরাস। বৈশিষ্ট্য—নোয়েটিক। বর্তমান অবস্থান—মন-মস্তিষ্কের মাঝামাঝি—তাই গড়ন বা আয়তন নির্ধারণ করা যাচ্ছে না।"

দু-হাত কচলে উৎফুল্ল কণ্ঠে ডক্‌টর বললেন—"কৌতূহলোদ্দীপক কেস! অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক! রোজ-রোজ এমন টাটকা তাজা নতুন সংক্রমণের দেখা পাওয়াই ভার, তাই না ম্যা?"

বিনীত কণ্ঠে ম্যা সায় দিলে—''তা তো বটেই।"

এমন সময়ে চোখ মেলে তাকালেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র। বললেন প্রফুল্ল স্বরে—"কি ব্যাপার? এত ফুর্তি কিসের?"

১১ ॥ ভাইরাসের গোলাম

আনন্দে উপচে উঠলেন ডক্টর কো—"নমস্কার!"

বিছানার চারদিকে খাড়া করা অজস্র ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টের জটিল গোলকধাঁধার দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে থেকে প্রফেসর বললেন—''পাওয়া গেল কিছু?"

"না, মশাই, না। এখনো পাইনি, তবে শীগগিরই পাবো!" প্রফেসরের পায়ের দিকে রাখা চার্টটা দেখে নিলেন ডক্টর কো—"আপনি প্রফেসর?"

"বলা বাহুল্য! ঝেড়ে কাশুন মশায়, কি পেলেন আগে তাই বলুন।"

"ক্যাটালেপটিক ট্রান্স ?" চোখ নাচিয়ে বললেন কৌ।

"হ্যাঁ।" সায় দিলেন প্রফেসর।

"স্বয়ং-ঘটিত ?"

"নিশ্চয়।"

"কেন ?"

প্রফেসর জবাব দেওয়ার আগেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম—"দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমাকে আগে বুঝতে দিন। ক্যাটা…ক্যাটা…কি যেন বললেন ? —মানে কী ?"

"ক্যাটালেপটিক ট্রান্স," মিষ্টি করে বললেন প্রফেসর—"মনোবিজ্ঞানীদের ভাষা হে ছোকরা ! একটানা নট-নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু হয়ে থাকা। সম্মোহ বলতে পারো। বাড়ী ফিরে বুঝিয়ে দেব। এখন থামো। হ্যাঁ, কি যেন বলছিলেন আপনি ?" শেষ প্রশ্নটা নিক্ষিপ্ত হ'ল ডক্টর কৌয়ের উদ্দেশে।

কৌ তখন আবার অমায়িক হয়ে উঠেছেন। কত রূপই জানেন ভদ্রলোক। স্মিত মুখে বললেন—"ক্যাটালেপটিক ট্রান্সের দরকার হল কেন ?"

"আত্মরক্ষার তাগিদে—আত্ম-সংরক্ষণও বলতে পারেন। কার খপ্পরে এত ভোগান্তি বুঝতে পারছি না ঠিকই, তবে সেই মহাশয় উৎপাতটি যে আমার মনের সক্রিয়তা দিয়ে নিজেকে পুষ্ট করে বেশ জাঁকিয়ে বসছে, তা টের পেয়েছি। তাই এই মানসিক নিষ্ক্রিয়তা। সমাধিস্থ হয়ে যাওয়া।"

চমৎকৃত হলেন ডক্টর—"বটে ! বটে ! আপনি মনকে যত খাটাচ্ছেন, যত চিন্তার গভীরে প্রবেশ করছেন, উটকো উৎপাতটা ততই কায়েমী হয়ে বসছে—তাই তো ?"

"একেবারে ঠিক। চিন্তার বিরতিই একমাত্র দাওয়াই উৎপাতটাকে বিদায় করার। কিন্তু অনন্তকাল কি মন-হীন হয়ে থাকতে পারি আমি ? বলুন আপনি ?"

চুক-চুক শব্দ করে কৌ বললেন—"তা তো বটেই…তা তো বটেই। আমার এই কমপিউটার—"বলে তাকালেন ধাতব-সারমেয় ক-৫-য়ের দিকে।

কৌ-য়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রফেসরও তাকিয়েছিলেন খাটের প্রান্তে। আজব কুত্তাটা দেখে চোখ কপালে তুলে ফেললেন—"রোবট কুকুর ! নমস্কার, নমস্কার !"

বিনীতভাবে প্রতি-নমস্কার জানালো ক-৫—"নমস্কার।"

"খবর ভালো তো ?"

ক-৫ জবাব দেওয়ার আগেই সামাজিক শিষ্টাচার বিনিময়ে বাগড়া দিলেন ডক্টর।

বললেন—"প্রফেসর, যা বলছিলাম, ক-৫-য়ের বিশ্বাস ভাইরাসটা নোয়েটিক টাইপের—যার মানে, সজ্ঞান থাকার সময়েই কেবল তাকে আবিষ্কার করা যাবে।"

প্রফেসর ঈষৎ চটিতং কণ্ঠে বললেন—"নোয়েটিক মানেটা আমার জানা আছে।"

"দুঃখিত।"

ক্ষমাপ্রার্থনা কানে না তুলে প্রফেসর বললেন—"ভাইরাসটা তাহলে রয়েছে মন-মস্তিষ্কের সীমান্ত অঞ্চলে ?"

"যদি এ ধরনের ভাইরাসের আদৌ অস্তিত্ব থাকে, তবেই—"

প্রফেসর কিন্তু নিজের অবরোহ-সিদ্ধান্ত নিয়েই তন্ময় হয়ে রইলেন—"কি স্টুপিড আমি! এই কারণেই টাইম-মেশিনে বসে থাকার সময়ে অ্যাটাক শুরু হয় আমার ওপর—ঠিক তখনি তো আমার মনের কাজ তুঙ্গে পৌঁছেছিল—ভীষণ সক্রিয় ছিলাম মাথার কাজে—"

"ব্যাপারটা শুনেছি।"

"আমি ভেবেছিলাম স্ট্যাটিক কাণ্ড কারখানা। টাইম মেশিন যখন ফোর্থ ডাইমেনশনের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে, তখনও হতচ্ছাড়া উৎপাতটা আমাকে কব্জায় আনবার চেষ্টা চালিয়ে গেছে, কেন না মেণ্ট্যাল অ্যাকটিভিটি তখনও খুব বেশী। কিন্তু দীননাথ পার পেয়ে গেছে।"

গলা খাঁকারি দিয়ে আমি বললাম—"কেন বলুন তো ?"

"কারণটা শুনলে তো আবার রেগে যাবে। তোমার ব্রেন থাকলে তো মন কাজ করবে। ব্রেন নেই, মনের অ্যাকটিভিটিও নেই। তাই ভাইরাসের বজ্জাতি তোমার ওপর খাটেনি।"

নিজের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে এই জাতীয় প্রশংসা শুনলে কেউ প্রসন্ন হতে পারে না। আমিও বিষণ্ণ হলাম।

উল্লাসিত হলেন কিন্তু প্রফেসর—"এবার পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল!"

ডক্টর কো-য়ের কাছে তখনও বোধ হয় ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়নি—তাই মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন—"হতে পারে···হতে পারে।···ভালো কথা, এ ভাইরাসে আর কেউ আক্রান্ত হয়েছে কিনা জানেন ?"

"দীননাথের ওপর যে আক্রমণ চলেছিল, সেটা আবার আপনাদের ওপরেও শুরু হতে পারে।" বলতে না বলতেই প্রফেসরের মুখচোখের চেহারা আবার পালটে যেতে লাগল। আবার চোখের তারায় সেই নীলচে-স্পার্ক দেখা দিল। ভাইরাস ব্যাটাচ্ছেলে আর সময় দিতে রাজী নয়—প্রফেসর হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন টের পেয়ে বোধহয় চাঙা হয়ে উঠল— আক্রমণ এবার শুরু হবে ডক্টর কো-য়ের ওপর—হাজার হোক তাঁর ব্রেনখানা তো সরেস। প্রফেসরও কম ধুরন্ধর এবং চটপটে নন। সক্রিয় মনের সুযোগ নিয়ে অজ্ঞাত ভাইরাস আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে টের পেয়েই স্বেচ্ছা-সংজ্ঞালোপের শরণ নিলেন। মাথা হেলে পড়ল বালিশে—বন্ধ হল চোখের পাতা। মেণ্ট্যাল এনার্জির অভাব ঘটিয়ে অপার্থিব শক্তিকে উপবাসে রাখার পরিকল্পনায় তিনি বদ্ধপরিকর।

নিরাশ গলায় ডক্টর বললেন—"যাচ্চলে, দেখছি ঘুমিয়ে পড়লেন। ম্যা, ওঁকে চব্বিশঘণ্টা অবজারভেশনে রাখতে হবে—পুরো মনিটরিং দরকার। তোমার দ্বারা হবে না। ক-৫ !"

"হুকুম করুন, প্রভু," কলের কুকুর তো নয়, যেন গোলাম হোসেন।

"কি বললাম শুনেছো ?" ক-৫ য়ের কানের অ্যাণ্টেনা লটপট করে উঠল প্রত্যুত্তরে—"চব্বিশঘণ্টা অবজারভেশনে থাকবেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র।"

আমাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ডক্টর। ঘরের মধ্যে রইল নার্স, ম্যা আর ক-৫। তারপর যা ঘটেছিল, তা নানা সূত্রে টুকরোটাকরা ভাবে সংগ্রহ করে জোড়াতালা দিয়ে যা দাঁড় করিয়েছিলাম, তা এই ঃ

ঘর নিস্তব্দ। ম্যা আর নার্স পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে প্রফেসরের দিকে। এমন সময়ে তাঁর কপাল ঘিরে বলয়াকারে ফুটে উঠল নীলাভ-কৃষ্ণাভ নাক্কারজনক সেই বিদ্যুৎ-প্রভা। দেখেই তো চোখ ছানাবড়া হওয়ার দাখিল দুজনের। মুখ দিয়ে কথা সরল না। ফ্যালফ্যাল শুধু চেয়ে রইল প্রফেসরের পানে—মন্ত্রমুগ্ধের মত।

আস্তে আস্তে খুলে গেল তাঁর দু-চোখের পাতা। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে

এল দুচোখের তারা দিয়ে। পরক্ষণেই ঝলসে উঠল অশুভবর্ণের লকলকে বিদ্যুৎ রেখা কপালের মাঝখানে। পর-পর ছুঁয়ে গেল ম্যা আর নার্সের ললাটদেশ। দুজনেই মুখ থুবড়ে পড়ল বিছানার ওপর।

সেকেণ্ড কয়েক পরেই একই সাথে মুখ তুলল দুজনে। চোখ ভাবলেশ-হীন মড়ার চোখের মতন। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল পাথরে পাথরে ঘর্ষণের মত কর্কশ কণ্ঠস্বর—"গোলাম হাজির। আদেশ করুন।" অপার্থিব ভয়াল চাপাগলায় প্রফেসর বললেন—"আমার প্রথম কাঁটা সরাও সবার আগে—তারপর দখল করো এই উপগ্রহ।"

"প্রথমে কাকে?"

"ঐ কলের কুকুরটাকে। তারপর দীননাথ মুর্খটাকে। তারপর ডক্টর কৌ-কে ধরে নিয়ে এসো আমার সামনে—তার ব্রেনটাও আমার দরকার।"

যন্ত্রবৎ ঘুরে দাঁড়াল দুজনে। ঘরের এককোণে চারপায়ে দাঁড়িয়ে প্রফেসরকে এতক্ষণে অবজারভেশনে রেখেছিল ক-৫। তার চোখের টি-ভি ক্যামেরায় পুরো দৃশ্যটার ছবি উঠে গেছিল ভিডিও টেপে—মায় কথাবার্তা শব্দ। এই টেপ থেকেই ডক্টর কৌ জানতে পারেন পুরো নাটকটা।

ম্যা আর নার্স এক পা এগিয়েছিল ক-৫-য়ের দিকে। রোবট তৈরি করার সময়ে তাদের যান্ত্রিক মগজে ছেপে দেওয়া হয় কে শত্রু আর কে মিত্র। ভুলেও তারা মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। তাই এতক্ষণ চুপ করেছিল। কিন্তু যে-ই নার্স আর ম্যা অমানুষে পরিণত হল, সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হল ক-৫। ইলেকট্রনিক গজরানি শোনা গেল ধাতব কণ্ঠে।

"নেগেটিভ···নেগেটিভ···নেগেটিভ। আর এগিও না!"

থমকে গেল আগুয়ান দুই মূর্তি। দৃষ্টি বিনিময় করল নিঃশব্দে। পরক্ষণেই ফস্ করে কোমর থেকে ব্লাস্টার টেনে বার করল ম্যা।

তীক্ষ্ণ ধাতব কণ্ঠে এবার চেঁচিয়ে উঠল ক-৫—"খবরদার! সাবধান করে দিচ্ছি কিন্তু!"

ব্লাস্টার তাগ করল ম্যা। ক-৫য়ের যান্ত্রিক চক্ষু নিবদ্ধ হল সেই দিকেই। বললে ক্যানেস্তারা-বাজানো গলায়—"আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আমার মধ্যেও আছে।" কথা শেষ হতে না হতেই নাকের তলা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা ব্লাস্টারের নল। "হুঁশিয়ার করে দিয়েছি আগেই। খবরদার, অস্ত্র নামাও!"

ট্রিগার টিপল ম্যা। কিন্তু ক-৫য়ের ইলেকট্রনিক অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হল তার এক ভগ্নাংশ সেকেণ্ড আগে। মানুষের চোখ আর রিফ্লেক্স এত দ্রুত কাজ করে না। ম্যা-য়ের আঙুল ট্রিগারে চেপে বসতে না বসতেই আত্ম-রক্ষার তাগিদে ব্ল্যাস্টার নিক্ষেপ করল ক-৫। পর-পর দু-বার। দুটো কবন্ধ দেহ লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে—মুণ্ড উড়ে গেছে ব্ল্যাস্টারের অদৃশ্য রশ্মিতে!

প্রফেসরের স্বেচ্ছা-সংজ্ঞালোপও সম্পূর্ণ হল এতক্ষণে। সংজ্ঞালোপ ঘটছিল ধীরে ধীরে, হতচ্ছাড়া ভাইরাস মাথা তুলেছিল সেই ফাঁকে। প্রফে-সরের মন পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতেই জারিজুরি আর রইল না তার। মিলিয়ে গেল কপালের বিদ্যুৎ-বহ্নি। বন্ধ হল চোখের পাতা।

ঠিক এই সময়ে ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর। ক-৫ আক্রান্ত হতেই অ্যালার্ম-বেল বেজে উঠেছিল তাঁর ইলেকট্রনিক হাতঘড়িতে। তাই দৌড়ে এসেছেন ঊর্ধ্বশ্বাসে।

অ্যালার্ম-সংকেত আমিও শুনেছিলাম। পাগলা-ঘণ্টি বেজে ওঠার মত মিউজিক্যাল বীপ-বীপ ধ্বনিটাও যেন ক্ষেপে উঠেছিল। কোথায় লাগে আফ্রিকার জংলী বাজনা! ডক্টর তখন আমাকে বোঝাচ্ছিলেন। বিদ্যুৎ-বহ্নি যেহেতু আমাকেও স্পর্শ করেছে, অতএব বাহ্যতঃ নীরোগ থাকলেও এবং মনের দিক দিয়ে নির্মল থাকলেও আমাকে ড্যাটালাইজ এবং স্ক্যানিং করা দরকার। হাজার হোক অজ্ঞাত ভাইরাস তো! প্রচ্ছন্ন ভাবে কোথাও যদি ঘাপটি মেরে থাকে, ঠিক ধরা পড়ে যাবে। আমি কিন্তু বেঁকে বসেছিলাম। উনি ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলেছিলেন—"বুঝেছি। প্রফেসর ঠিকই বলেছেন। আপনার ব্রেনের দৌলতেই রোগ প্রতিষেধ শক্তি এই ক্ষেত্রে আপনার মধ্যে প্রবল।" ঠিক এই সময়ে ইলেকট্রনিক অ্যালার্ম বাজনা বাজিয়ে দিল আফ্রিকান জঙ্গী বাজনার কায়দায়। ডক্টর-য়ের সেই মুহূর্তের ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়টা ছবি তুলে রাখার মতন।

ফিরে এসে বললেন সব ঘটনা। শুনে আমি খুব একটা অবাক হলাম না। পাজী নচ্ছার ভাইরাসটার সঙ্গে মোকাবিলা এর আগেও তো আমার হয়েছে। তবে সেই থেকে ডক্টর এমন ঘ্যানর ঘ্যানর করতে লাগলেন আমাকে এক প্রস্থ ড্যাটালাইজ আর স্ক্যানিং করার জন্যে যে কান ঝালা-

পালা হয়ে গেল আমার। রাজী হলাম শুধু কান আর মনটাকে কিছুক্ষণ জিরেন দেওয়ার জন্যে।

শুয়ে পড়েছিলাম একটা কোচে। প্রফেসরের দেহ ঘিরে যে সব উদ্ভট জটিল যন্ত্রপাতি দেখেছিলাম, আমাকেও ঘিরে ধরেছিল সেই ধরনের রাশি রাশি কলকব্জা। তারপর জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখি, প্রফেসরের ঘরেই নিয়ে আসা হয়েছে আমাকে। উনি তখনও অচেতন। আমার খাটের পায়ার কাছে চারপায়ে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে রয়েছে ক-৫।

আমি চোখ খুলে ইতি-উতি তাকাতেই ডক্টর বললেন ক্লাশে ছাত্র পড়ানোর ঢংয়ে—"ক-৫, ভাইরাস সংক্রমণে সংক্রামিত হওয়ার পুরো সুযোগ পেয়েছিলেন দীননাথবাবু। স্ক্যানিংয়ের রেজাল্ট কী?"

দপ্ করে আলো ফ্ল্যাশ দিল, খর-খর ঝন্-ঝন্ কড়াৎ-কড়াৎ করে আওয়াজ হল, বিবিধ ইন্সট্রুমেন্ট রকমারি আওয়াজ করে অশ্রুতপূর্ব ঐকতান সৃষ্টি করল। ক-৫ বললে কাংস কন্ঠে—"নেগেটিভ রেজাল্ট—ইমিউনিটি কমপ্লিট। প্রতিষেধ ব্যবস্থা সুদৃঢ়—রুগী নীরোগ।"

ব্যাজার গলায় ডক্টর বললেন—"কিন্তু ভাইরাসের ছিটেফোঁটাও কি নেই ব্রেনে?"

"নিরেট মাথা···ভাইরাস নেই!" কাংসকন্ঠের সেই প্রতিবেদন শুনে ইচ্ছে হল খাট থেকে লাফিয়ে গিয়ে গলা টিপে ধরি হতভাগা ক-৫য়ের। কিন্তু সাহস হল না। যার নাকের তলা দিয়ে ব্লাস্টারের চোঙ বেরিয়ে এসে অদৃশ্য রশ্মি উগরে দেয় চক্ষের নিমেষে—তার গলা টিপে ধরার চেষ্টা করা আর আত্মহত্যা করা নামান্তর মাত্র।

নিরাশ হলেন ডক্টর। শায়িত প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে বললেন—"আমাদের একমাত্র গিনিপিগ তাহলে উনিই। রোগটা শুধু ওঁকেই কাবু করতে পেরেছে—আর যে দুজন কাবু হয়েছিল, তারা তো এখন পরপারে। তবে বাহাদুরি আছে প্রফেসরের। কাবু হয়েও গোলাম বনেননি—সমানে লড়ে যাচ্ছেন। চমৎকার কেস! দীননাথবাবু যখন নীরোগ, তখন অপারেশন করব প্রফেসরকেই!"

১২ ॥ অপারেশন ভণ্ডুল

অজ্ঞাত ভাইরাসের শক্তি যে কতদূর পর্যন্ত পেঁছোয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল অচিরেই।

চমকপ্রদ সেই বিবরণ উপস্থাপিত করার আগে ছোট্ট বন্ধুদের কাছে সসঙ্কোচে একটি নিবেদন রাখি। একটু ধৈর্য ধরতে হবে। কাহিনী প্রসঙ্গে দু-একটা বিষয় প্রাঞ্জল করা দরকার। উদ্ভট আখ্যায়িকার দুর্বোধ্যতা তাতে দূরীভূত হবে।

অজ্ঞাত ভাইরাস আক্রান্ত প্রফেসরের ললাট ঘিরে বিদ্যুৎ-বহ্নি, দেহ ঘিরে বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণ এবং কপাল ফুঁড়ে বিদ্যুৎ-লতা নিক্ষেপ-কাহিনী পড়ে যারা গঞ্জিকা-প্রসূত কাহিনী মনে করছে, তারা যেন খেয়াল রাখে এই বিংশশতাব্দীতেই রাশিয়ার কিরলিয়ান দম্পতি এমন একটা ফটোগ্রাফিক কলাকৌশল আবিষ্কার করেছেন যার দৌলতে মনুষ্যেতর প্রাণী, উদ্ভিদ এবং খনিজের গা থেকে ঠিকরে আসা প্রাণঃজ্যোতির বহুবর্ণ আলোকচিত্র স্বচক্ষে দেখা সম্ভব। তাঁরা দেখিয়েছেন, যাঁরা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন, তাঁদের আঙ্গুলের ডগা দিয়ে এবং চোখের মধ্যে দিয়ে অগ্নিশিখার মত জ্যোতি লকলকিয়ে ঠিকরে আসে। মনে হয় যেন ভলকে ভলকে অগ্ন্যুৎপাৎ ঘটিয়ে চলেছে আঙুলের ডগায় বা চোখের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অনেকগুলি ক্ষুদে আগ্নেয়গিরি। অতীন্দ্রিয় ব্যক্তিরা মনঃসংযোগ করলেই আশ্চর্য এই অগ্নিশিখা-বিচ্ছুরণ বৃদ্ধি পায়—সাদা চোখে কিন্তু কিছুই দেখা যায় না। এই শক্তিধারাকে কেউ বলেন অডিক ফোর্স। জগদ্বিখ্যাত য়ুরি গেলার শুধু অঙ্গুলি হেলনে চামচ বেঁকিয়ে দিতে পারেন নাকি এই ভয়ংকর শক্তির প্রতাপেই। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর 'পাওয়ার অফ মাইণ্ড' পুস্তিকায় বলেছেন, মনের শক্তি অসীম। দূরস্থিত বস্তু স্থানচ্যুত করা যায় কেবল মনঃ-সংযোগের ফলে। যোগীপুরুষরা চেয়ে থেকে কোনো বস্তুতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারেন, এমন ঘটনাও আমার জানা আছে। এর মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার কিছু নেই—সবটাই বৈজ্ঞানিক ব্যাপার—কিন্তু সসীম বুদ্ধি-সম্পন্ন কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করতে অক্ষম। কিন্তু ঘটনাকে তো অস্বীকার করা যায় না।

যে অডিক ফোর্স বা প্রাণশক্তি বিশ্বের সব বস্তুর মধ্যে বিরাজমান, তা

অজ্ঞাতকুলশীল মহাশূন্যের এক ভাইরাসের মধ্যেও থাকবে না কেন? মন জিনিসটা আজও দুর্জ্ঞেয়, চিররহস্যে ভরা। এই নিতল প্রহেলিকার গভীরতায় বিংশশতাব্দীর বৈজ্ঞানিকরা আজও হাবুডুবু খাচ্ছেন—থই পাচ্ছেন না। অসীম ক্ষমতা এই মনের। সেই ক্ষমতা দখলের প্রয়াস মহাশূন্যের ভাইরাস যদি করে থাকে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে কি? অজ্ঞাত ভাইরাস নিজেকে শক্তিমান করে তুলতে চায় মনের এই ক্ষমতা সংগ্রহ করে। মনের ক্ষমতাই তার একমাত্র খোরাক। মনই তার একমাত্র আহার। মনই তার জীবনধারণের এবং পুষ্টিসাধনের একমাত্র উৎস। কেন না, ভাইরাসরা তো সজীব দেহ আশ্রয় না করে বাঁচে না। ভাইরাস নানাজাতীয় আছে। এরা আকারে ক্ষুদ্রতম ব্যাক্টেরিয়া থেকেও ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণেও সাধারণতঃ এদের দেখা যায় না। অবশ্য ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে আজকাল কোনো কোনো ভাইরাসকে বহুগুণ বর্ধিতাকারে দেখা সম্ভব হয়েছে। সজীবদেহ আশ্রয় না করলে ভাইরাসরা বাঁচতে পারে না, বংশবৃদ্ধিও করতে পারে না। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে মনে হয়েছে, এরা অতি জটিল গঠনের সূক্ষ্ম রাসায়নিক পদার্থ, হয়তো বিশেষ একরকমের জীব-ধর্মী প্রোটিন কণিকা। মহাকাশের আগন্তুক এই অজ্ঞাতকুলশীল ভাইরাসটিও তার ব্যতিক্রম হবে কেন? শুধু যা লক্ষ কোটি বছরেও এর মৃত্যু হয়নি—ভেসে ভেসে বেরিয়েছে মহাশূন্যের দিকে দিকে গুটি আকারে—উপযুক্ত পরিবেশে এবং মন নামক খোরাকের সান্নিধ্যে এসে আবার বিপুল তেজে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। মানুষ কি আজও তার চেনাজানা পৃথিবীতে সব মাইক্রো অরগ্যানিজমের হদিশ পেয়েছে? পায়নি। মহাসাগরের তলদেশে যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছোয় না, যেখানে মাথার ওপর ৩৮,০০০ টন জলের ভয়ংকর চাপ—সেখানেও সম্প্রতি অভিযান চালিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক নতুন মাইক্রোঅরগ্যানিজম—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব। তবে কেন অজানা মহাকাশ থেকে ভেসে আসবে না এমন এক আপাতঃ নিষ্ক্রিয় বুভুক্ষু ভাইরাস যার একমাত্র আহার মন—যে মনের মধ্যেকার অসীম শক্তিভাণ্ডারের সন্ধান কেবল সে-ই রাখে—মনের মালিক মানুষ এখনো রাখে না?

কাহিনীর প্রথম প্যারাগ্রাফেই তাই বলেছি, এ পৃথিবীতে অবিশ্বাস্য কিছু নেই। সব সম্ভব, সব সম্ভব, সব সম্ভব।

মেডিক্যাল ইলেকট্রনিক্স এক্সপার্ট ডক্টর অ্যানড্রিজা পুহারিক মনের শক্তি

নিয়ে বহু গবেষণা করে চমৎকৃত হয়েছেন। য়ুরি গেলারের মানসিক ক্ষমতায় তিনি অভিভূত হয়েছেন। মনের এই শক্তিকে কেউ-কেউ বলেন রেডিওনিক এনার্জি। হিরোনিমাস নামে এক ব্যক্তি ১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ২,৪৮২,৭৭৩ নম্বর পেটেন্ট করেন বস্তু থেকে শক্তি বিচ্ছুরণ সংক্রান্ত আবিষ্কারটির। তিনি দেখেন, দূর থেকে রেডিওনিক এনার্জি ফোকাস করে পোকামাকড় অদৃশ্য করে দেওয়া যায়। স্তম্ভিত হয়ে গেছিলেন হিরোনিমাস এই আবিষ্কারের পর। মানুষ পর্যন্ত তো তাহলে অদৃশ্য করে দেওয়া সম্ভব মনের রেডিওনিক এনার্জির সংহত শক্তিবলে? ভয়ের চোটে তাঁর আবিষ্কারের মূল সূত্রগুলি বেমালুম চেপে গেছেন হিরোনিমাস।

এই রেডিওনিক এনার্জি বা অডিক ফোর্স জীবদেহের বায়োইলেকট্রিসিটি, না, ম্যাগনেটিজম তা নিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আজও কেউ পৌঁছোতে পারেন নি। একটা অজ্ঞাত শক্তিধারা যে আমাদের দেহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, মনের তেজ যে তারই বহিঃপ্রকাশ—এরকম ধারণা করে নেওয়া হয়েছে। বায়োইলেকট্রিসিটি বা শরীরের তড়িৎ নতুন কোনো কথা নয়। অনেক জীব বিবর্তনের তাগিদে ইলেকট্রিসিটি আবিষ্কার করেছে, যখন মানুষ কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেত, গায়ে জামা কাপড় চাপাতেও শেখেনি—তখন থেকে। যেমন, টর্পেডো মাছ। দেখলে মনে হবে স্টীমরোলারের তলায় পড়ে চেপ্টে যাওয়া একটা থালা। অল্প জলে বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে থাকে। শত্রুকে আক্রমণ করে ইলেকট্রিক ডিসচার্জে। নিজেরা কিন্তু শক্ খায় না। সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে ইলেকট্রিক ঈল—যদিও তারা আদৌ ঈল নয়—মাছ। দেখতে ঈলের মত—লম্বা, কালো, প্রায় সাপের মত। দক্ষিণ আমেরিকার কোনো কোনো নদীতে এদের সাক্ষাৎ মেলে। লম্বায় আট ফুট পর্যন্ত হয়, গতরে পূর্ণবয়স্ক মানুষের জানুর মত মোটা-সোটা। ইলেকট্রিক ডিসচার্জে এরা একটা ঘোড়াকে পেড়ে ফেলতে পারে, মানুষকে তো বটেই। ছ'শ ভোল্ট বিদ্যুৎ-বজ্র দিয়ে 'বিজলি ঈল' যে কোনো শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। লণ্ডন-জু-তে এরকম একটা বিজলি ঈল আছে। জ্যান্ত মাছ সামনে এলেই তার সর্বাঙ্গ একবার থরথর করে কেঁপে ওঠে—যেন একটা শক্তিশালী ডায়নামো পুরোদমে চালু হয়ে যায় শরীরের মধ্যে। মাছটা নিথর হয়ে যায় চক্ষের নিমেষে—যেন বজ্রাহত হয়েছে এমনিভাবে ধীরে ধীরে উল্টে গিয়ে ভাসতে থাকে। ঈল এসে

তাকে কোঁৎ করে গিলে নেয়।

মানুষও সে জীব। তার মধ্যেও বিজলি শক্তি আছে বৈকি। তবে কম মাত্রায়। কাজেই মানুষকেও বলা যায় জীবন্ত ইলেকটি্রক ব্যাটারী। বিশেষ অবস্থায় জীবদেহের এই বিদ্যুৎ, এক কথায় যার নাম বায়োইলেকটি্রসিটি, বিচ্ছুরিত করা যায়। ক্ষীণ তড়িৎশক্তিও গ্যালভানোমিটারে মাপা যায়—এই পদ্ধতি থেকেই উদ্ভাবিত হয়েছে ইলেকট্রোকারডিওগ্রাফ—হৃদযন্ত্রের ইলেকটি্রসিটি মাপবার যন্ত্র। হার্টের মাস্‌ল্‌ ছাড়াও অন্যান্য পেশীও ইলেকটি্রক কারেন্টে ভরপুর। ধড় আর হাত-পায়ের শক্তিশালী পেশী থেকে যে-পরিমাণ ইলেকটি্রসিটি বিচ্ছুরিত হয়, তা দিয়ে নকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষুদে মোটর চালানো যায়। মস্তিষ্ক থেকে বিচ্ছুরিত তড়িৎ-প্রবাহ মূলতঃ তিনটে তরঙ্গাকারে বিচ্ছুরিত হয়—আলফা, বিটা এবং ডেলটা। এছাড়াও আছে গামা ওয়েভ, থিটা ওয়েভ। আলফা ওয়েভে থাকে ১০ থেকে ১০০ মাইক্রোভোল্ট তড়িৎ প্রবাহ—ডেলটায় থাকে ২০ থেকে ২০০ মাইক্রোভোল্ট। মানসিক প্রয়াসে আলফা ওয়েভকে অদৃশ্য করে দেওয়া যায়। তাই যদি হয়, মানসিক চেষ্টায় তড়িৎ-প্রবাহকে বাড়ানো যাবে না কেন? এই সম্ভাবনা যে অযৌক্তিক নয়, আশ্চর্য এই কাহিনীই কি তার প্রমাণ নয়? অজ্ঞাত ভাইরাস প্রচণ্ড মনঃশক্তির অধিকারী মানুষের মন-মস্তিষ্কে জাঁকিয়ে বসে তারই বায়োইলেকটি্রসিটিকে বহুগুণে বর্ধিত করে নিক্ষেপ করছে শত্রুর ওপর, অবশ করছে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, জয় করছে তার মস্তিষ্ক। আরও আছে, আরও আছে, সুবিশাল এই তত্ত্বকথা পরিবেশনের পর আসা যাক সেই প্রসঙ্গে। প্রফেসরের দেহাশ্রিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাস যে কি প্রলয়ংকর বিপর্যয় ডেকে এনেছিল টাইটান গ্রহের গ্যালাক্সি হাসপাতালে নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে শোনার সঙ্গে সঙ্গে—এবার শুরু হোক সেই লোমহর্ষক কাণ্ডকারখানা।···

প্রফেসরকে অপারেশন করবেন, ডক্‌টর এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনতিকাল পরেই শুরু হল রোমাঞ্চকর ঘটনা পরম্পরা···

গ্যালাক্সি রিসার্চ হসপিট্যালের রসদ বহন করে আনছিল রবীন্দ্র-সাটল্‌। সুবিশাল স্পেশ মেশিন। স্পেশ এবং টাইমের রহস্যাবৃত অঞ্চল ভর্টেক্সের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে চক্ষের নিমেষে এসে

পৌঁছেছে সৌরজগতের দূরতম প্রান্তে। মহাকাশ পোতটি একাধারে টাইম মেশিন এবং স্পেশশিপ। দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার সময়ে টাইম মেশিন—আবার গন্তব্যস্থলের অনতিদূরে এসেই দৃশ্যমান হয় স্পেশশিপ রূপে—ধীরে ধীরে অবতরণ করে স্টেশন ডকিং বে'তে—পরস্পরবদ্ধ হয়ে যায় মাস্টার-কম্পিউটারের যান্ত্রিক নৈপুণ্যে। কড়াং-কড়াং করে আওয়াজ শোনা যায়, মহাকাশ পোতের এয়ারলকের সঙ্গে ডকিং বে'র এয়ারলক যুক্ত হয়ে গেলেই হিস হিস শব্দ শোনা যায়। কন্ট্রোল কেবিনে কম্পিউটার হেঁড়ে গলায় হেঁকে ওঠে—"ডকিং কমপ্লিট। শিপ লক্‌ড্‌-অন।" ক্রুম্যান-রা হেলমেট আর স্পেশ গন্টলেট মাথায়-মুখে পরে নেয়। স্পেশ-স্যুটের পকেটে প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে এয়ার-লক দরজার কাছে আসে। দরজা খুলে ছোট্ট সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে। আর একটা দরজা খুলে ঢুকে পড়ে ধাতব অলিন্দে। নিকটস্থ লাউডস্পীকারে ধ্বনিত হয় প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর—"স্বাগতম টাইটান!"

বরাবর এই রকমই হয়ে আসছে। পৃথিবীগ্রহ থেকে শনিগ্রহের যাত্রীদের এইভাবেই সাদর অভ্যর্থনা জানানোর রেওয়াজ। তাই স্পেশমেশিন টাইটানের কাছে এসেই নাটকীয়ভাবে দৃশ্যমান হয় স্পেশশিপ রূপে—হেলতে দুলতে নেমে আসে রাজকীয় অভ্যর্থনার লোভে। এ রীতির অন্যথা কখনো হয়নি। কিন্তু এইবার হল।

পুরোনো প্রথার ব্যতিক্রম ঘটতে চলছে অভাবনীয়ভাবে, রবীন্দ্র সাট্‌ল্‌-য়ের ক্যাপ্টেন হ তা জানবেন কি করে? তিনি তো আর জ্যোতিষী নন। কম্যান্ড চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে আরাম করছিলেন ভদ্রলোক। দুজন ক্রু মেম্বার তাঁর ঠিক পশ্চাতেই অ্যাকসিলারেশন কোচে বসে ঢুলছে। অ্যাসটেরয়েড কে-৪০৬৭ এসে গেল বলে—এবার তাই এই আয়েশী ব্যবস্থা—শরীর এলিয়ে দেওয়ার আয়োজন। বিংশ শতাব্দীতে রোল্‌স্‌ রয়েস এসে গেলেও অশ্ব-শকটের জাঁকজমক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা পছন্দ করতেন—স্পেশ মেশিনের যুগেও তাই পুরোনো প্রথা চলে আসছে। তিনজনেই গা ঢেলে দিয়েছে সেই কারণেই তাই। আদ্দিকালের স্পেশশিপের মত ডকিং-য়ের প্রাক্কালে যন্ত্রপাতি নিয়ে উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে বসে থাকতে হয় না কাউকে—মাস্টার-কম্পিউটার মসৃণ দক্ষতায় সে কাজ সম্পন্ন করবে। সবই রুটিন মাফিক কাজ। টাইটানের রাজকীয় অভ্যর্থনার সুখস্বপ্নে তিনজনেই

মশগুল।…

বাইরে, মহাশূন্যের নিরন্ধ্র তমিস্রায়, একটা ভাসমান নিরাকার শৈত্য সহসা আবির্ভূত হল। কোত্থেকে যে এত ঠাণ্ডার আবির্ভাব, তা কিন্তু বোঝা গেল না। সাট্‌লে্‌র গমন পথের সামনেই আচম্বিতে তা আকার গ্রহণ করতে লাগল। সাট্‌ল্‌ প্রবেশ করল তার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের মধ্যে থেকে বিদ্যুৎরেখা লকলকিয়ে ছিটকে এল, মহাকাশপোত বেষ্টন করে নৃত্য করে চলল পরমানন্দে…

হঠাৎ খেয়াল হল ক্যাপ্টেনের। মহাকাশপোতের গতিবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চূড়ান্ত পাওয়ার-ড্রাইভে পে'ীচেছে। সোজা ধেয়ে যাচ্ছে অ্যাসটেরয়েড অভিমুখে।

আতংকে উন্মাদপ্রায় ক্যাপ্টেন সুইচ টিপে কর্মাপিউটার চালিত কণ্ট্রোলকে হস্ত চালিত অবস্থায় আনবার চেষ্টা করলেন। অনেক গুলো বিদ্যুৎ-শুঁড় ফ্ল্যাশ দিল কর্মাপিউটারের কী-বোর্ডে, বলয়াকারে নৃত্য করতে লাগল ক্যাপ্টেন এবং ঢুলন্ত দুই সঙ্গীর মাথা ঘিরে। চোখে ধোঁয়া দেখলেন ক্যাপ্টেন। চেতনা যখন লুপ্তপ্রায়, কানে ভেসে এল কর্মাপিউ-টারের হেঁড়ে গলা—"গোলাম হাজির। হুকুম তামিল করলাম।" কেটে গেল চোখের ধোঁয়া—প্রশান্ত ভঙ্গিমায় ঠেস দিয়ে বসলেন ক্যাপ্টেন্‌ হ। শান্ত দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলেন, স্পেশশিপ উল্কা বেগে ধেয়ে চলেছে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে। "গোলাম হাজির—আদেশ করুন"—বিড় বিড় করে আউড়ে গেলেন ভদ্রলোক। আদেশ এসে গেছে—তা পালন করাও হচ্ছে…সব ঠিক আছে…এখন শুধু সংঘাতের প্রতীক্ষা…

ব্রেন অপারেশন চাট্টিখানি কথা নয়। দীর্ঘ সময় লাগে প্রস্তুতি পর্বে। প্রফেসরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। ডক্টর ভারী হুঁশিয়ার পুরুষ। বারংবার স্ক্যান করলেন প্রফেসরের ব্রেন—তাঁর প্রযত্ন এবং অতি-সাবধানতায় প্রফেসরের ধৈর্যচ্যুতি হওয়ার উপক্রম হল। ডক্‌টর কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্বিকায় থাকতে পারলেন না। আগের মতই বেজায় খিটখিটে হয়ে উঠলেন প্রফেসরের বালকোচিত অধৈর্যতা দেখে। দাবড়ানিও দিলেন কয়েকবার। তিনি তো জানেন মরিয়া হয়ে অপারেশন

করতে চলেছেন—শেষ চেষ্টাও বলা যায়। অপারেশন অন্তে প্রফেসর জীবত না-ও থাকতে পারেন—এমন সম্ভাবনাও মাথার মধ্যে ঘুরপাক দিচ্ছে বলেই আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দু-চারটে ধমক দিতেই প্রফেসরও তাঁর বিখ্যাত খিটখিটে মেজাজের যৎসামান্য নিদর্শন হাজির করলেন। লেগে গেল দুই বৈজ্ঞানিকে, সে এক দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড! শ্যাম রাখি কি কুল রাখি, এই নিয়ে আমি পড়লাম মহাফ্যাসাদে।

ডক্টরই জিতলেন শেষ পর্যন্ত। আশ্চর্য লোক বটে! প্রথমে যাঁকে শান্ত সৌম্য, অমায়িক দেখেছিলাম, পরে তাঁকে দেখেছিলাম খিটখিটে বদমেজাজী রূপে। এখন দেখলাম তাঁর কড়া, জবরদস্ত সার্জন রূপ। এ আর এক মূর্তি। প্রফেসরের চেঁচামেচির তোয়াক্কা করলেন না। পরে তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন, এ ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। প্রফেসর বড় ভয়ংকর বিপদে পড়েছিলেন। হয় তাঁকে মহাকাশের ভাইরাস ভূতের খপ্পরে থেকে যেতে হবে মনের দিক দিয়ে—গোলাম হয়ে থাকতে হবে যাবজ্জীবন; অথবা, প্রফেসরের নিজের ভাষাতেই—অনন্তকাল মনঃহীন হয়ে থাকতে হবে।

শেষকালে নাচার হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন প্রফেসর। অস্ত্র চিকিৎসকের ধড়াচূড়া পরে, মুখে মুখোশ এঁটে, ডক্টর প্রফেসরকে টেবিলে শুইয়ে ঝুঁকে পড়লেন তাঁর ওপর। ক-৫ একপাশে চতুষ্পদে খাড়া রইল অপারেশন মনিটর করার জন্যে। বিষম অস্বস্তি নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার কাছে। ডক্টর আমাকে অন্যত্র যেতে বলেছিলেন, কিন্তু প্রফেসরকে পাঁচহাজার তিনশ একুশ সালের অপারেশন টেবিলে শুইয়ে আমি কোথাও যেতে পারলাম না। কাকুতি মিনতি করে দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার কাছে।

শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেন ডক্টর—"নার্স, এখন কোনো অ্যানেস্থেটিক নয়! সমাধিস্থ রয়েছেন প্রফেসর। ক-৫, ব্রেন মনিটর করো। সম্মোহ কাটিয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা গেলেই হুঁশিয়ার করে দেবে আমাকে তক্ষুনি—নইলে এমন শক্ পাবেন যে মারা যাবেন।"

"তথাস্তু, প্রভু।" রোবটের কণ্ঠে এমন মুনি-সুলভ বরাভয় শুনে ভীষণ হাসি পেল ঐ অবস্থাতেও। চীজ বটে একখানা! কখনো বরদান করছে, কখনো গোলাম হোসেন সাজছে। যেমন ডক্টর, তেমনি তাঁর

চালা !

ঝুঁকে পড়লেন ডক্টর। প্রফেসরের মস্তিষ্কে লেজার মাইক্রো-তদন্তের প্রথম পর্যায়ে অতি-সূক্ষ্ম ছুরি চালানোর জন্যে প্রস্তুত হলেন। এমন সময়ে লাউডস্পীকারে গাঁক-গাঁক করে ধ্বনিত হ'ল একটা কণ্ঠস্বর—"এমারজেন্সি ! এমারজেন্সি ! - সমস্ত স্টেশন ! সমস্ত স্টেশন ! এমারজেন্সি ! সাপ্লাই-সাট্ল্ ঘাঁটির দিকে সংঘাত-রেখায় ছুটে আসছে। মনে হচ্ছে কণ্ট্রোল নষ্ট হয়েছে। সিগন্যালের সাড়া দিচ্ছে না ! জখম ডিপার্টমেন্টে ডাক্তার আর নার্সরা এখুনি রিপোর্ট করুন। আবার বলছি, ডাক্তার আর নার্সরা এখুনি চলে আসুন ! এমারজেন্সি ! এমারজেন্সি !"

স্ক্যালপেল নামিয়ে রেখে গুঙিয়ে উঠলেন ডক্টর—"ঠিক এই সময়ে এমারজেন্সি ? কেন ? কেন ? কেন ?"

দ্বিধায় পড়লেন ভদ্রলোক। অপারেশন চালিয়ে যাবেন ? লাউড-স্পীকারের গাঁক-গাঁক চীৎকার আবার শুরু হতেই ধুত্তোর বলে ফেলে দিলেন স্ক্যালপেল। এই হট্টগোলের মধ্যে এত সূক্ষ্ম ব্রেন অপারেশন সম্ভব নয়। তা ছাড়া, সংঘাত ঘটলে কি ধরনের ক্ষতি হবে, সে ভবিষ্যদ্‌ বাণীও করা যাচ্ছে না। পাওয়ার সাপ্লাই যদি ব্যাহত হয় ? অন্ধকারে অপারেশন চালাতে গিয়ে প্রফেসরকে মেরে ফেলবেন নাকি ?

স্পীকার কণ্ঠস্বর তখনও তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে—"এমারজেন্সি ! এমারজেন্সি ! সমস্ত মেডিক্যাল স্টাফ ক্যাজুয়ালটি অ্যাটেন্ড করুন এখুনি !"

ছটফট করছিল নার্স। এবার সরব হল—"স্যার, আমাদের যাওয়া দরকার।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাওয়া দরকার। ক-৫, তোমার চার্জে রইলেন প্রফেসর। কাউকে কাছে আসতে দিও না। বুঝেছো ?"

"তথাস্তু।"

স্পেস বিদীর্ণ করে তীক্ষ্ম শব্দে বেরিয়ে এল সাপ্লাই-সাট্ল্। আছড়ে পড়ল গ্যালাক্সি রিসার্চ হসপিট্যালের এক প্রান্তে। বিশাল বিল্ডিং ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল ওপর দিকে, ভেসে গেল মহাশূন্যে। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের বায়ুচাপ নষ্ট হয়ে যেতেই মহাশূন্য সোঁ-সোঁ করে টেনে নিল যন্ত্রপাতি, কড়িবরগা, এমন কি মানুষকেও।

বিল্ডিংয়ের একপাশে গভীরভাবে গেঁথে গেল সাটল্‌টা। কিন্তু সংঘাতের স্থান আগে থেকেই অংক কষে হিসেব করা ছিল বলেই আসল জায়গাটা বেঁচে গেল—প্রফেসর নিস্পন্দ দেহে প্রশান্ত মুখে সমাধিস্থ অবস্থায় শুয়ে রইলেন অপারেশন টেবিলে।

বিপুল সংঘর্ষের ভয়ানক আওয়াজে কানের পর্দা যেন ফালাফালা হয়ে গেল। সেইসঙ্গে চিৎকার, আর্তনাদ। মড়মড় করে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ধাতু আর প্ল্যাস্টিক। সারা ঘরটা কেঁপে উঠল থর থর করে। দপ্‌ দপ্‌ করে আলোগুলো নিভে গিয়েই ফের জ্বলে উঠল। সটান আছড়ে পড়লাম আমি। তড়াক করে ফের লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। কিন্তু সিধে হয়ে দাঁড়ানোও তখন প্রাণান্তকর ব্যাপার। প্রচণ্ড সেই ঝাঁকুনিতে মড়া মানুষ জেগে ওঠে, প্রফেসরেরও সমাধিভঙ্গ হল। চোখ মেললেন তিনি। পিট পিট করে চেয়ে থেকে বললেন মিন্‌ মিন্‌ করে—"ব্যাপারটা কী?"

চোখের চাউনিটা আগে লক্ষ্য করলাম। না, অমানুষিক চাউনি এখন নেই। নির্ভয়ে কাছে গেলাম। বললাম—"অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। একটা সাট্‌ল্‌ আছড়ে পড়েছে! ডক্‌টর গেছেন সেখানে।"

"আছড়ে পড়ল কোথায়?"

জবাবটা দিল ক-৫—"তিন নম্বর লেভেলে। বিল্ডিং ভেঙে পড়েছে, ফলে এই অঞ্চল এখন বিচ্ছিন্ন।"

"সেকী!" বলেই সটান উঠে বসলেন প্রফেসর।

কিন্তু স্পীকারের লাইন বিচ্ছিন্ন হয়নি। আবার ধ্বনিত হ'ল তার গম্‌গমে গলা—"যে যেখানে আছেন, তিন নম্বর লেভেলের অ্যাকসিডেণ্ট অঞ্চলে চলে আসুন এখুনি। আবার বলছি, তিন নম্বর লেভেল।"

প্রফেসর সামলে উঠেছিলেন। বললেন—"উঁহু, নিছক অ্যাকসিডেণ্ট বলে মনে হয় না আমার।"

"কেন মনে হয় না?" আমার প্রশ্ন।

"আমার মাথার মধ্যে যা রয়েছে, তার সঙ্গে নিশ্চয় এর সম্পর্ক আছে," প্রফেসরের কথার ধরনে রসিকতার ছিটেফোঁটাও নেই। "ক-৫, তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি?"

"তথাস্তু।" কাংসকণ্ঠে বরদান শুনে বাস্তবিকই হাস্যসংবরণ করা

কঠিন।

"ক্লোনিং টেকনিক, ক-৫, ক্লোনিং টেকনিক! ক্লোনিং-য়ের কায়দা কানুনগুলো একটু ঝালিয়ে নিতে চাই। সাহায্য করো, প্লীজ, যা জানো, শিখিয়ে পড়িয়ে দাও—ঝটপট!"

কলের কুকুর ক-৫'য়ের মগজ ঠাসা রাশি রাশি বৈজ্ঞানিক তথ্যে। কেউ যদি তা থেকে কিছু ধার চায়, দিতে কার্পণ্য করে না ক-৫। বরং খুশি হয়। রোবট-তৃপ্তিতে ভরপুর হল ক-৫। হঠাৎ বীপ-বীপ আওয়াজ করে উঠল এমনভাবে যেন কেশে গলা সাফ করছে।

বললে—"ক্লোন শব্দটা গ্রীক, মানে—নবপল্লব। ব্যক্তিবিশেষের একটিমাত্র কোষ থেকে সেই ব্যক্তিটির হুবহু নকল তৈরী করাকে ক্লোনিং বলে। সজীব প্রতিমূর্তি তৈরীর বিজ্ঞান। ব্যক্তিবিশেষের একটিমাত্র কোষকে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেই ছাঁচ থেকে বহু সৃষ্টি হয়। একটিমাত্র কোষ বিভাজন হয়েই বহু কোষ সমন্বিত প্রাণীর সৃষ্টি। তাই যে কোনো প্রাণীর একটিমাত্র কোষকে নকল করতে পারলেই নকলকোষ বিভাজন করে হুবহু নকল প্রাণী তৈরী হয়। আসল প্রাণীর সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে ক্লোন-প্রাণীর মধ্যে।"

"তারপর? তারপর?" অধীর কণ্ঠে বললেন প্রফেসর।

"প্রাণীদের কোষের মধ্যে ডি-এন-এ মলিকিউলরা বংশগতির পুরো তথ্য নিজেদের মধ্যে রেখে দেয়। ক্লোনের মধ্যে তার অনুলিপি সৃষ্টি করা যায়। বিংশ শতাব্দীর 'আটলান্টিক' মাসিক পত্রিকায় জেমস্ ওয়াটসন ক্লোনিং সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে সাড়া জাগিয়েছিলেন। জেমস্ ওয়াটসন সাধারণ মানুষ ছিলেন না—"

"জানি, জানি।" অস্থির কণ্ঠ প্রফেসরের—"ডি-এন-এ গঠন সম্পর্কে গবেষণা করে নোবেল প্রাইজ ভাগ করে নিয়েছিলেন। তারপর?"

কাংসকণ্ঠে বলে চলল ক-৫—"ওয়াটসন সাহেব মানুষ ক্লোনিংয়ের বিরুদ্ধে ছিলেন। ভয়ানক ভয় পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, বেশ কিছু জীববিজ্ঞানী আর চিকিৎসাবিজ্ঞানী ক্লোনিং-বিজ্ঞানে অনুপ্রবেশ করবেই। তখন শিব গড়তে বাঁদর গড়া হবে। মানুষ গড়তে গিয়ে মানুষের গড়া দৈত্য সৃষ্টি হবে। হাজার হাজার লাখ লাখ ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে পৃথিবী ছেয়ে যাবে।"

শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার।

কাঁসি বাজানো ঢং-ঢং টং-টং গলায় ক-৫ তখনো মহোৎসাহে বলে চলেছে (প্রফেসর উশখুশ করা সত্ত্বেও)—"ক্লোনিং বিজ্ঞানকে কিন্তু যে সব বৈজ্ঞানিকরা গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জে-বি-এস হ্যালডেনের মত বিংশশতাব্দীর ব্রিলিয়াণ্ট বৈজ্ঞানিক—ইনি ভারতের মাটিতে দীর্ঘ সময় থেকেছেন। দীর্ঘদেহী আধপাগলা এই বৈজ্ঞানিক পায়জামা পাঞ্জাবী পরে কলকাতায় ঘুরেও বেরিয়েছেন—"

"তাই নাকি !" আমি আর বিস্ময় রোধ করতে পারলাম না।

খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর—"চোপরাও।—ক-৫, দোহাই তোমার, কাজের কথাগুলো বলো। সময় খুব কম !"

ক-৫য়ের ভ্রুক্ষেপ নেই। জ্ঞানদানের সুযোগ পেলে কেউ ছাড়ে? বিলম্বিত লয়ে ফাটা কাঁসি বেজেই চলল—"হ্যালডেন সাহেব বলেছিলেন, 'স্পেশ্যাল এফেক্ট' সহ মানুষ-ক্লোনিং করা দরকার। এমন মানুষ তৈরী করা দরকার যাদের নৈশ-দৃষ্টি থাকবে, যন্ত্রণাবোধের অনুভূতি থাকবে না। নিকট-ভবিষ্যতে যুদ্ধবাজ মানুষরা যখন আলট্রাসনিক অর্থাৎ অতি-সূক্ষ্ম শব্দ-তরঙ্গ সমন্বিত অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করবে, তখন এমন মানুষ তৈরী করা দরকার যাদের শ্রবণযন্ত্র ঐ শব্দতরঙ্গ শুনতে পাবে না। এ ছাড়াও বামন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে ক্লোনিং বিজ্ঞানের কৃপায় যাতে নতুন কোনো গ্রহে গিয়ে সেখানকার অতি-মাধ্যাকর্ষণেও কলোনী স্থাপন করতে অসুবিধে না হয়। ফরাসী বায়োলজিস্ট জাঁ রোস্ট্যান্ড আরও চমকপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বলেছিলেন, মানুষকে অমরত্ব দান করতে পারে ক্লোনিং-বিজ্ঞান। অনেকগুলো ধারাবাহিক 'নকল' তৈরী করে রাখলেই ল্যাটা চুকে যায়। একটা 'নকল' যখনি জীর্ণ হবে, তার বদলে আর একটা 'নকল' চলে আসবে। এইভাবে মানুস অমৃত পান না করেও অমর হয়ে যাবে।"

প্রফেসরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম হ'ল এবার। আমার কিন্তু বেশ লাগছিল কাংসকণ্ঠের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা।

ক-৫ প্রফেসরের ভ্রূ-নৃত্য দেখেও দেখল না—"নোবেল প্রাইজ ধন্য ডক্টর যোশুয়া লেডালবার্গও স্নায়ুর অনুলিপি বানিয়ে ক্লোন মানুষকে সাহায্য করার আইডিয়া দান করেছিলেন বিজ্ঞানী মহলকে। এ ছাড়াও, ডক্টর ইলোফ অ্যাক্সেল কার্লসন একটা বড় ভয়ংকর প্রস্তাব এনেছিলেন।

আঁৎকে ওঠার মত প্রস্তাব। মড়াকে জাগানো হোক ক্লোনিং বিজ্ঞান দিয়ে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানুষদেব কবর খুলে কিছু না কিছু ডি-এন-এ নিশ্চয় পাওয়া যাবে। মিশরের ফারাও টুটেনখামেনের ম্যমীদেহ থেকে হাজার হাজার টুটেনখামেন সৃষ্টি তখন সম্ভব হবে।"

"ক-৫ ?" প্রফেসর গলা তুললেন। স্পষ্টতঃ ধৈর্য ফুরিয়েছে।

আর এক পর্দা গলা চড়িয়ে ক-৫ বললে—"এই সব কপোল কল্পনার মাঝে কর্ণওয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এফ-সি স্টুয়ার্ড ১৯৬০ সালে কিছু কাজের কাজ করলেন। গাজরের কোষ রাখলেন নারকেলের দুধ এবং আরও কয়েকটা পোষ্টাই জিনিসের মধ্যে। আশ্চর্য ব্যাপারটা দেখা গেল তখনি। কোষবিভাজন আরম্ভ হয়ে গেল আপনা থেকেই পুষ্পরেণুতে আবৃত না হওয়া সত্ত্বেও। অচিরেই অঙ্কুরিত হল এবং নবপল্লবও দেখা গেল। ডক্টর স্টুয়ার্ডের এই পদ্ধতিকে বলা হল ক্লোনিং—উৎপন্ন দ্রব্যগুলোর নাম দেওয়া হল 'ক্লোন'। যার গ্রীক মানে নবপল্লব, কাটা ডালপালা ইত্যাদি---আধুনিক মানে দেহ-কোষ থেকে উৎপন্ন একগুচ্ছ কোষ বা জীবদেহ।"

"হয়েছে। হয়েছে।" প্রফেসর এবার চেঁচালেন।

ক-৫-য়ের ডংকা বাজল তারও উঁচু পর্দায়--"শুরু সেই ১৯৬০ সালে। তারপর দুজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক—ডক্টর আর ব্রিগ্‌স্‌ এবং ডক্টর টি-জে কিঙ ক্লোনিং নিয়ে পুরোধা স্বরূপ কাজ করলেন। তারপর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ডক্টর জে-বি গার্ডন ক্লোন করলেন আফ্রিকার থাবাওলা একটা ব্যাঙকে।"

"গোল্লায় যাক আফ্রিকার ব্যাঙ!"

"পিলে চমকানো এই এক্সপেরিমেন্টের পরেই সুপ্রসিদ্ধ ক্যাল টেক জীববিজ্ঞানী ডক্টর রবার্ট সিন্সহাইমার ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন ১৯৬৮ সালে —মানুষ-ক্লোন সম্ভব হবে আর মাত্র দশবছরের মধ্যেই। নিউইয়র্কের স্টেট ইউনিভার্সিটির বায়োলজির বিখ্যাত প্রফেসর ডক্টর বেন্টলিগ্লাস কিন্তু ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, সর্বনাশ হবে যে তাহলে! জনপ্রিয় চিত্রতারকা রাজনীতিবিদদের চামড়ার চাহিদা বেড়ে যাবে। তাছাড়া, অত্যাচারী গভর্ণমেন্টরা খেয়াল খুশী মত দুর্ধর্ষ ব্যক্তিদের চামড়া থেকে লাখ লাখ অত্যাচারী মানুষ তৈরী করতে থাকবে। অতএব, সাধু সাবধান! কিন্তু

কেউ তাঁর সাবধান বাণীতে কর্ণপাত করেনি।"

এবার দু'হাত শূন্যে ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রফেসর উন্মাদ নৃত্য শুরু করে দিলেন—"ক-৫! ক-৫! তুমি এবার থামবে কিনা?"

থমকে গেল ক-৫। যান্ত্রিক চোখে কিছুক্ষণ উপভোগ করল বোধহয় বিখ্যাত নাট-বল্টু-চক্র নৃত্য। তারপর বললে গলা নামিয়ে অস্বাভাবিক নিস্তব্দতার মধ্যে—"শুধু একটা খবর বাকী আছে এখনো।"

"আর কোনো খবর আমি শুনতে—"

"সম্প্রতি হলোগ্রাফ-ক্লোনিং সম্ভবপর হয়েছে কিলব্রাকেন টেকনিকের কৃপায়।"

এতক্ষণে উৎকর্ণ হলেন প্রফেসর। সংকুচিত চোখে বললেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ব্যাপারটাই জানতে চাই।" তাঁর চোখমুখের অবস্থা দেখে স্পষ্ট বুঝলাম, একটা অভিনব প্ল্যান এসেছে মাথায়। যে আগন্তুক শক্তি তাঁকে দখল করতে চলেছে, তাকে পরাভূভ করার একটা জবর পরিকল্পনা ঝলসে উঠেছে তাঁর মস্তিষ্কের দিগন্তে। তাই কানখাড়া করে শুনে গেলেন হলোগ্রাফ ক্লোনিংয়ের বিশদ বৃত্তান্ত।

কটর মটর বক্তৃতা থেকে হলোগ্রাফি সম্বন্ধে আমি যা জানলাম, তা এই: ক্যামেরা বা লেন্স ছাড়াই ত্রি-মাত্রিক প্রতিমূর্তি সৃষ্টির নাম হলোগ্রাফি। প্রতিমূর্তিকে তখন কাগজের বুকে চ্যাপ্টা ছবি বলে মনে হয় না—আসল মূর্তির মতই তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধ থাকে।

এর পরেই শুরু হল এই চমকপ্রদ কাহিনীর বিচিত্রতম পর্ব—হলোগ্রাফ প্রফেসরের আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা! এ পর্ব এমনই অত্যদ্ভুত যে ছোট্ট পাঠক পাঠিকারা যেন মনের দিক দিয়ে চমক খাওয়ার জন্যে তৈরী থাকে। আমি গ্যারাণ্টি দিয়ে বলতে পারি, আজ পর্যন্ত এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার অভিযান কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। অদ্ভুত সেই অভিযান পর্ব যাতে অবিশ্বাস্য মনে না হয়, তাই ক্লোনিং সম্পর্কে ক-৫রের দীর্ঘ জ্ঞানদান সংক্ষেপিত না করে উপস্থাপিত করা হল।

এবার শুরু হোক সেই আখ্যান! বিস্ময়কর, রোমাঞ্চকর, এবং… অবিশ্বাস্য!!

১৩ ।। ক্লোন

সূর্যকান্ত মণি যেমন সূর্যের তেজ আকর্ষণ করে, ঠিক তেমনি চিত্তের একাগ্রতা দিয়ে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়, অনেক শক্তি আহরণ করা যায়। তিল মধ্যে বারবার সুগন্ধি পুষ্প নিক্ষেপ করলে যেমন ক্রমশঃ সুগন্ধের আতিশয্য হয়, ঠিক তেমনি বিশুদ্ধ চিত্তে অনেক বিচিত্র গুণের আধিক্য হয়ে থাকে। কিরণজাল যেমন সূর্য থেকে কদাপি অন্তর্হিত হয় না, তেমনি শক্তির বীজ একাগ্রচিত্র উদ্‌যোগী ধীরচিত্ত পণ্ডিতদেরকে কখনো পরিত্যাগ করে না।

এসব তত্ত্বকথা পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ নাট-বল্টু-চক্রের মুখে শুনে শুনে কান পচে গিয়েছিল। অবিশ্বাস্য অভিযানে বেরিয়ে তাঁর প্রতিটি উপদেশ বাক্যের যাথার্থ্য হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম। অজ্ঞাত ভাইরাস স্বীয় শক্তি বীজ বলে কেবলমাত্র ব্রহ্মাণ্ড পর্যটন করেই ক্ষান্ত হয় নি, বিশাল ভূমণ্ডলের সূর্যসম প্রফেসরের মস্তিষ্ক আর মনের সন্ধান ঠিক পেয়েছে এবং তাঁর প্রতিই কেবল আকৃষ্ট হয়েছে। এই শক্তিবীজ বলেই টাইটানে সে ধ্বংসলীলা দেখিয়েছে—চারপাশের শক্তি আকর্ষণ করে নির্ভুল লক্ষ্যে নিক্ষেপ করেছে সাপ্লাই সাট্‌ল্‌ অভিমুখে—ভণ্ডুল করেছে প্রফেসরের মস্তিষ্ক অপারেশন যাতে তার নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়।

সেই মুহূর্তে প্রফেসর তাই এই শক্তির বীজটাকেই অন্বেষণের মনস্থ করেছিলেন—শক্তিকে শক্তি দিয়ে টক্করের ব্যর্থ প্রয়াসে সচেষ্ট হন নি। সূর্যকান্ত মণি স্বরূপ যে শক্তির বীজটি মহাবিশ্বের বিপুল এবং অজ্ঞাত শক্তিকে আকর্ষণ করে প্রলয়ংকর বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে, তাঁর মত মেধাকেও মুঠোয় আনতে পারে—সেই মণিসদৃশ ভাইরাসটিকে খুঁজে বার করতে চেয়েছিলেন অত্যন্ত অভিনব পন্থায়। তাই আশ্রয় নিয়েছিলেন হলোগ্রাফ-ক্লোনিংয়ের।

ক-৫ প্রদত্ত বক্তৃতার তাই শেষাংশটুকু উদ্ধৃত করছি বোঝবার সুবিধের জন্যে।

"হলোগ্রাফ-ক্লোনিং টেকনিক বর্তমানে অত্যন্ত সহজ, কিন্তু নির্ভর যোগ্য নয়।"

"কেন নয়? কেন নয়?" প্রফেসরের অস্থিরতা আবার বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাইরে দুমদাম আওয়াজ শুনলাম। কারা যেন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে

আসছে। চেঁচামেচির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পরে জেনেছিলাম, গ্যালাক্সি রিসার্চ হসপিট্যালের একপ্রান্তে সাপ্লাই সাট্‌ল্‌ গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন ডক্টর। তা সত্ত্বেও খুঁজে বার করেছিলেন। কিন্তু কন্ট্রোল থেকে বিচ্ছুরিত ক্ষণপ্রভ বিদ্যুৎবহ্নি তাঁর এক সহকারীকে স্পর্শ করতেই তিনি উপলব্ধি করেন অ্যাকসিডেন্টটা ঘটিয়েছে প্রফেসরের মস্তিষ্কমধ্যস্থ অজ্ঞাত ভাইরাস—অকারণে যন্ত্র বিকল হয় নি। ঘটিয়েছে এমন সময়ে যখন প্রফেসরের মগজে অপারেশন করার জন্যে তিনি ছুরি হাতে নিয়েছেন। কাজেই ভাইরাসের উদ্দেশ্য অপারেশন ভণ্ডুল করা। এই সারসত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছিলেন আইসোলেসন ওয়ার্ডের দিকে—প্রফেসর যেখানে আত্ম-সম্মোহে আচ্ছন্ন অবস্থায় শুয়ে আছেন বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। তিনি তখনো জানতেন না, দুর্ঘটনার মূল যে আগন্তুক ভাইরাস—তা প্রফেসর তাঁর আগেই আন্দাজ করে নিয়ে ভাইরাস-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন নিজে থেকেই।

হলোগ্রাফ-ক্লোনিং টেকনিক সহজ অথচ অনির্ভর যোগ্য, ক-৫'য়ের এই বিবৃতির ব্যাখ্যা যখন দাবী করলেন প্রফেসর, তখন দরজার ওপারে পেঁছে গেছেন ডক্টর। পায়ের ধুপধাপ আওয়াজ শুনেই তাই অধীর হলেন প্রফেসর। ক-৫ কিন্তু নির্বিকার গলায় বললে ধীরে সুস্থে—"কয়েকটা অতীন্দ্রিয় সমস্যার সমাধান আজও হয়ে ওঠেনি বলে হলোগ্রাফ প্রতিমূর্তিরা নিজেদের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে পারে না।"

"কতক্ষণ পারে না? কতক্ষণ পারে না?"

"দশ মিনিট—দীর্ঘতম অস্তিত্বের সময় এর বেশী আজও সম্ভব হয় নি।"

ঠিক এই সময়ে হুড় মুড় করে ঘরে প্রবেশ করলেন ডক্টর। ক-৫'য়ের শেষের কথাটা তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। তাই ত্রুটি সংশোধন করে দিলেন হাঁপাতে হাঁপাতে—"দশ মিনিট ছাপান্নো সেকেণ্ড।"

সাগ্রহে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর—"মশায়, আমাকে—"

খেঁকিয়ে উঠলেন ডক্টর—"আমার নাম ডক্টর।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," অমায়িক কিন্তু ক্ষিপ্রস্বরে বললেন প্রফেসর—"ডক্‌টর কৈ—"

"কই নয় কো।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ডক্‌টর কোঁ, আমাকে ক্লোন করতে পারেন ?"

স্পষ্টতঃ টলমল করে উঠলেন ডক্‌টর। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের সমাধি দেখেই তাঁর আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেছিল, এখন আবার একী বায়না ?

থতমত খেয়ে বললেন—"ক্লোন করব ? আপনাকে ? কেন ? কি হয়েছে ?"

"বলছি। আগে বলুন, ক্লোন করতে জানেন কিনা।"

ব্যস, আর যায় কোথা ! রেগে টং হলেন ডক্‌টর। এ-যেন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র। কথায় কথায় দপ্‌ করে জ্বলে উঠে উগ্রমূর্তি ধারণ করছেন। আর প্রফেসর যেন বশিষ্ঠ। কঠোর এবং অন্যায় পরীক্ষা করতে বসেছেন বিশ্বামিত্রকে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী বিশ্বামিত্রের তখন ক্ষুব্ধ হওয়ার কথা। ফলে পাছে দুজনেই দুজনকে অভিশাপ দিয়ে বসেন এবং দুজনেই পক্ষীতে পরিণত হয়ে যুদ্ধে রত হন, এই আশংকায় ভীত হয়ে আমি শশব্যস্তে বললাম—"ডক্টর কোঁ, প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রের বিশ্বাস, এই অ্যাকসিডেণ্টের মূলে পাজী ভাইরাসটার হাত আছে।"

মুখ লম্বা হয়ে গেল ডক্টরের—"তাই নাকি ? আমি তো নিজের চোখে তা দেখে এলাম। কণ্ট্রোল থেকে বিদ্যুৎ ছিটকে এসে সাপটে ধরল আমার এক অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে। এতক্ষণে তার অবস্থা নিশ্চয় ওঁর মতই হয়েছে। তাইতো ছুটতে ছুটতে আসছি ! ভাইরাসটা ছড়িয়ে পড়ার আগেই ওঁকে অপারেশন করতে চাই। নিন, শুয়ে পড়ুন।"

হাত তুলে আগুয়ান ডক্টরকে নিরস্ত করলেন প্রফেসর। বললেন বজ্রকণ্ঠে—"পাঁচহাজার তিনশ একুশ সালের বৈজ্ঞানিকদের ব্রেন এত মন্থর, জানা ছিল না। ভাইরাসের কারসাজি দেখবার জন্যে ছুটে যাওয়ার দরকার ছিল না, এখানে বসেই আন্দাজ করা যেত।"

"কী···কী বললেন !" তোৎলা হয়ে গেলেন কোঁ প্রচণ্ড অপমানে।

প্রফেসরকে তখন নিষ্ঠুরতায় পেয়ে বসেছে। সাক্ষাৎ বশিষ্ঠই বটে। এই লাগে সেই লাগে অবস্থা দেখে আমার হল ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। কড়া গলায় ততক্ষণে বলে ফেলেছেন প্রফেসর—"আপনার এলেম বোঝা গেল মশায়, খবরদার বলছি, আমার ব্রেনে ছুরি চালাতে আসবেন না। আমার ব্রেনে আমিই ঢুকবো।"

এবার আমি তো থ হলামই, কোঁ পর্যন্ত আমতা আমতা করে উঠলেন

| "তা-তার মানে ?"

"মানে-ফানে বলবার সময় আমার নেই। উফ ! এমন স্লো সায়ান্টিস্ট আমি লাইফে দেখিনি ! যা জিজ্ঞেস করলাম, আগে তার জবাব দিন। ক্লোন করতে জানেন ?"

শুনেছি, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা নির্মিত বৈবস্বত যমের শত যোজন ব্যাপী মনোহারিণী যমসভায় উগ্রতপাঃ সন্ন্যাসীরাও মহাত্মা যমের উপাসনা করেন। আমার কিন্তু বিশ্বাস যমলোকে হাজির হয়ে প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র যদি উগ্রমূর্তি ধারণ করেন তাহলে স্বয়ং যমও প্রণিপাত হবেন প্রফেসরের চরণতলে—এমনই কীর্তিমান পুরুষ আমাদের এই প্রফেসর। ডক্টর তো কোন্ ছার। তিনি তার ঐ অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখেই যেন নিভে গেলেন। তোৎলাতে তোৎলাতে বলে উঠলেন—"তা-হ্যাঁ···জানি বৈকি।"

"আমাকে করতে পারেন ?" প্রফেসরের গলায় যেন দুন্দুভি বেজে উঠল।

একটু সমলে নিয়েছিলেন ডক্টর। বললেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঈষৎ আত্মম্ভরিতার সঙ্গে—"তা করতে পারি। কিলব্রাকেন টেকনিকটা তো জলের মত সোজা। কিন্তু—"

"কিন্তু আবার কী ?" এক দাবড়ানি দিলেন প্রফেসর।

ডক্টর যেন শুনতেই পেলেন না—অহো ! দাবড়ানি-দাওয়াইয়ের মাহাত্ম্য দেখে বড়ই হৃষ্ট হলাম আমি। রেশ টেনে নিয়ে আবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডক্টর বললেন—"পুরো ব্যাপারটা সার্কাসের খেলার মতন—চিকিৎসকের কাছে মূল্যহীন।"

"সেটা আমি বুঝব। আমাকে ক্লোন করতে পারেন ? এখুনি ?"

"এখুনি ?"

"হ্যাঁ, এখুনি। কারণ জলবৎ তরলম্। এখনি যদি না করেন, ভাইরাস ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে পেয়ে বসবে। আমাকে যদি পুরোপুরি কব্জায় আনে" বলে, একটু থেমে নাটকীয় ঢংয়ে থেমে থেমে শিশির ভাদুড়ী কায়দায় বললেন প্রফেসর—"পুরো ঘাঁটিকে কব্জায় আনতে তার দেরী হবে না।"

ডক্টর যে বিলক্ষণ আঁৎকে উঠলেন, তা তাঁর মুখচ্ছবিতেই সুস্পষ্ট হল। যদিও প্রাণপণ চেষ্টায় সে ভাবটা দমন করার চেষ্টা করে পেছন ফিরে দরজার দিকে একবার তাকালেন। অলপ্পেয়ে বিদ্যুৎ-বাহি আশ্রিত তাঁর

অনুচরটা তেড়ে আসছে কিনা, বোধহয় দেখে নিলেন। তারপর ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘাড় গুঁজে কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে যখন মুখ তুললেন, তখন মুখচোখ দেখে মনে হল যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন।

হঠাৎ হেঁকে উঠলেন কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বরে—"ক-৫! কুলপাংশুল!"

"তথাস্তু, প্রভু!" জবাব দিল ক-৫।

ভুরু কুঁচকে প্রফেসর বললেন—"মানেটা কী?"

"শব্দটা অপ্রচলিত, প্রচলিত মানে হল—অপোগণ্ড।" বিজ্ঞের মত হাসলেন ডক্টর। "এখানে যা মানে করা হল, ও তা জানে।"

"কোড ল্যাংগুয়েজ?"

"হ্যাঁ।"

সংকেত-শব্দটার গূঢ় তাৎপর্য যে কী, তা অকস্মাৎ লক্ষ্য করে রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। ক-৫'য়ের নাকের নিচে চোঙটা আবার বেরিয়ে এসেছে, তাগ করে রয়েছে সটান আমার দিকে!

মতলব কি কোঁ-য়ের?

আমার পাংশু মুখবর্ণ দেখে সহসা অট্টহাস্য করে উঠলেন ডক্টর—"ভয় নেই! ভয় নেই! ক-৫ তৈরী হচ্ছে আসন্ন সংগ্রামের জন্যে। বলা যায় না কি বিপদ এগিয়ে আসছে এদিকে। তাই এই প্রস্তুতি পর্ব। ঠিক আছে ক-৫, এবার রওনা হও।"

চোঙ ঘুরে গেল আমার দিক থেকে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল, যেন আমার। কুকুর জাতটাকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না, তার ওপরে যন্ত্র-কুকুর।

সারমেয়-ট্যাংকের মত ব্র্যাস্টার উঁচিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল ক-৫।

ঠিক সেই সময়ে একটা হট্টগোল শুনলাম বাইরের করিডরে।

ডক্‌টরের আশংকা অমূলক নয়।

বিদ্যুৎ-য়ের আর এক নাম ক্ষণপ্রভা অর্থাৎ ক্ষণিকের প্রভা। কিন্তু অদৃশ্য আগন্তুক নিক্ষিপ্ত এই বিদ্যুৎ বহ্নি উদ্ভাসিত হয়েই অদৃশ্য হয় না, লকলকিয়ে লেপটে থাকে মানুষের মাথা এবং দেহ ঘিরে। রূপান্তর ঘটে তার পরেই। ভেতর দখল করে নেয় অদৃশ্য ভাইরাস—দাসানুদাস যন্ত্রবৎ সে তখন হুকুম তামিল করে।

এ কাণ্ড এর আগেও ঘটেছে। বাহ্যিক রূপ পাল্টায়নি—মন আর মস্তিষ্ক দখল করে একটার পর একটা নারকীয় কাণ্ড-কারখানার সৃষ্টি করে গেছে বজ্জাত ভাইরাস। কিন্তু তার পরবর্তী পরিবর্তনটুকু দেখবার সুযোগ দেন নি—ভাইরাস মাথা চাড়া দিচ্ছে টের পেয়েই সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছেন স্বইচ্ছায়। ভাইরাস মহাশয় তার পরবর্তী খেলটুকু তাঁর শরীরে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ পায়নি।

ম্যা আর নার্স ভাইরাসের কব্জায় গিয়েই নিহত হয়েছে ক-৫য়ের ব্ল্যাস্টার নিক্ষেপে—দুজনেই কবন্ধে পরিণত হয়েছে শূন্যে। কাজেই এই দুজনের ক্ষেত্রেও তাদের মুখের বাহ্যিক কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি।

সাপ্লাই সাটল্-য়ের ক্রু আর ক্যাপ্টেন গোলাম বনে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে প্রলয়ংকর সংঘর্ষে। তাদের ক্ষেত্রেও এই অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি।

লক্ষ্য করা গেল ঠিক তারপরেই। কন্ট্রোল কমপিউটর থেকে বিদ্যুৎ শিখা লম্ফ দিয়ে বেড় দিয়েছিল ডক্টরের অনুচরকে। সভয়ে সেই দৃশ্য দেখেই চম্পট দিয়েছিলেন তিনি—যদি না দিতেন, তাহলে যে অদ্ভুত দৃশ্যটি স্বচক্ষে দেখতে পেতেন, তা এই ঃ

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল বিমূঢ় অনুচর। নাম তার মু। ক্ষণকাল পরেই স্তিমিত হল বিদ্যুতের তেজ। অমনি নিষ্প্রাণ কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হল প্রভু-বন্দনা—"গোলাম হাজির, হুকুম করুন।"

সচমকে দাঁড়িয়ে গেল পেছনে আরও কয়েকজন অনুচর। এ আবার কী? মু তো এভাবে কখনো কথা বলে না!

কন্ট্রোল-কমপিউটর বললে হেঁড়ে গলায় সজীব প্রাণীর মত—"আমার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রের ওপর অপারেশন বন্ধ করো। ডক্টরকে আমার সামনে এনে দাও। আর, গোলাম সংখ্যা আরো বাড়াও। এই ঘাঁটি দখল করো। এখান থেকেই শুরু করব আমি ব্রহ্মাণ্ড বিজয়ের অভিযান।"

যন্ত্র চালিতের মত ঘুরে দাঁড়াল মু। অর্ধচন্দ্রাকারে সামনে দাঁড়িয়ে সঙ্গীরা। হত চকিত প্রত্যেকেই। অদৃশ্য ভাইরাসের বৃত্তান্ত তারা জানত না। তাই সাবধান হওয়ার প্রয়োজনীয়তা মাথায় আসেনি। যারা উপস্থিত

বুদ্ধি খাটিয়ে লম্বা দেওয়ার কথা ভাবছিল, তারা সে সুযোগও পেল না।

আচম্বিতে মু-য়ের মড়ার মত প্রাণহীন চোখ দুটো প্রদীপ্ত হল। নীলাভ-কালচে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হল চক্ষু-প্রত্যঙ্গ থেকে। একই সঙ্গে কপাল ফুঁড়ে ধেয়ে এল বিদ্যুৎ-শিখা। চক্ষের পলক ফেলবার আগেই বহুমুখ ভুজঙ্গের মতই তা দংশন করল উপস্থিত প্রত্যেককে। সাপের জিভ যেন জড়িয়ে ধরল সবাইকেই।

ব্যস, নড়বার ক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পেল প্রত্যেকের। একটু পরেই বললে সমস্বরে—"গোলাম হাজির, হুকুম চাই।"

হুকুম দিল মু—"ব্ল্যাস্টার হাতে নাও। প্রভু বিপন্ন। দখল করো এই ঘাঁটি। ব্রহ্মাণ্ড বিজয় হবে এখান থেকেই। চলো যাই আইসোলেসন ওয়ার্ডে।"

নিঃশব্দে ব্ল্যাস্টার হাতে নিল সবাই। কুচকাওয়াজ করে বেরিয়ে এল অলিন্দ পথে।

তাড়া লাগাল মু—"দৌড়োও। সময় খুব কম। আগে চাই ডক্‌টরকে।"

দৌড়োলেন সবাই। পরিবর্তনটা এল দৌড়োনোর সময়ে। খুব দ্রুত। ভাইরাসের শক্তিবৃদ্ধি পাচ্ছে উত্তরোত্তর। এবার তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল উত্তপ্ত শরীরে।

প্রথম পরিবর্তনটা দেখা গেল মু-য়ের মুখে। ভুরু দুটো শতপদী তেঁতুলে বিছের মত মোটা হয়ে গেল আস্তে আস্তে। লালচে লোমে ছেয়ে গেল সারা মুখ।

অমানুষিক পরিবর্তনটা এরপরেই এল অন্যান্যের মুখে।

ভাইরাস ফুটে বেরোচ্ছে এখন প্রত্যেকের মুখে। লোমশমুখ জ্বলন্ত-চক্ষু একদল দানব ধেয়ে এল আইসোলেশন ওয়ার্ডের দিকে। মস্তিষ্কে বাজছে ভাইরাসের রণডঙ্কা।

উঁকি মেরে এই দৃশ্যই দেখলাম আমি।

ঠিক সময়েই করিডরে বেরিয়ে গিয়েছিল ক-৫। হানাদাররা ব্ল্যাস্টার উঁচিয়ে হৈ-হৈ করে তেড়ে আসতেই চলমান সারমেয়-ট্যাঙ্কের নাসিকা নিম্নস্থ ব্ল্যাস্টার থেকে নির্গত হল তেজঃপুঞ্জ। ধাবমান দানবরা নিশ্চিত ছিল এ

যুদ্ধে তারা জিতবেই, ঘাঁটি দখল করবেই। তাই অতটা খেয়াল করেনি। ক-৫য়ের ব্ল্যাস্টার বর্ষণে তাই প্রথমেই কুপোকাৎ হল মুয়ের আগে আগে যে দৌড়োচ্ছিল সে। পুরোদলটা তাই দেখে থমকে যেতেই ব্ল্যাস্টার নিক্ষেপ করল মু। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই আর দাঁড়ালো না। পিঠটান দিল কালান্তক যমের মত ক-৫য়ের সামনে থেকে। মোড় ঘুরে দাঁড়িয়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে মু—"এদিক দিয়ে তো যাওয়া যাবে না। ভিসি-ফোন দরকার।"

চক্ষু-উপদেষ্টা চৌ বললে—"আমার অফিসে চলো।"

সদলবলে মু ছুটলো সেইদিকে।

ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। লোমশমুখ জ্বলন্তচক্ষু মানুষ-দানবদের দেখে তখনো আমার হৃৎকম্প হচ্ছে। বিকটাকার প্রাণীগুলোর ভয়াল মুখচ্ছবি অবশ করে এনেছে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ভাগ্যিস ক-৫ রুখে দাঁড়িয়েছিল, আমার ক্ষমতা ছিল না ঐ বিভীষণদের ঠেকানো।

টেলিফোন 'বুথ' বাক্সের মত একটা যন্ত্র ঠিকঠাক করছিলেন ডক্টর এবং নার্স। চার পাশ অর্ধস্বচ্ছ প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ দিয়ে মোড়া। পাশে একটা ক্ষুদে কণ্ট্রোল প্যানেল।

"তাড়াতাড়ি, কৌ তাড়াতাড়ি!" অস্থিরপঞ্চানন প্রফেসর প্রায় নৃত্য করতে লাগলেন বিষম উৎকণ্ঠায়। সময় যে ফুরিয়ে এল! কাহিল হয়ে পড়ছেন অতি দ্রুত। শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে ভাইরাসের। প্রভুত্ব কায়েমী করার জন্যে মাথা চাড়া দিচ্ছে ভেতর থেকে। প্রফেসর আর পারছেন না। তাই এই উত্তেজনা, এত অস্থিরতা।

সার্কিট-কানেকশনগুলো ঠিক ঠাক আছে কিনা দেখে নিলেন ডক্টর। ইন্সট্রুমেন্ট ট্রে বাড়িয়ে ধরল নার্স। একটা স্ক্যালপেল তুলে নিলেন ডক্টর। প্রফেসরের চামড়া থেকে কেটে তুলে নিলেন সামান্য একটু স্যাম্পেল।

বললেন ধীর স্থির কন্ঠে—"প্রফেসর, একটা ব্যাপার কিন্তু খেয়াল রাখবেন। ক্লোন বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু হবে না। যা হবে তার মূল উপাদান কার্বন। ছাপা ছবি বলতে পারেন। ত্রিমাত্রিক ফটোগ্রাফ—ছবির মত দ্বিমাত্রিক নয়। কিন্তু জীবন্ত—তবে ক্ষণস্থায়ী।"

প্রফেসরের অবস্থা তৎক্ষণে রীতিমত কাহিল। চিঁ-চিঁ করে বললেন—

"দীননাথকে দরকার…দীননাথ…দীননাথ।" "ব্যস ওর বেশী আর কথা ফুটল না মুখে। জ্ঞান হারালেন!

একটু আগেই করিডরে দেখা দৃশ্যটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। বিংশ শতাব্দীর পুতুল-নাচের দৃশ্য মনে পড়ে গেল। পাপেট থিয়েটার একটা অতি প্রাচীন শিল্পকলা : হাজার হাজার বছর আগে তার শুরু। খুব সম্ভব ভারতবর্ষ বা চীনদেশে অথবা প্রাচ্যের কোথাও তার প্রথম জয়যাত্রা শুরু হয়, সঠিক কেউ জানে না। কেউ বলেন বুজরুক পুরুৎঠাকুররা আড়াল থেকে বিগ্রহ-পুতুল নাচিয়ে ভক্তদের বিহ্বল করে তুলত। সেই থেকে পুতুল নাচের উৎপত্তি। বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের বৃহত্তম পাপেট কোম্পানী ছিল মস্কোতে। দু-শ অনুচর নিয়ে ও ব্রাসজোভ নামক পুতুল-নাচিয়ে ছোট বড় সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নাচাতেন রড-পাপেট। পাঁচহাজার তিনশ একুশ সালের টাইটানে আমি যা দেখছি, তা যেন গ্লোভ-পাপেট! অথবা দস্তানা-পুতুল। অথবা হাত পুতুল। মানুষ তো নয়—যেন দস্তানা—নক্সার ভাইরাসটা ঠিক সেই ভাবেই খেলাচ্ছে দস্তানার মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে পুতুল নাচানোর মতই বিটলে ভাইরাস নিজের সত্তা মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নাচিয়ে চলেছে তাদের। নিজে ঢুকে বসে রয়েছে আর একটা মানুষের মধ্যে—ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

ভাবতে ভাবতেই রোমাঞ্চ দেখা দিল সর্বাঙ্গে। ভাঙা গলায় বললাম—"একটা ব্ল্যাস্টার দিতে পারেন?"

গম্ভীর মুখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন ডক্টর। মুখ দেখে যেন মনের ভাব টের পেলেন। কোনো কথা জিজ্ঞেস করলেন না। জোব্বার ভেতর থেকে খুব ছোট্ট একটা অবিকল খেলনার মতই ব্ল্যাস্টার বার করে আমা.. হাতে তুলে দিলেন।

জিনিসটা উল্টে পাল্টে দেখে নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম—"আমাকে প্রফেসরের দরকার কেন বলতে পারেন?"

"খুব সম্ভব প্রতিষেধ ব্যবস্থাটা আপনার মধ্যে সম্পূর্ণ বলে। আমার তো মনে হয় আপনাকেও ক্লোন করতে চান উনি।"

বলেই, স্ক্যালপেল নিয়ে আমার হাতের দিকে হাত বাড়ালেন কো। আমি জিজ্ঞেস করলাম—"কিন্তু আসল 'আমি'টার—কি হবে?"

"কিচ্ছু হবে না," অভয় দিলেন ডক্টর।

"ক্লোন কিন্তু ক্ষণস্থায়ী, একটু আগেই বললেন আপনি।"

চামড়ার নমুনা বিশেষ ধরনের ক্লোনিং ডিশে স্থাপন করলেন ডক্টর। প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর সলিউশন ঢাললেন তার ওপর। মুখের কিন্তু বিরাম রইল না —"তত্ত্বগতভাবে স্থায়ী ক্লোন বা নকল অসম্ভব। বহু-বছর লাগবে তা সম্ভব করতে—কারণ, এক্সপেরিমেণ্ট নিয়মিত ভাবে হয়নি —মাঝে মাঝে শিকেয় তুলে রাখা হয়েছিল দানব সৃষ্টির ভয়ে।" বলতে বলতে পাত্রগুলো টেলিফোন বুথের মত যন্ত্রটার দিকে নিয়ে গেলেন। "আপাততঃ এইভাবেই আমরা কোনমতে বংশগতি আর অভিজ্ঞতাকে চালান করি মূল দেহ থেকে ক্লোন দেহে—কিন্তু চালান হয় অস্থায়ী।

"মানেটা বুঝলাম না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কৌ। আমার মস্তিষ্ক নিয়ে কিন্তু আর কটাক্ষ করলেন না।

বললেন—"মানেটা এই—আপনার ফটো-কপি যমজ খুব জোর দশ থেকে এগারো মিনিট বাঁচবে, তারপর ভেঙেচুরে অদৃশ্য হয়ে যাবে।"

সম্ভাবনাটা খুব সুখের মনে হল না। নিজেকে ভেঙেচুরে বিলীন হয়ে যেতে দেখাটা খুব কি প্রীতিপ্রদ ব্যাপার? বিনীতভাবে বললাম—"তাহলে অত ঝঞ্ঝাটে যেতে চাই না। আমি বরং ক-৫ য়ের সঙ্গেই থাকি—আপনার কাজে আসতেও তো পারি।"

অসহিষ্ণু হলেন ডক্টর। বললেন—"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" প্রথম ক্লোনিং ডিশটা বয়ে নিয়ে গেলেন টেলিফোন বক্সের মত 'বুথ'য়ের দিকে, রাখলেন ভেতরে। ইঙ্গিত করলেন নার্সকে। টিপে দেওয়া হল সুইচ। গুম গুম আওয়াজ শুনলাম 'বুথ'য়ের ভেতরে। আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল বীপ্-বীপ্ শব্দ। চোখ ধাঁধানো আলোয় ভেসে গেল 'বুথ'টা। তীব্র দ্যুতির মধ্যে ভেতরে আকার গ্রহণ করতে লাগল একটা মনুষ্যমূর্তি...

ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে লাগল মূর্তিটা। নিরেট হয়ে উঠল বাষ্পাকার আকৃতি। সেকেণ্ড কয়েক পরেই 'বুথ' থেকে দীর্ঘ পদক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হলেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র। দ্বিতীয় মূর্তিটা হুবহু শয্যায় শায়িত প্রথম মূর্তির মতই—মায় জামাকাপড় পর্যন্ত। বাহাদুরি আছে বটে কিলব্রাকেন কলা কৌশলের। নয়া প্রফেসর মাথা হেলিয়ে সংক্ষিপ্ত অভিবাদন জানালেন ডক্টরকে এবং অগ্রসর হলেন দরজা অভিমুখে।

"চললেন কোথায় ?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধোলেন ডক্টর।

ঘুরে দাঁড়ালেন নয়া প্রফেসর—"ডক্টর, বিশ্বাস রাখুন আমার ওপর—ভরসা রাখুন—ঠকবেন না।" বলেই উধাও হলেন করিডরে।

প্রফেসরের প্রতি পদক্ষেপে আত্ম-প্রত্যয়। চোখ মুখ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। লোকটাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। একটা কঠিন সংকল্প যে ওঁর অণুপরমাণুতে জাঁকিয়ে বসেছে তা আঁচ করেই বাধা দিলাম না। এই মহা বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় এখন তিনিই কেবল উদ্ভাবন করতে পারেন, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু ডক্‌টর সংশয়াচ্ছন্ন কণ্ঠে বললেন—"কি জানি কি ঝামেলা সৃষ্টি করতে চললেন প্রফেসর। থাক গে, নার্স, এবার দীননাথবাবুকে ক্লোন করা যাক।"

প্রফেসরের যমজকে দেখে আমারও তখন ইচ্ছে হয়েছিল ক্লোন হবার। তাই আর আপত্তি করলাম না। আর যাই হোক, দানব হয়ে তো যাব না।

ডক্‌টর দ্বিতীয় ক্লোনিং ডিশটা তুলে নিলেন। বুথের ভেতরে রাখলেন।

সুইচ টিপতে যাচ্ছেন ডক্‌টর, এমন সময়ে আবার ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর। হুবহু সেই প্রফেসর। কে বলবে কার্বন-কপি। যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।

"ডক্‌টর।"

"আবার কি হল ?"

"একটা প্রশ্ন।"

"করে ফেলুন।"

"আমার টাইম মেশিনটা কোথায় ?"

অদ্ভুত চোখে তাকালেন ডক্টর—"টাইম মেশিনে কি দরকার ?"

"দরকার আছে। কোন জায়গায় আছে বলুন, নিজেই যাচ্ছি।"

ডক্টর আর কথা বাড়ালেন না। বলে দিলেন, কোন অঞ্চলে পড়ে রয়েছে টাইম মেশিন। বেশদূরে নয়—দুটো ঘর পরেই। তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে শুনলেন প্রফেসর। নিরুত্তরে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

এদিকে অন্য কাণ্ড চলছিল কনসালট্যাণ্টের ঘরে। চক্ষু-উপদেষ্টা চৌ

সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ঢুকতেই তার ছাত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। লোমশ মুখ জ্বলন্ত চক্ষু নরাকার দানবদের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বললে—"একী! এ অবস্থা হল কি করে?"

আর কি করে! অত ব্যাখ্যা শোনাবার সময় কোথা! চৌ বললে সংক্ষেপে—"তাকাও আমার দিকে।"

ফ্যাকাশে হয়ে গেল ছাত্রটি। উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। নরাকার প্রাণীগুলো ঘিরে ধরল তাকে। চৌ-য়ের কপাল থেকে হিস্‌হিস্‌ করে বেরিয়ে এল বিদ্যুৎ-বহ্নি। স্পর্শ করল ছাত্রর ললাটদেশ……

ততক্ষণে আমার কার্বন-কপি তৈরী হয়ে গেছে বুথের মধ্যে। অর্ধ-স্বচ্ছ আধারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম আমার ক্লোন-সত্তাকে। ডক্টর বুথ থেকে তাকে বার করতে যাচ্ছে, এমন সময়ে বিষম আতংকে চিলের মত চেঁচিয়ে উঠল নার্স মেয়েটা—"ডক্টর!"

"কি হল?" চমকে হাত নামালেন ডক্টর।

"প্রফেসরকে দেখুন।"

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন ডক্‌টর। আমিও। দেখলাম সেই অসম্ভব দৃশ্য। ক্লোন সৃষ্টি নিয়ে তন্ময় থাকার ফলে আসল প্রফেসরের দিকে তাকানোর সময় পাইনি এতক্ষণ। সেই ফাঁকে ভয়াবহ দ্রুত বেগে তাঁর শরীর দখল করেছে শয়তান ভাইরাস। করিডরে যে দানবদের দেখে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছিল, হুবহু সেই জাতীয় একটা বিকটাকার দানবে পরিণত হয়েছেন আমার প্রাণপ্রিয় প্রফেসর। পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরো শরীরটা গামছা নিংড়োনোর মত মুচড়ে মুচড়ে যাচ্ছে, বিকৃত বীভৎস হয়ে উঠছে। তারের মত শক্ত ধাতব লোমে হাত আর মুখ ঢেকে যাচ্ছে। চোখের সামনেই একটা বিকট ভয়াবহ অজ্ঞাত পশুর রূপ নিচ্ছেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র। সমস্ত শরীরটা এমন প্রচণ্ড শক্তিতে থর থর করে কাঁপছে, মড়মড় মটাস করে মোচড় দিচ্ছে, গামছা নিংড়োনোর মত মুচড়ে উঠে ধনুষ্টংকার রুগীর মত তেউড়ে বেঁকে আছড়ে পড়ছে যে ভয় হল, শিরদাঁড়া না ভেঙে যায়, হাত-পা জয়েণ্ট থেকে খুলে না বেরিয়ে আসে।

ক্ষিপ্তের মত তাই চিৎকার করে বললাম—"ডক্‌টর! ডক্‌টর! বেঁধে ফেলুন! বেঁধে ফেলুন প্রফেসরকে!"

চৈনিক পুতুলের মত বিস্ফারিত চোখে প্রফেসরের লোমহর্ষক রূপান্তর

দৃশ্য দেখছিলেন কো। চোয়াল ঝুলে পড়েছিল, কথা বলার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছিল। ভাইরাস যে এত দ্রুত শরীরে তার লক্ষণ ফুটিয়ে তুলতে পারে, এ অভিজ্ঞতা তাঁর এই প্রথম।

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। লাফিয়ে গিয়ে ড্কটরের কলার চেপে ধরে রাম-ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম কানের কাছে কানাডিয়ান স্টীম ইঞ্জিনের মত তীব্র গলায়—"হাঁ করে দেখছেন কী? দড়ি দিন—দড়ি! বেঁধে ফেলি প্রফেসরকে!"

সম্বিৎ ফিরে পেলেন ডক্টর। স্খলিত কণ্ঠে বললেন—"দড়ি! দড়ি তো নেই! সে বিংশশতাব্দীর জিনিস!"

"তবে কি আছে? বাঁধবার জিনিস কি আছে?"

নার্সের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখলাম ডক্টরের চাইতেও বেশী। আতংকে কাঠ হয়ে যায় নি। উপস্থিত বুদ্ধি হারায়নি। দৌড়ে গেল দেওয়ালের কাছে। লকার খুলে একতাল ভারী প্লাস্টিক ফিতে নিয়ে ফিরে এল—"এই নিন।"

ডক্টর ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। একযোগে আমি, তিনি আর নার্স দোমড়ানো মোচড়ানো পাক সাট খাওয়া মূর্তিটাকে বাঁধতে লাগলাম খাটের সঙ্গে।

লড়াই শুরু হয়ে গেল বলা যায়। কাল ঘাম ছুটে গেল হাড় জির-জিরে প্রফেসরকে সামলাতে গিয়ে। দানবের শক্তি যেন ভর করেছে তাঁর হাতে-পায়ে। কিন্তু তিনজনের সঙ্গে তিনি পারবেন কেন। বিশেষ করে আমি তখন নিষ্ঠুর হয়ে গেছি! যে প্রফেসরের চরণস্পর্শ করে ধন্য হয়ে যাই, তাঁরই দেহটাকে পিছমোড়া করে বাঁধতে লাগলাম নির্মম কশাইয়ের মত—এতটুকু মায়া দয়া দেখলাম না।

প্রফেসর এতক্ষণ ধস্তাধস্তিই করছিলেন, কথা বলেন নি। বাঁধা যখন প্রায় সাঙ্গ, তখন ঘরঘরে আওয়াজে ভয়াল যে শব্দগুলো জাগ্রত হল তাঁর কণ্ঠস্বরে, হলফ করে বলতে পারি, তা তাঁর কথা নয়। তাঁর রক্তে এমন স্বর, এমন শব্দ কখনো সম্ভব নয়। যেন দম আটকে আসছে, খাবি খাচ্ছেন নিঃশ্বাসের অভাবে, যেন জলে ডুবে যাচ্ছেন অসহায় ভাবে—এমনি আর্ত ভাঙ্গা স্বরে বলল সেই কণ্ঠস্বর—"ছেড়ে দাও এই দেহটা···তোমরা কেউ টিঁকবে না···কেউ পারবে না আমাকে ধরে রাখতে। আমি এই অখণ্ড

প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র শক্তি যার বিনাশ নেই। যার লয় নেই, যার সমকক্ষ শক্তি আর নেই। লক্ষ্যে পেঁছেতে দাও আমাকে! বহুযুগের ওপার হতে আমি এসেছি, আমার উদ্দেশ্য সাধন করতে! অমৃত পান না করেও আমি অমর, সূর্যের মতই আমি মহাবল, মহাঘোর, মহাপ্রলয়! আমায় বেঁধো না—ছেড়ে দাও। নিয়তি আমায় যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, যেতে দাও সেই লক্ষ্যে! মহামূর্খের দল, খুলে দাও বাঁধন! আমি সর্বভক্ষ, রবিকিরণ সংস্পর্শে যেমন সমস্ত বস্তু শুচি হয়, তেমনি আমার শিখায় তোমরা শুচি হবে। আমিই হুতাশন, আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ তেজঃ পদার্থ! আমি নিজের প্রভাবেই বিনির্গত হয়েছি, আমিই ত্রিলোকেশ হুতাবহ! আমিই সর্বলোকের ঈশ্বর, সর্বজীবের গতিস্বরূপ। আমি সর্বদাই পবিত্র—আমার শিখা পবিত্র করবে তোমাদেরও! আমি অবধ্য, আমি বজ্রজ্যোতি, আমি পরমগতি, আমি অক্ষয় অমৃত, আমি পরমপূজিত! মায়াজালে কৃতান্তকে যেমন বেঁধে রাখা যায় না, আমাকেও তেমনি আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। আমি এসেছি যখন, বহু কলেবরে আমি প্রকাশিত হবই। নিরেট গাধার দল, ছেড়ে দাও আমাকে!''

মহাভারতে বেদব্যাস গ্রন্থগ্রন্থি স্বরূপ কূটশ্লোক রচনা করেছিলেন বিঘ্ন-নাশক গণেশকে জব্দ করার জন্যে। ভাইরাস ব্যাটাচ্ছেলের খটমট-ভয়াল বক্তৃতা শুনে আমার অবস্থা হয়েছিল গণেশ বেচারার মত। কিছু বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু শেষের কথাটা শুনেই হাড়পিত্তি জ্বলে গেল, কেন না সেটা বাচ্চাছেলেও বুঝতে পারে।

"কাকে গাধা বলছিস্ রে হারামজাদা!" রাগে উন্মাদ হয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম আমি।

অবিচলিত কণ্ঠে নার্স এই সময়ে বলে উঠল—"ডক্টর, ঘুমের ইঞ্জেকশন দেব?"

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তখন প্লাস্টিক বেল্টের সর্বশেষ বাক্‌ল্ আঁটছেন ডক্‌টর। কথার জবাব দিলেন না। হ্যাঁচকা টানে বাঁধন শেষ করে বললেন—"না, না, এখন নয়।"

"সংক্রমণের বিপদ রয়েছে কিন্তু।"

"মোটেই না। এই অবস্থায় এ রোগের সংক্রমণের সম্ভাবনা যদি থাকত, তাহলে আমরা কেউ টিঁকতাম না। ভাইরাসের শক্তির সঙ্গে এখনো সমানে

লড়ে যাচ্ছে প্রফেসরের আত্ম-সম্মোহ—তা না হ'লে—"

প্রফেসর তখনো তেউড়ে যাচ্ছেন। সেদিকে তাকিয়ে থেকে নার্স বললে—"ভাইরাসের যদি নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা থাকে, তাহলে প্রফেসরকে দখল করেছে নিশ্চয় বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।"

"তা ঠিক। প্রফেসরের বুদ্ধিমত্তারও তো নাগাল ধরা মুস্কিল দেখছি। ঠিক আধারই খুঁজে বার করেছে ভাইরাস। এখন টক্কর লেগেছে সেয়ানে সেয়ানে," শেষ কথাটা যেন একটু তৃপ্তির আমেজ নিয়েই বললেন ডক্টর। প্রফেসরের দুরবস্থা দেখে যেন মনে মনে খুশী হয়েছেন। বৈজ্ঞানিকরা বড্ড ঈর্ষাপরায়ণ হয়। একটা ধীশক্তি আর একটা ধীশক্তিকে দেখতে পারে না। জব্দ হলে মজা পায়। পাঁচ হাজার তিনশ একুশ সালের টাইটানেও নেই তার ব্যতিক্রম। তোবা! তোবা!

চমক ভাঙ্গল রক্তজমানো অমানুষিক কণ্ঠস্বরে—"আমার লক্ষ্য—আমার উদ্দেশ্য···বাধা দিও না···দেরী করিয়ে দিও না···ঘাঁটি প্রস্তুত···চাক বাঁধার সময় এবার হয়েছে···আমি সর্বভূত ভয়ংকর অতিভীষণ দুঃসহ মায়া.ী···আমি কোপাবিষ্ট হলে তোমাদের রক্ষা নাই······।"

পাপিষ্ঠ ভাইরাস যখন লম্বা লম্বা বোলচালে গগন মাৎ করে চলেছে, ঠিক সেই সময়ে টাইম মেশিন থেকে নেমে এলেন প্রফেসর। প্রফেসর মানে তাঁর কার্বন-কপি। হাতে একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র। যন্ত্রটাকে বুকের কাছে আগলে ধরে হেঁট হয়ে ছুটলেন করিডর বেয়ে।

দপ করে আলো জ্বলে উঠল আইসোলেশন ওয়ার্ডের ভিসিফোনে। স্ক্রীনে দেখা গেল মু-য়ের মূর্তি। লালচে কর্কশ লোমে মুখ প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। অঙ্গারের মত নীলচে চোখ দুটো জ্বলছে কোটরের মধ্যে। বাচ্চা কেউটের মত কিলবিল করছে জোড়া ভুরু। বীভৎস! সত্যিই বীভৎস! মানুষ বলে আর চেনাই যায় না—প্রফেসরের অবস্থাও প্রায় তাই।

"ডক্টর," কর্কশ কণ্ঠের নিনাদ শোনা গেল স্পীকারে। "ডক্টর, শ্রবণ করুন।"

ওরে বাবা! ভাইরাস সংক্রমণের মহিমা তো কম নয়! ইনিও বেশ সাধু ভাষা ছাড়ছেন!

ভ্রূকুটি করে ভীষণ কণ্ঠে মু বললে—"ডক্টর, কথা কানে যাচ্ছে ?"

"যাচ্ছে," প্রফেসরের আছাড়ি পিছাড়ি শরীরটাকে প্রাণপণে চেপে ধরে রেখে রুদ্ধশ্বাসে বললেন ডক্‌টর।

"প্রফেসরকে এখুনি মুক্তি দিন—এ-খু-নি !"

"ক-ক-খো-নো না !" সমান তেজে জবাব দিলেন ডক্‌টর।

"হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি…এ ঘাঁটি এখন আমাদের দখলে। অ্যাটমিক জেনারেটর টেকনিশিয়ানরাও এতক্ষণে আমাদের দলে চলে এসেছে। যা বলছি, যদি তা না করেন—"

"তবে কি করবি রে উল্লুক !" ডক্‌টরের অশিষ্ট বাক্যের জন্যে পাঠক পাঠিকারা যেন তাঁকে ক্ষমা করেন।

"তাহলে এই হসপিট্যাল আমরা ধ্বংস করে দেবো।"

"যা…যা…," সেকি তেরিয়া মেজাজ ডক্‌টরের। গোয়াবাগানের গুণ্ডাদেরও এমনি তড়পানি দেখিনি !

ভারী যন্ত্রটা কোলে করে এই রকম একটা নাটকীয় মুহূর্তে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন প্রফেসরের কার্বন-কপি। দেখেই চিনলাম। টাইম মেশিনের কণ্ট্রোল প্যানেলে লাগানো ছিল। সেখান থেকেই খুলে এনেছেন।

ভিসিফোনে তখনো লম্ফঝম্প করছে মো—"পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। ঠিক করুন কি করবেন ! হয় প্রফেসরকে দিন আমাদের হাতে—নইলে এই হসপিট্যাল শূন্যে উড়ে যাবে।" বলার সঙ্গে 'সঙ্গে ফুস্ করে নিভে গেল ভিসিফোনের আলো, অন্ধকার হল পর্দা।

কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাত না করে কোলকুঁজো নাম্বার টু প্রফেসর দৌড়ে গেলেন ক্লোনিং বুথের দিকে—বুকের কাছে সেই যন্ত্র।

পেছন নিলেন ডক্‌টর—"কি ব্যাপার বলুন তো আপনার ? শুনলেন তা ? পাঁচ মিনিট মোটে সময়।"

"ঘাবড়াইয়ে মাৎ।"

"মানে ?"

বুঝলাম, হিন্দীর মৃত্যু ঘটেছে পাঁচহাজার তিনশ একুশ সালে।

বুঝলেন প্রফেসরের কার্বন-কপিও। তর্জমা করে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে—

"ভয় পাবেন না। এতেও যদি কাজ না হয়, হসপিট্যাল ধূলিসাৎ হবে এমনিতেই!"

"কিন্তু মতলবটা কি আপনার?" বিদঘুটে মেশিনটার দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে থেকে বললেন ডক্টর। এরকম যন্ত্র বোধহয় জীবনে এই প্রথম দেখলেন!

বুঝিয়ে দিলেন প্রফেসর—"এক ডাইমেনশন থেকে আরেক ডাইমেনশনে যাওয়ার এই যে যন্ত্র দেখছেন, এটা আমার টাইম মেশিনের ইমপরট্যাণ্ট পার্ট্‌স্‌।"

"কি কাজ এর?"

"এক ডাইমেনশন থেকে আরেক ডাইমেনশনে যাওয়ার বাধা ভেঙে দেয়।"

কৌ-য়ের শূন্য চাহনি দেখে বুঝলাম, মগজে কিছু ঢোকেনি।

প্রফেসর তখন আরও প্রাঞ্জল করলেন—"ভারী সোজা থিওরী। পরে আলোচনা করব। এখন শুধু এই টুকুই শুনে রাখুন, ইচ্ছে মত আমি আমার সাইজ বড় করতে পারি! ছোটও করতে পারি।" বলে, বুথের দরজা খুলতেই মুখোমুখি হলেন রাগত মুখ আমার কার্বন-কপির সঙ্গে।

তেড়ে উঠল আমার কার্বন-কপি—"এত দেরী কেন? কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকব?" বাস্‌ রে! কার্বন কপি তো দেখছি আমার ওপরে যায়!

"বেশীক্ষণ নয়," কথা বলতে বলতেই প্রফেসরের কার্বন-কপি ইলেকট্রনিক যন্ত্রটা নামিয়ে রাখলেন বুথের ভেতর। এটা-ওটা টিপে যন্ত্র চালু করতে করতে বললেন—"ডক্টর, কান খাড়া করে এবার শুনুন। মেশিন আমিই চালাবো। সেট করলাম এমনভাবে যাতে আমি ছোট্ট হতে হতে অণু-মাত্রা, মানে, মাইক্রো-ডাইমেনশনে পেঁছে যাবো। দীননাথও আমার সঙ্গে ছোট হয়ে যাবে। আপনার তখন কাজ হবে, আমাদের দুজনকে চেঁচে তুলে নিয়ে ইঞ্জেকশন করে ঢুকিয়ে দেওয়া।"

"কার মধ্যে?" সত্যিসত্যিই ডক্টর-য়ের কান দুটো খাড়া হয়ে গেল মনে হল প্রফেসরের কিম্ভূত পরিকল্পনা শুনতে শুনতে।

"আমার মাস্টার-প্রিন্টের মধ্যে। যার নকল আমি, তার মধ্যে বুঝেছেন?"

ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলেন ডক্টর। একবার অপাঙ্গে দেখে নিলেন শায়িত নিঝুম প্রফেসরকে। নিজের সঙ্গেই এতক্ষণ ধস্তাধস্তি করে নির্জীবের মত পড়ে রয়েছেন। প্রফেসরের কার্বন-কপি বললেন—"ফিরে যখন আসব, এই মেশিনের এই লিভারটা এই দিকে ঠেলে দেবেন—তাহলেই মেশিন চলবে উল্টো দিকে—আমরাও আগের সাইজ ফিরে পারো। কোনো প্রশ্ন থাকবে তাড়াতাড়ি বলুন।"

একটাই প্রশ্ন ছিল ডক্টরের—"দীননাথবাবুকে ল্যাজে বাঁধছেন কেন?"

কথার কি ছিরি। হাড জ্বলে গেল শুনে। প্রফেসর জবাব দিলেন ঝটিতি—"কারণ ভাইরাস ওকে স্পর্শ করতে পারবে না—প্রতিষেধ ও নিজেই। তাছাড়া পালোয়ানও বটে।"

মাথা দোলাতে দোলাতে সায দিলেন ডক্টর—"তা ঠিক···তা ঠিক। যাকগে, এবাব শুরু করা যাক। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আর কিছু করণীয় আছে আমার?"

"আছে। এইখানে চুপটি করে বসে থাকুন রোগ-প্রতিষেধক নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত। যাচ্ছি তো বিষঘ্ন ওষুধেরই সন্ধানে। আর হ্যাঁ, ফিরব কিন্তু অশ্রুনালীর মধ্যে নিযে। খেয়াল থাকে যেন।"

"থাকবে। জয় হোক আপনার!"

কার্বন-কপি 'আমি'র পাশে দাঁড়ালেন প্রফেসরের কার্বন-কপি।

বুথের মধ্যে অনেক মেশিন চলার গুঞ্জন শোনা গেল। দেখতে দেখতে অস্পষ্ট হয়ে এল দুটি মূর্তি—মিলিয়ে গেল শূন্যে।

১৪ ॥ মন শিকারের অভিযান

গা শিরশির করে উঠল আমার। হাত তুলে দেখি লোম খাড়া হয়ে উঠেছে।

এ দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস কবা কঠিন। ছোট্ট পাঠক পাঠিকারা মুচকি হাসছে কিনা জানি না, কিন্তু আমার সেই সময়ে হাসি পায়নি, গায়ে কাঁটা নিচ্ছিল। আযনার সামনে দাঁড়িয়ে যেন দেখলাম আমার প্রতিবিম্ব শূন্যে বিলীন হ'ল। অথচ সেই 'আমি' নিছক প্রতিবিম্ব নয়, ছায়া নয়—

আর একটা জলজ্যান্ত 'আমি'। অজান্তে হাত তুলে তাই দেখেছিলাম, চক্ষুভ্রম কিনা, সত্যিই আমি মিলিয়ে গেলাম কিনা। দেখলাম, আমি আছি, শুধু যা লোম-টোম সব খাড়া হয়ে গেছে।

জয় হোক হলোগ্রাফ-ক্লোনিং টেকনিকের !

ডক্টর নিবিড় দৃষ্টি মেলে সেকেন্ড কয়েক চেয়ে রইলেন বুথের দিকে। রোমাঞ্চিত-কলেবর তিনিও। বিংশশতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের যে আবিষ্কারটি এইমাত্র তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, পাঁচহাজার তিনশ একুশ সালেও নিশ্চয় তা কল্পনারও অতীত। সেকালের মুনি ঋষিরাও যোগবলে কি বিজ্ঞান বলে জানা নেই, অণিমা সিদ্ধাইয়ের কৃপায় অণুর মত ছোট্ট হয়ে যেতে পারতেন। পুরাণ যদি ইতিহাস হয়, তাহলে ঘটনাটা সত্যি। বিংশশতাব্দীর কাণ্ড-কারখানাও তো পাঁচহাজার তিনশ একুশ সালে পৌরাণিক কাণ্ডকারখানা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যক্ষ না করলে ডক্টর নিজেও কি বিশ্বাস করতেন ? যন্ত্রবলে অণু হয়ে যাওয়া কি বিশ্বাস-যোগ্য ? অজ্ঞাত প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ম কানুনের রহস্য যাঁরা আয়ত্ত করেছেন, সেই যোগীরা অবশ্য বলেন, সম্ভব বৈকি ! প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রও নিশ্চয় রোগীদের এই জ্ঞান বিজ্ঞানের আওতায় এনে ফেলেছেন। তাই আত্মসম্মোহ সমাধিপ্রাপ্তি আয়ত্ত করে নচ্ছার ভাইরাসকে পুরোপুরি শরীর আর মন দখল করতে দিচ্ছেন না। প্রাচীন ভারতের যোগ-ঐতিহ্যকে মনে মনে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানালাম।

বিস্ময়াচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়ে উঠে বুথ অভিমুখে অগ্রসর হলেন ডক্টর। পাল্লা খুলে ফেললেন। বুথ শূন্য। মেঝের ঠিক মাঝখানে ছোট্ট ডিশে টলটল করছে কেবল একটু সিরাম। সতর্কভাবে তা তুলে নিলেন ডক্টর। বিশেষভাবে নির্মিত একটা নিউম্যাটিক, মানে, বায়ুচালিত সিরিঞ্জ হাতে ধরিয়ে দিল নার্স মেয়েটা। ডিশ থেকে বিরঙ তরল পদার্থটা সিরিঞ্জে টেনে নিলেন ডক্টর। নিয়ে গেলেন শায়িত প্রফেসরের সামনে। পর্যায়ক্রমে তাকালেন আমার আর নার্সের দিকে। উত্তেজনায় মুখ লাল হয়ে গেছে দেখলাম। বললেন মৃদু চাপা কণ্ঠে—"যাত্রা হল শুরু ! প্রফেসর, জয় হোক আপনার !" প্রফেসরের ঘাড়ের কাছে ছুঁচ ফুটিয়ে দিলেন সিরিঞ্জের।

ভিসিফোন স্ক্রীনে এই সময়ে ফুটে উঠল মু-য়ের পাশব আনন। ধ্বনিত হল অপার্থিব কর্কশ কণ্ঠস্বর—"সময় ফুরিয়েছে ডক্টর। প্রফেসরকে সমর্পণ করুন !"

প্রফেসর আর আমার কার্বন-কপি অণু-আকৃতি তখন ঘুরপাক খেয়ে খেতে ধাবমান লোহিত ঘূর্ণিপাকে তলিয়ে যাচ্ছে···ছুটে চলেছে প্রফেসরের রক্তপ্রবাহ···অণু-আকৃতি মূর্তি দুটো সেই প্রবাহের টানে ধেয়ে চলেছে শিরদাঁড়া দিয়ে মস্তিষ্ক অভিমুখে—যেখানে ঘাপটি মেরে রয়েছে অখণ্ড প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অতিভীষণ মহাঘোর দুর্মদ মায়াবী···

খরস্রোত নদী সাঁতরে যেন পারে উঠে এলাম আমি আর প্রফেসর। লাল টকটকে জোয়ার যেন আমাদের ঠেলে এনে ফেলে দিয়ে গেল পিণ্ডময়, শক্ত, নীল আর ফ্যাকাশে লাল ডাঙায়—জায়গাটা একটা অন্ধকারময়, প্রতিধ্বনি মুখর সুড়ঙ্গ।

আমাকে টেনেটুনে খাড়া করলেন প্রফেসর। বললেন—"মেরুদণ্ডের মাথার কাছে কোথায় এসে পড়েছি নিশ্চয়।" দুইচোখে অসীম কৌতূহল নিয়ে ইতি উতি দেখে নিলেন—"কি রকম বুঝছো হে ছোকরা ?"

কি আবার বুঝবো ? বোঝবার মত অবস্থা কি তখন আছে ? আলগাভাবে বললাম—"খুব ভালো না।"

"কেন ? কেন ? কেন ?"

"কারো মাথার মধ্যে এর আগে তো কখনো ঢুকিনি।"

"সেইটাই তো ইণ্টারেস্টিং।"

"তা হবে।" প্রফেসরের কার্বন-কপি প্রফেসরেরই মাথার মধ্যে ঢুকে জ্ঞান দিচ্ছেন এবং আমার কার্বন-কপি তা শুনছে, ভাবতেই তো মাথা ঘুরে যায়। আমারও তখন নেই অবস্থা।

অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতরে চোখ পাকিয়ে দেখতে দেখতে প্রফেসর হৃষ্ট কণ্ঠে ফের বললেন—"ইণ্টারেস্টিং।"

বিদেশে বিভূঁয়ে মেজাজ খারাপ করা সমীচীন বোধ করলাম না। তাই বললাম বিনয় ক্ষরিত কণ্ঠে—"একটা ব্যাপার খুব আশ্চর্য লাগছে।"

"যথা ?"

"ভিজে সপসপে হওয়া তো দূরের কথা, গা-য়ে এক ফোঁটা রক্তও লেগে নেই কেন ? অথচ রক্তের জোয়ারেই তো ভেসে এলাম।"

"সারফেস টেনশন কাকে বলে জানা আছে ?"

আরে গেল যা ! এখানেও পরীক্ষা দিতে হবে ?

যাও বা জানতাম, ঐ অবস্থায় কিছুই মনে পড়ল না। ফ্যাল ফ্যাল করে

শুধু চেয়ে রইলাম।

প্রফেসর নিমীলিত চোখে বললেন—"যে কোনো তরল পদার্থের অণুদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণী শক্তির ফল হ'ল এই সারফেস টেনশন—যা সব তরল পদার্থের সীমানা-উপরিভাগে বিদ্যমান। ফলে মনে হয় যেন একটা স্থিতিস্থাপক মিহি চাদর দিয়ে ঢাকা রয়েছে তরল পদার্থের সীমানা দেশ। এই কারণেই খুব সরু ছুঁচ জলের ওপর ভাসিয়ে দেওয়া যায়, সারফেস টেনশন ভেঙে জলের ভেতর ঢুকতে পারে না। দীননাথ, আমরাও সারফেস টেনশন ভাঙতে পারিনি…কারণ আমরা অত্যন্ত ছোট হয়ে গেছি।"

"অ।"

কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হল আমার ওপর। 'অ' অক্ষরটার অর্থ যে আমি কিস্সু বঝতে পারিনি, প্রফেসরের আবার তা মনে পড়েছে—এই কার্বন-কপি অবস্থাতেও। কিন্তু বাক্য-শলাকায় আর বিদ্ধ করলেন না 'স্বদেশ'-দর্শনের বাসনাটা প্রবলতর হওয়ায়।

আচমকা একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিজলি ঝলসে উঠল মাথার ওপর—এঁকে বেঁকে মিলিয়ে গেল দূরে।

বলতে লজ্জা নেই, বিষম আঁৎকে উঠেছিলাম আমি।

"ওকী! প্রফেসর ওটা কী? এখানেও ঝড়জল হয় নাকি?"

"আরে না, না।" উল্লাসে আটখানা হয়ে জবাব দিলেন প্রফেসর—"ঝড়জলের বিদ্যুৎ ওটা নয়।"

"তবে কিসের?"

"চিন্তার। চিন্তা ছুটে গেল ব্রেনে। সাইনাপস্ মানে, দুটো পাশাপাশি নিউরোনের যোগাযোগ পয়েন্টের ইলেকট্রোকেমিক্যাল প্রতিক্রিয়া।" নিউরোন কাকে বলে, জিজ্ঞেস করার সাহস হল না পাছে মুখনাড়া খেতে হয়। বাড়ী ফিরে মেডিক্যাল ডিক্সনারী দেখে নেব ঠিক করলাম। যদ্দুর মনে পড়ল, কোনো স্নায়ুকোষে বার্তা নিয়ে যায়, সেখান থেকে বার্তা নিয়ে আসে।

প্রফেসর নিজের মনেই বললেন—"খুব সম্ভব আমার মাস্টার-প্রিণ্ট পা নাড়তে চাইছে……"

সত্যিই তাই। ঠিক সেই সময়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা প্রফেসর (নম্বর

ওয়ান) রাম-লাথি ছুঁড়ে প্লাস্টিক ফিতে ছেঁড়বার চেষ্টা করেছিলেন। বিপুল বিক্রম দেখে শংকিত হয়েছিলেন ডক্টর। বেশীক্ষণ আর বেঁধে রাখা যাবে কি? ভাইরাস ব্যাটাচ্ছেলে তো বেশ জাঁকিয়ে বসছে—আগের চেয়েও অবস্থা তার অনেক ভাল—অনেকখানি কব্জায় এনে ফেলেছে প্রফেসরের শরীরটাকে।

ভিসিফোনের চিৎকারে সম্বিৎ ফিরল ডক্টরের। মু চেঁচাচ্ছে তারস্বরে।

"ডক্টর! চরম হুঁশিয়ারির জবাব এখনো দেননি। পুরো ঘাঁটি কিন্তু এক্ষুনি ধ্বংস করে দিতে পারি, সেটা কি খেয়াল আছে?"

বোকারাই গোঁয়ার হয়, চালাকরা হয় না। ডক্টর নির্বোধ নন। তাই গোয়াবাগানের তড়পানির পুনরাবৃত্তি করলেন না। পেছন ফিরে দু-হাত তুলে বললেন শশব্যস্ত হওয়ার নিখুঁত ঢংয়ে—"আরে না, না! অত তাড়াতাড়ি কিসের? সর্ত মেনে নিচ্ছি তোমার। প্রফেসরকে আটকে রেখে আমার আর কোনো লাভ নেই। নিয়ে যাও যখন খুশী।"

ক্রুর হাসি ফুটে উঠল মু-য়ের মুখে। সে-হাসির সমতুল্য হাসি ইহজীবনে প্রত্যক্ষ করার দুর্ভাগ্য হয়নি ডক্টরের—"এতক্ষণে আক্কেল হ'ল তাহলে! এবার বলুন, অপদার্থ দীননাথ ছোঁড়া আপনার সঙ্গেই আছে তো?" রাস্কেলটা আমায় দেখতে পায়নি—আমি তখন দরজার সামনে পাহারায় দাঁড়িয়ে।

অম্লান বদনে মিথ্যে বললেন ডক্টর—"দেখতেই পাচ্ছো, এখানে নেই। নার্স ছাড়া আমার সঙ্গে আর কেউ নেই। হাসপাতালের কোথাও ঘুরঘুর করছে নিশ্চয়! কোথায় আছে বলতে পারব না।"

"আমরা ঠিক খুঁজে নেব, নিপাতও করব। একেবারেই অপদার্থ—কোনো কাজে আসবে না আমাদের। আপনি যেখানে আছেন, ঐখানেই থাকুন—আমরা আসছি।"

অন্ধকার হয়ে গেল ভিসিফোন।

আমি তখন রোমাঞ্চিত কলেবরে অন্ধকার সুড়ঙ্গে দাঁড়িয়ে আকাশ পাতাল ভাবছি। রক্ত-জোয়ারে হু-উ-ড-স্ করে ভেসে আসার সময়ে মনে হয়েছিল ঠিক যেন গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছি। যে গঙ্গায় ফি-বছর ৩০০০ আধ-পোড়া মড়া ভেসে যায় পুণ্যতীর্থ কাশীর হরিশচন্দ্র ঘাট আর মণিকর্ণিকা ঘাট

থেকে। সেই সঙ্গে ৩০০ টন ছাই আর আধপোড়া মড়াদের ২০০ টন মাংস। সব মিলিয়ে মোট ৬০০০ মড়া ভাসিয়ে দেওয়া হয় গঙ্গার জলে প্রতিবছর, সেই সঙ্গে দু-পাড়ের ১৫০০ কলকারখানার ময়লা পড়ে গঙ্গায়—এক রাজঘাট থেকেই ঢেলে দেওয়া হয় ৩৫০০ গ্যালন আবর্জনা! এত রোগের জীবাণু গঙ্গার জলে সেই কারণেই।

আমরাও দুটো জীবাণুর মত ভেসে এসেছি রক্তপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে। না জানি এবার জীবাণু সংহারের কি আয়োজনের মধ্যে পড়তে হয়। ভাবতেই ফের কাঁটা দিল গায়ে।

ভিসিফোন নিভে যেতেই ডক্টর মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন আমাকে—"দীননাথবাবু!"

"বলুন।" দরজার বাইরে ঘাপটি মেরে ছিলাম এতক্ষণ। ডাক শুনে গুটিগুটি ঢুকলাম ভেতরে। পেছন পেছন এল ক-৫।

ক্ষিপ্রকণ্ঠে বললেন কৌ—"ওরা আসছে।"

আমি বলাম—"আমাকে সাবাড় করতে।"

"হ্যাঁ। অন্ততঃপক্ষে মিনিট দশেক হারামজাদাদের আটকে রাখতে হবে। পারবেন?"

"যদি ক-৫য়ের সাহায্য পাই, তাহলে পারবো।"

"নিশ্চয় পাবেন! ক-৫, দীননাথবাবুকে সাহায্য করো।"

"তথাস্তু, প্রভু।" প্রভুকে কেউ বর দেয় না, এই আক্কেলটাও কুকুর যন্ত্রের নেই শুনে তখন কিন্তু হাসবার মত আমার মনের অবস্থা ছিল না। যাই, হোক নতুন স্যাঙাতের দিকে ফিরলাম।

"বললাম-- "ক-৫, ওরা আসবে করিডর দিয়ে, তাই তো?"

"নির্ভুল।"

"ওখানেই আমরা দাঁড়াবো। একটা বাধা যদি খাড়া করতে পারতাম—"

রণকৌশল জিনিসটা ক-৫য়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠল—"সার্ভিস সুরঙ্গটা আগে ধ্বংস করে দেওয়া যাক।"

খুশী হলাম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে। বললাম—"ঠিক বলেছো।

নইলে পেছন থেকে চড়াও হতে পারে। আমরা—"

অধীর কণ্ঠে বললেন ডক্টর—"যা করবার তাড়াতাড়ি করুন। আমার হাতে সময় বেশী নেই।"

ঝটিতি বললাম—"ক-৫, সুড়ঙ্গটা ধ্বংস করে এসো তুমি। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বাইরে।"

বিদ্যুৎবেগে অন্তর্হিত হল ক-৫। ইলেকট্রনিক ব্রেন তো কথা বুঝে কাজ করে ঝড়ের মত। মন্থরতা ধাতে নেই।

সে তুলনায় আমি কিঞ্চিৎ মন্থর। লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার করছি। তাই ক-৫ নিমেষে উধাও হওয়ার পর দরজার দিকে মনুষ্যবেগে ধেয়ে যেতে যেতে থমকে গেলাম নার্স মেয়েটার সংশয়াচ্ছন্ন কণ্ঠস্বরে—"ডক্টর, বড় ভয় করছে।"

"কেন?" অনেকটা অহীন চৌধুরীর বিখ্যাত ঢংয়ে বলে উঠলেন ডক্টর।

"ওরা পারবে তো? একজন তো আদিম বর্বর, আরেকজন রোবট কুকুর। বাকী দুজন অদ্ভুত দুটো ক্লোন—অণুর মত ছোট।"

পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল আমাকে আদিম বর্বর বলায়। কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়—পাঁচহাজার তিনশ একুশ সালের আদমির কাছে এক হাজার ন-শ একাশি সালের মানুষ তো আদিম বর্বরই। কিন্তু স্বকর্ণে এহেন বিশেষণ শুনে কেউ স্থির থাকতে পারে না। আমিও পারলাম না। স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হলাম। রামায়ণে বর্ণিত আদিম বর্বর রাক্ষুসে-নিনাদ ছেড়ে বললাম—"খবরদার! মুখ সামলে!"

সে কী নিনাদ! ভীষণ চমকে উঠল নার্স মেয়েটা! মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, চোখ ঠেলে এল। তারপর যখন দাঁত কিড়মিড় করে বাজখাঁই স্বরে বলে উঠলাম—"কাকে আদিম বর্বর বলছেন?" তখন মেয়েটার নিশ্চয় মনে হয়েছিল রাক্ষসদের মতই এবার বোধ হয় তাকে কাঁচা খেয়ে ফেলব—ফেন না, কাঁপতে কাঁপতে সরে গেল ডক্টর-য়ের আড়ালে।

পরিস্থিতি সামলে নিলেন ডক্টর পলক ফেলবার আগেই। টান মেরে একটা সিকিউরিটি লকার খুললেন। ভেতর থেকে দুটো ছোট ছোট ব্ল্যাস্টার বার করলেন। নার্সের হাতে একটা গুঁজে দিয়ে বললেন—"কখনো চালিয়েছো? অভ্যেস আছে? বেশ বেশ! যদি দ্যাখো, ভাইরাস

আমাকে দখল করে ফেলেছে, বিনা দ্বিধায় ব্ল্যাস্টার চালাবে আমার ওপর। ভাইরাস যদি তোমাকে দখল করে আমিও চালাবো তোমার ওপর। যাই ঘটুক না কেন, প্রফেসরকে দশ মিনিট সময় দিতেই হবে।"

ব্ল্যাস্টারটা আলগোছে আমার দিকে তাগ করে রেখে নার্স বললে—"বুঝেছি।"

যেখানে মেয়ে মানুষের হাতে অস্ত্র থাকে, সেখানে আমি দাঁড়াই না। সবেগে বেরিয়ে এলাম করিডরে।

আমার আর প্রফেসরের ক্লোন-আকৃতি তখন পা টেনে টেনে অতিকষ্টে চলেছে একটা পাতাল-গহ্বরের মধ্যে দিয়ে। নরম কাদা প্যাচপেচে জলা ভূমির মত অঞ্চল। চারপাশে নিশানের মত ঝুলছে কলাতন্তু আর ছত্রাক রূপী জাল। নিকষ অন্ধকারে কোথায় পা ফেলছি, দেখবার উপায় নেই। মাঝে মাঝে চিন্তা-ঝলক উজ্জ্বল বিদ্যুৎরেখার মত ঝলসে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। ঐ আলোতেই যেটুকু দেখা যায়। তারপরেই অন্ধকারকে আরো গাঢ় মনে হচ্ছে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার ফলে। অবর্ণনীয় সেই অভিজ্ঞতা আমি আমার এই দুর্বল লেখনীতে যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে পারছি না। সেই মুহূর্তের গা-ছমছমে রোমাঞ্চক অনুভূতিও বিচিত্র এই আখ্যানের রুদ্ধশ্বাস পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারছি না—আমি নিরুপায়।

একবার তো হুমড়ি খেয়ে পড়েই গেলাম। ঝাল ঝাড়লাম প্রফেসরের ওপরেই—"কোন চুলোয় চলেছি, বুঝতে পারছি না।"

"কিন্তু আমি পারছি," পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর। "চলেছি আমারই নিউরনের স্নায়ু-পথ বেয়ে। খুঁজছি একটা ব্রীজের মত কিছু—যার ওপর দিয়ে মস্তিষ্কের বাঁদিকের আর ডানদিকের দুটো ভাগের মধ্যে যাতায়াত করা যায়।"

"আপনার কি মনে হয় ভাইরাস ব্যাটাচ্ছেলে সেখানেই আছে?"

"আন্দাজ তো তাই।"

"আন্দাজ? স্রেফ আন্দাজের ওপর এই বিপদ মাথায় নিলেন?"

"বৎস দীননাথ," সুমিষ্ট কণ্ঠে বললেন প্রফেসর—"ভাগ্য সহায় হয় তারই, যে সাহসী। এক্ষেত্রেও সাহস সম্বল করেই এই বিপদে পা বাড়িয়েছি।

আর কি করার আছে বলো ? আমার আন্দাজ, ভাইরাসটা নিশ্চয় আমার চেতন আর অচেতন দুটো কাজই নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তাকে সীমান্ত অঞ্চলেই খোঁজা উচিত নয় কি ? লঘুমস্তিষ্কের কাজই তো সূক্ষ্ম ঐচ্ছিক নড়াচড়া আর অঙ্গস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করা। এই লঘুমস্তিষ্ক রয়েছে গুরুমস্তিষ্কের নিচের দিকে। আর আমরা রয়েছি এখন লঘুমস্তিষ্ক আর সুষুম্নাকাণ্ডের মাঝামাঝি অঞ্চলে।"

"লেকচারটা বন্ধ করবেন ?" অন্ধকার গহ্বরে কাঁহাতক শারীরবৃত্তের বক্তৃতা শোনা যায় ? মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি সেই কারণেই। তার ওপর ক্ষণে ক্ষণে মাথার ওপর ঝলসে উঠছে চিন্তা বিদ্যুৎ।

সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেলেন প্রফেসর। সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চললেন সামনে। অন্ধের মত এগিয়ে চলা যাকে বলে।

গজগজ করলাম কিছুক্ষণ আপন মনে। তারপর বললাম—"ধরুন যদি ভাইরাস ব্যাটার সামনে গিয়ে পড়ি ?"

"এখনো তো পড়িনি। এক্ষুনি তাকে দেখতে পাবো বলেও মনে হয় না। সে ঢুকেছে চোখের স্নায়ু দিয়ে—দু-চোখের মাঝে বিদ্যুতের মধ্যে দিয়ে। আর আমরা রয়েছি সুষুম্নাকাণ্ড আর লঘুমস্তিষ্কের মাঝামাঝি অঞ্চলে। কিন্তু চোখ খোলা রাখো—নষ্ট হয়ে যাওয়া কলাতন্তু দেখলেই বলবে।"

ঠিক এই সময়ে সড়াৎ করে একটা চিন্তা-বিদ্যুৎ খেলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ক্ষণপ্রভার চকিত আলোকে দেখলাম পায়ের কাছে কালচে হয়ে যাওয়া একতাল কলাতন্তু। তার মধ্যে ঘ্যাঁচ করে গোড়ালীর লাথি মেরে বললাম—"এইরকম কি ?"

অঁক করে উঠলেন প্রফেসর—"সামলে ! সামলে ! লাথি মারছো আমাকেই—খেয়াল থাকে যেন।"

"সরি !"

ক্ষণিক বিজলি প্রভায় প্রফেসর তখন যা দেখেছিলেন, আমাকে বলেননি পাছে আঁৎকে উঠি, তাই। পেছন ফিরলে আমিও দেখতে পেতাম সেই দৃশ্য।

আকারহীন কতকগুলো মূর্তি জড়ো হচ্ছে আমাদের পেছনে। দল বৃদ্ধি হচ্ছে দ্রুত, নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে পেছন পেছন—স্নায়ুপথ বেয়ে।

বহিরাগত আততায়ী আমরা। তাই আমাদের নিকেশ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে প্রফেসরের দেহ…… !

মনুষ্যবেগে যা আপিচ সম্ভব নয়, রোবটবেগে সেই দুরূহ কর্ম পলকের মধ্যে সমাধা করে ফিরে এল ক-৫। করিডরে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই সর-সর করে এসে ব্রেক কষল আমার সামনে।

"প্রভু, সার্ভিস সুড়ঙ্গ ধ্বংস করে এলাম।"

"একহাজার একখানা ধন্যবাদ রইল, ক-৫। এবার একটা বাধা তৈরী করতে হ'বে—একটা ব্যারিয়ার খাড়া করতে হবে। পারবে ?"

নিরুত্তরে সক্রিয় হল ক-৫। ব্লাস্টার-চোঙ ঠেলে বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। ফুল ফোর্সে শক্তি বিচ্ছুরিত হতেই উড়ে গেল বিপরীত দেওয়াল আর কড়িকাঠ। বাদবাকী হুড়মুড় করে ভেঙে নেমে এল করিডরে। আবার শক্তিবর্ষণ করল ক-৫। দেওয়ালের একটা বিরাট অংশ দমাস করে এসে পড়ল তার ওপর। রাবিশের স্তূপ রচনা হয়ে গেল করিডরে।

"চলবে ?"

"চমৎকার ! আবার সহস্র এক ধন্যবাদ, ক-৫।"

"কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন, আমি রোবট।"

করিডরের সামনে পেছনে দৃষ্টিচালনা করতে করতে বললাম—"সত্যি ?"

"ভাবাবেগের কোনো সার্কিট আমার ভেতরে নেই, আছে শুধু স্মৃতি আর সজাগ থাকার সার্কিট," মৃদু মৃদু নড়তে লাগল ক-৫য়ের লেজের অ্যান্টেনা। করিডরের সামনে পেছনে শত্রু আসছে কিনা লক্ষ্য করছে। মনুষ্য চোখে তাদের আবির্ভাব ধরা পড়ার আগেই, রোবট-সেন্সরে সে খবর এসে গেল। "হুঁশিয়ার ! শত্রু আসছে !"

পেছিয়ে গেল ক-৫। ঝটপট এক চাঙরা রাবিশের আড়ালে গা-ঢাকা দিলাম আমি। মু আবির্ভূত হল সঙ্গে সঙ্গে। চৌ আর অন্যান্য স্যাঙাৎরা রয়েছে পেছনে। প্রত্যেকের চোখ ঘিরে কর্কশ লালচে লোমের আচ্ছাদন। ভুরু কিলবিল করছে বাচ্ছা কেউটের মত। এবং প্রত্যেকের হাতেই উদ্যত রয়েছে ভয়াবহ মারণাস্ত্র—ব্লাস্টার। হাত তুলে ক্ষুদে ফৌজের পথরোধ করল মু। বললে অপার্থিব গলায়—"অপদার্থ জঞ্জাল-

টাকে সরানো দরকার সবার আগে।" বলেই সন্তর্পণে সামনে এগিয়ে উঁকি মারলে মারল র‍্যাবিশ-প্রতিবন্ধকের ফাঁক দিয়ে—"দীননাথ, হেই দীননাথ, ভালো ছেলের মত প্রফেসরকে এনে দাও বলছি।"

হাড়পিত্তি জবলে গেল আমাকে 'দীননাথবাবু' না বলায়। বিটলে-বাঁদরামি সহ্য করতে পারলাম না। আড়াল থেকেই পাল্টা চিৎকার করে উঠলাম গলার শির তুলে—"সাহস থাকে তো এগিয়ে এসে নিয়ে যা!" বলেই মুখ বাড়িয়ে ব্ল্যাস্টার-বর্ষণ করলাম অমানুষগুলোকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম। অনভ্যস্ত হাতে কলকাতার প্যারা-মিলিটারী, মানে, পুলিশরাই পা টিপ করতে গিয়ে অন্য বাড়ীর নিরীহ লোকের মাথা উড়িয়ে দেয়। আমার আর দোষ কী!

চকিতে পাল্টা ব্ল্যাস্টার বর্ষণ করল মু আর দলবল। ফুসফাস দুমদাম করে আশপাশ থেকে উড়ে গেল র‍্যাবিশ। আমিও ছাড়লাম না।

ব্যারিকেডের ওপর দিয়ে শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ!

এদিকে বাঁধা অবস্থাতেই গুঁড়িয়ে উঠে ছটফট করতে লাগলেন প্রফেসর।

কব্জিতে বাঁধা ক্রোনোমিটার দেখলেন ডক্টর।

বললেন নার্সকে—"আটমিনিটেরও কম সময় এখনও হাতে আছে। কিছু পেলে?"

নার্স মেয়েটা তন্ময় হয়ে ঝুঁকেছিল ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে। সাধারণ ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ নয়—কম্পিউটার চালিত ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ—যে বস্তু এ বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের ধারণার অতীত। আমার কলাতন্তুর একটা নমুনা নিয়ে উন্মাদিনীর মত আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে আমার রোগ-প্রতিষেধের কারণটা—কেন ভাইরাস ব্যাটা কব্জায় আনতে পারছে না আমাকে কিছুতেই। কম্পিউটারের ফলাফল ফুটে উঠছিল একটা আলোকিত পর্দায়। সেই দিকে চোখ রেখে বললে মাথা চুলকোতে চুলকোতে—"টিশুর সব খবরই কমপিটার দিচ্ছে। রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা রয়েছে প্রতিটি কোষের মধ্যে কিন্তু—"

শুষ্ক হেসে ডক্টর বললেন—"দো-আঁশলা প্রাণী নিশ্চয়। এই কারণেই টিঁকে গেছে। কিন্তু দৈহিক প্রতিষেধের তো কোনো চিহ্নই দেখছি না।"

"রক্তের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা যাচাই করলে—"

"উঁহু। আমার তো মনে হয় প্রতিষেধক ব্যবস্থা রয়েছে ওর মনের মধ্যে—পুরোপুরি মনস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থা। মাইক্রোসকোপে ধরা পড়বে না।"

ঠিক সেই সময়ে ব্ল্যাস্টার যুদ্ধের আওয়াজ ভেসে এল ঘরের মধ্যে। রাবিশ ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে—দুমদাম শব্দে করিডর মুখর হয়ে উঠেছে। আমার মুচিপাড়া মার্কা হুংকারও শোনা গেল সব কিছু ছাপিয়ে। জয়োল্লাসের হুংকার!

চমকে উঠে নার্স বললে—"আক্রমণ শুরু হয়ে গেল!"

আত্মস্থ কণ্ঠে ডক্টর বললেন—"হ্যাঁ। দীননাথের হিম্মৎটা দেখেছো? আদিম শিকারীদের রক্ত বইছে ধমনীতে—হুংকার শুনলেই রক্তহিম হয়ে যায়!"

চিন্তা-বিদ্যুৎ আবার মাথার ওপর ঝলসে উঠতেই আপনা থেকেই আমার পুরো শরীরটা ডিগবাজী খেয়ে আছড়ে পড়েছিল।

প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র কিন্তু একখানা চীজ বটে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বিজয়গর্বে এমনভাবে চারপাশ নিরীক্ষণ করে নিলেন যেন রণক্ষেত্রে গোলাগুলির মাঝে উন্নতশিরে দাঁড়িয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

বললেন অতীব হৃষ্ট কণ্ঠে—"সর্বাধুনিক কমপিউটার সিসটেমেও এমনটা দেখতে পাবে না, নাকি বলো দীননাথ?"

কর্ণপাত না করে সামনের দিকে ঝুলন্ত পিণ্ডিপাকানো একদলা কলাতন্তু দেখিয়ে বললাম—"ওটা আবার কী?"

"আমার ব্রেন তোমার ব্রেনের চাইতে এত উন্নত ওর জন্যেই। ওর নাম সুপার গ্যাঙ্গলিয়ন—অতি-সহযোগী নার্ভ সেন্টার—যার মধ্যে নার্ভ ফাইবার আসছে আবার বেরিয়েও যাচ্ছে। এর জন্যেই—"

আমার সর্বাঙ্গ তখন টানটান হয়ে গেছে আসন্ন বিপদ সম্ভাবনায়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় চিরকালই আমার মধ্যে একটু বেশী সজাগ—মেয়েদের মতই। চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বক নামক পঞ্চেন্দ্রিয় তা টের পায় না—আমি তা টের পাই আগে ভাগেই—প্রফেসর এই জন্যেই আমাকে বলেন ভয়কাতুরে—ছায়া দেখে চমকে উঠি। অথচ আমার এই ভয়কাতুরে সত্তাটির জন্যে কতবার কত বিপদ যে এড়িয়ে গেছেন, অকৃতজ্ঞ প্রফেসর তা স্মরণে রাখেন না। এই ক্ষেত্রেও সহসা আমার শরীরের অণুপরমাণু পর্যন্ত শিহরিত হল

নামহীন আগন্তুক আতংকের বিভীষিকায়। ফিসফিস করে বলে উঠলাম —"বিপদ আসছে। প্রফেসর, ভীষণ বিপদ আসছে!"

"বড় বাজে বকো ছোকরা। আমার ব্রেনের খবর আমি জানি না, আর তুমি সব জেনে বসে আছো? কোনো বিপদ নেই এ অঞ্চলে। ব্রেনের কোন্ অঞ্চলে কি থাকে, জানা আছে?"

এতো মহাজ্বালা! প্রফেসরের বদ্‌মেজাজটাও ক্লোন সংস্করণে চলে এসেছে!

উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও তাই বলতে হল—"ঠিক আছে, ঠিক আছে, এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?"

"উত্তেজিত হব না? যতবার খুশী, ততবার হব। ব্রেনটা আমার, খেয়াল থাকে যেন! ব্রেন সম্বন্ধে কি জানতে চাও বলো, সব আমার নখদর্পণে!"

প্রমাদ গণলাম—"থাক, থাক, এখন আর লেখাপড়ায় দরকার নেই!"

"হাজারবার আছে! লেখাপড়ার আবার সময় আছে নাকি? চা খাওয়ার যেমন নির্দিষ্ট সময় নেই, লেখা পড়ারও তেমনি কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। যখনি সুযোগ পাবে, তখনি গ্রহণ করবে—"

"আমি বলছিলাম—"

"কথার মাঝে একদম কথা বলবে না। ভেরী ব্যাড হ্যাবিট! কোনো এক বেল্লিক কোনো এক সময়ে অবিকল ব্রেনের মতই নিপুণ একখানা মেশিন তৈরী করার চেষ্টা করেছিল। ঝামেলা হ'ল সাইজ নিয়ে। মেশিনখানা নাকি করতে হবে কলকাতা শহরের চাইতেও বড় সাইজের—আর তাকে ইলেকট্রিসিটি জোগাতে হবে গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত হাই-টেনশন কেব্‌ল্ থেকে! অত করেও তৈরী হবে মামুলী একখানা মানুষের ব্রেন—আর আমার হল গিয়ে অতি-মানুষের ব্রেন—আরও জটিল। ডানদিকের আর বাঁদিকের অংশ মিলেমিশে কাজ করে চলেছে বিশেষ ধরনের এই স্নায়ু গ্যাঙ্গলিয়া মারফৎ—যুক্তি বুদ্ধি আইকিউ তাই সুষ্ঠ, নিখুঁত—"বলতে বলতে স্তব্ধ হলেন প্রফেসর—"কথাগুলো শুনছো তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনছি," আসলে একটা বর্ণও কানে তুলিনি আমি।

ভয়ে ভয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছেছি আর একটা জটিল গঠনের বিরাট-কায় সপ্রভ দলা পাকানো গ্যাঙ্গলিয়ার সামনে। মিউজিয়ামের গাইড যে-

ভাবে মুকুটমণি দেখায়, সেইভাবেই হস্ত সঞ্চালন করে প্রফেসর বলে উঠলেন—"ঐ হ'ল রিফ্লেক্স লিঙ্ক কি হ'ল ? হাঁ করে তাকিয়ে রইলে কেন ? রিফ্লেক্স লিঙ্ক মানেও বোঝো না ? পরিভাষা পণ্ডিতরা তোমার মাথাটি খেয়ে বসে আছে দেখছি। প্রতিবর্তী ক্রিয়া···প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সংযোজক—ওর দৌলতেই তো আমি আমার বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে একাকার হয়ে রয়েছি—হাজারটা সুপার-ব্রেন এক হয়ে রয়েছে একখানা জায়গায়।"

অতিকষ্টে ধৈর্যরক্ষা করে বললাম বিনীত কণ্ঠে—"সেই বুদ্ধিমত্তার একটুখানি এক্ষুনি যদি কাজে লাগাতেন—"

বলছি কাকে ? প্রফেসর তখন চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছেন সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে ঝুলন্ত আর একটা বিশাল গ্যাঙ্গলিয়ার দিকে। কথার জবাব না দিয়ে বললেন—"দীননাথ, দেখে যাও—কাণ্ড দেখো। এই সংযোজক গুলো দেখছি কেটে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে।" ছেঁড়া জায়গাটা ভাল করে দেখতে দেখতে বললেন সবিস্ময়ে—"কেয়াবাৎ ! কেয়াবাৎ !"

ছিন্ন ফাঁকটার অপর দিক দিয়ে মুণ্ড গলিয়ে দিয়ে আমি বললাম—"কেয়াবাৎ ! কেয়াবাৎ।"

রেগে গেলেন প্রফেসর—"ইয়ার্কি মারার সময় এটা নয়।"

"জানি। কিন্তু সময় নষ্ট করছেন আপনিই। এখন দাঁড়াবার সময়ও নেই—চরৈবেতি—চরৈবেতি ! শুধু এগিয়ে চলুন।"

"মোটেই না। এখনই তো দাঁড়ানোর সময়। মূর্খ, দেখতে পাচ্ছোনা জখমটা টাটকা ?"

"ভাইরাসের কাণ্ড বলতে চান ?"

"তাছাড়া আর কার কাণ্ড ? আমরা খুব কাছেই চলে এসেছি !"

ঠিক এই সময়ে একটা সাদা ফোঁটা ধপ করে কোত্থেকে যেন খসে পড়ল আমার কাঁধে। ককিয়ে উঠে ঝেড়ে ফেলতে গেলাম, তার আগেই আর একটা ফোঁটা-বস্তু পড়ল আর এক কাঁধে···তারপরেই আর একটা···আবার···আবার···আবার···দেখতে দেখতে দেখতে ফুলো ফুলো তরল পদার্থের ফোঁটার মত সাদা আকৃতিতে ছেয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গ। আকাশফাটা চিৎকার করে চললাম সমানে—"বাঁচান ! বাঁচান ! প্রফেসর, আমাকে বাঁচান !"

নির্বিকার গলায় প্রফেসর বললেন—"কি করে বাঁচাই বলো ? আমার

দেহের প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে আমার অস্ত্রধারণ কি সমীচীন? মরে গেলেও পারব না। আমার নিজের ফ্যাগোসাইট যে ওরা—ওদের কাজ অন্য কোষ আর কলাতন্তুর জঞ্জাল গিলে খাওয়া—"

"আমাকেও গিলছে যে—" বিষম আর্তনাদ করে উঠলাম।

সান্ত্বনার সুরে প্রফেসর বললেন—"তা তো গিলবেই। হাজার হোক আমার ফ্যাগোসাইট—"

"প্রফেসর!"

"চেঁচিও না! ছুরি থাকে তো চালাও—আমি দেখছি।"

ছুরি একটা ছিল পকেটে। সবসময়ে রাখি। অতিকষ্টে পকেট থেকে বার করলাম এবং মরিয়া হয়ে এলোপাতাড়ি চালিয়ে গেলাম। কিন্তু সংখ্যায় বেড়েই চলল হারামজাদা ফ্যাগোসাইটরা—অগণন, অসংখ্য, অন্তহীন তাদের আবির্ভাব···দেখতে দেখতে শ্বেত আকৃতিদের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেলাম আমি।

নিজের দুর্ধর্ষ প্রতিরক্ষাবাহিনীর ক্রিয়াকলাপ দেখে এতক্ষণ যেন স্বর্গসুখ অনুভব করছিলেন প্রফেসর। কিন্তু আর যখন দেখতে পেলেন না আমাকে, তখন টনক নড়ল। প্রাণাধিক প্রিয় তো আমি। তাই ধাঁ করে ধেয়ে গেলেন সুড়ঙ্গের উল্টোদিকে, দুটো দোদুল্যমান স্নায়ু-প্রান্ত দু হাতে খামচে ধরে পরস্পরঠেসে ধরলেন। কড়-কড় শব্দে একটা ফ্ল্যাশ দেখা গেল। ফ্যাগোসাইট ফৌজ তৎক্ষণাৎ আমাকে পরিত্যাগ করে দলে দলে ছুটল সুড়ঙ্গ বরাবর—দেখতে দেখতে উধাও হল দূর হতে দূরে—যেন দূরে কোথাও বিপদ সংকেত বেজেছে—জরুরী ডাক পড়েছে।

সস্নেহে আমার ধরাশায়ী মূর্তিটাকে টেনেটুনে খাড়া করলেন প্রফেসর।

আচ্ছন্ন কণ্ঠে বললাম—"কি ম্যাজিক দেখালেন বলুন তো?"

"ভাঁওতা দিলাম ফ্যাগোসাইটদের। মিথ্যে ডাক দিলাম। আমার লিভার নষ্ট হতে বসেছে, এই খবরটা পাগলা-ঘণ্টি বাজিয়ে জানিয়ে দিতেই বাছারা ছুটল সেইদিকে—গিয়ে দেখবে অবিশ্যি লিভার আমার ভালই আছে।"

"বুদ্ধিটা একটু আগে খরচ করলে ভাল হত না?" ছুরিটা হাতে রেখেই বললাম তিক্তস্বরে।

"তাহলে ফ্যাগোসাইটদের শক্তিটা তো আর দেখা হত না। দেখলাম,

পালোয়ান দীননাথও নাজেহাল আমার দেহরক্ষীদের হাতে !" খুবই খুশী খুশী গলায় বললেন প্রফেসর। তারপরেই আমার তেড়ে ওঠা বন্ধ করার জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন—"চলো, চলো এগিয়ে চলো !"

"আইসোলেশন ওয়ার্ডে" ছটফটিয়ে উঠলেন প্রফেসর। পিঠের দুর্বলতম অঞ্চল ছোঁয়ার চেষ্টা করলেন। তেউড়ে উঠল সারাদেহ। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল গোঙানি।

"হল কী ?" নার্সের প্রশ্ন।

মুখভঙ্গী করে ডক্টর বললেন—"কে জানে। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—ওঁরা এখন ঐ জায়গায় পেঁছেছেন। অনুভূতি সচেতন এমন জায়গায় পেঁছে কলকাঠি নাড়াচ্ছেন—"

কড়-কড়-কড়াৎ শব্দ শোনা গেল বাইরে। নতুন ধরনের ব্লাস্টার ছুঁড়ছে অমানুষিক বিভীষিকারা—নিঃশব্দে নয়—সশব্দে। শব্দ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। ক-৫ আর আমি পিছু হটছি সম্মিলিত আক্রমণে।

ক্রোমোমিটার অবলোকন করলেন ডক্টর—"আর মোটে সাড়ে সাত মিনিট বাকী। আশার আলো তো দেখছি না—"

মুখ শুকিয়ে গেল নার্সের।

মু-য়ের দল বেড়েই চলেছিল। কাতারে কাতারে অমানুষরা ভিড় করেছে পেছনে। বিশাল ফৌজ। অগুন্তি। ঘাঁটির সব্বাই বোধহয় রূপান্তরিত হয়েছে ভাইরাস আক্রমণে। তারা আসছে তো আসছেই—বয়ে আনছে নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র—যে সব আমি কস্মিনকালেও দেখিনি। বেশ কয়েকজনকে খতম করেছি আমি আর ক-৫। তবু তাদের শেষ নেই। একজন ধরাশয়ী হচ্ছে তো তার জায়গা নিচ্ছে আর একজন। ঠিক যেন পঙ্গপাল। মরতে ভয় পায় না—মারণযজ্ঞে মত্ত হয়ে নিজেদের আহুতি দিয়েও যজ্ঞ শেষ করতে চায়।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডক্টর একটু বেশীরকম সংক্রামিত হয়েছে দেখা গেল। অতি-উৎসাহী। অন্যদের চাইতে বেশী উন্মত্ত। ক্ষিপ্তের মত মরিয়া হয়ে বিকট লাফ মেরে ব্যারিয়ার টপকে এসে পড়ল এ-পাশে। ক-৫ নির্ভুল লক্ষ্যে তাকে তৎক্ষণাৎ পেড়ে ফেলল মাটিতে। ডক্টর আছড়ে পড়ল ক-৫য়ের

সামনেই। আচম্বিতে বিদ্যুৎ-ঝলক পট-পটাং শব্দে ঠিকরে এল দু-চোখের মাঝ দিয়ে—স্পর্শ করল ক-৫য়ের চক্ষুপর্দা।

স্খলিত, জড়িত গলায় ক-৫ বলে উঠল—"গোলাম হাজির, হুজুর। হুকুম করুন!"

ব্যারিয়ারের ওদিক থেকে গলা ফাটিয়ে মু হুকুম দিল তৎক্ষণাৎ—"দীননাথকে মারো, ক-৫! অপদার্থকে সাফ করো আগে—পথের কাঁটা।"

"তথাস্তু! অপদার্থ আগে মরুক!" বশংবদ কণ্ঠে ধুয়ো ধরল ক-৫। পুরো যান্ত্রিক দেহটা লাট্টুর মত বাঁই-বাঁই করে ঘুরে গিয়ে স্থির হল আমার দিকে।

আমি তখন ব্ল্যাস্টার বর্ষণ করতে করতে পালাচ্ছি। রাবিশের আনাচে কানাচে ঘাপটি মেরে ব্ল্যাস্টার বর্ষণ করেই দৌড়োচ্ছি। লড়তে আমার চিরকালই ভাল লাগে। এই লড়াইতেও বেশ মজা পাচ্ছি। মজায় বুঁদ হয়ে থাকার ফলে লক্ষ্যই করিনি ক-৫ হতভাগা আমার পিঠের দিকে ব্ল্যাস্টার চোঙ তাগ করে সর-সর করে ধেয়ে আসছে পেছন থেকে……

১৫ ।। মন মস্তিষ্কের সীমান্তে

সুড়ঙ্গ দেওয়ালের একটা হাঁ-করা কালচে ফাঁকের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন প্রফেসর—"দীননাথ, এগিয়ে চলো, পেছনে থাকব আমি।"

"ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে?"

"ভয় আবার কিসের?" জোর করে হাসি টেনে বললেন প্রফেসর—"তবে কি জানো, এখন থেকেই তো ভাইরাসের চিহ্ন ফলো করতে হবে। এই সেই পথচিহ্ন।"

"পথের শেষ কোথায়?"

"যদি জানতাম, তাহলে তোমাকে সঙ্গে নিতাম না। ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় তোমার মধ্যে একটু প্রবল কিনা," খোশামোদের সুরে বললেন প্রফেসর।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। এই রকমভাবেই বহু বিপদের সম্ভাবনায় আমার এই স্ত্রী-সুলভ ষষ্ঠইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিয়েছেন উনি। পরে আবার টিটকিরিও দিয়েছেন।

নচ্ছার ফ্যাগোসাইটদের হামলার মধ্যেও ব্ল্যাস্টার হাতছাড়া করিনি—

সে বান্দাই নই আমি। ছুরিটাও ছিল একহাতে। দুই হাতে দুটি আদিম আর আধুনিক অস্ত্র নিয়ে পা বাড়ালাম রন্ধ্রপথে।

এদিকে করিডরে আমার অবস্থা তখন সঙীন। যে ষষ্ঠইন্দ্রিয় নিয়ে একটু আগেই এত কথা বললাম, সেই ষষ্ঠইন্দ্রিয়ই বাঁচিয়ে দিল এ-যাত্রা। নইলে এ কাহিনী লেখবার জন্যে হাজির থাকতাম না।

পেছন পেছন অনুগত অনুচর ক-৫ যে ব্ল্যাস্টার চোঙ উঁচিয়ে আমাকেই নিকেশ করতে এগিয়ে আসছে, পেছনে চোখ না থাকলেও ঐ রকম একটা কিছু আঁচ করলাম আমার মজ্জাগত 'প্রিমনিশনে'র দৌলতে। আমার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে, এই রকম একটা লোম-খাড়া-করা অনুভূতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগ্রত হতেই বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখেছিলাম, যমের দক্ষিণ দুয়ার—ব্লাস্টারের চোঙ।

ইলেকট্রনিক ব্রেন আর সময় দেয় নি। ট্রিগার টিপেছিল ক-৫। আমার আদিম অনুভূতি যে আধুনিক যন্ত্রকেও হার মানায়, সেদিন কিন্তু চরম পরীক্ষা হয়ে গেল। চোঙ দেখেই শূন্যে লাফ দিয়েছিলাম। সুপারম্যান যেভাবে শূন্যপথে উড়ে—এ হ'ল সেই ভুবন ভোলানো লাফ।

ফল হ'ল কি? না, ইলেকট্রনিক-ব্রেন চালিত ব্ল্যাস্টার-বর্ষণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। আমি বেমক্কা আছড়ে পড়লাম রাবিশের ওপর। আলগা রাবিশে পা মচকে গিয়ে সবেগে ঠিকরে গেলাম দেয়ালের ওপর। মাথাটা মনে হল চৌচির হয়ে গেল। চাকার ওপর একপাক ঘুরে গেল ক-৫। মু-য়ের দিকে ফিরে বললে জড়িত গলায়—"অপদার্থ খতম—ক-৫ বিকল—নিজেকে মেরামত করার সময় এখন।"

বলতে বলতেই নিভু-নিভু হয়ে এল ক-৫য়ের চক্ষু-পর্দা। ঝুপ করে ঝুলে পড়ল সব কটা অ্যান্টেনা। চাকার ওপর পিছলে গিয়ে দমাস করে ধাক্কা খেল দেওয়ালে—আমার ঠিক পাশটিতেই—আর নড়ল না।

ব্যারিয়ার টপকে এসে মু দেখল আমি আর ক-৫ দুজনেই নট-নড়ন-চড়ন-নট-কিচ্ছু—অবস্থায় পড়ে আছি। আসলে আমি মটকা মেরেছিলাম। বহু পুরোনো রণকৌশল! অনেক ইতরপ্রাণীও এইটুকু বুদ্ধি খরচ করে নিশ্চিত মৃত্যু এড়িয়ে যায়। তা পাঁচ হাজার তিনশ একুশ সালের এই প্রাণীগুলোর কাছে বছরের হিসেবেও তো আমি ইতর প্রাণীর সমতুল্য—

তাই স্রেফ মৃতের অভিনয় করে বেঁচে গেলাম সে যাত্রা।

মু কাছে এল। নির্জীব, নিস্পন্দ, নিঃসাড় প্রাণী এবং যন্ত্র দেহ দুটো দেখে পোঁছে গেল অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তে। অপদার্থ অক্কা পেয়েছে। রোবট নিজেকে মেরামত করছে। মরুক গে। তা নিয়ে মু-য়ের আর মাথা ব্যথার দরকার নেই। কাজ তো হাসিল হয়েছে—গোল্লায় যাক যন্ত্র।

উল্লাস-নিবিড় কণ্ঠে তাই হিসহিসিয়ে উঠল পরক্ষণেই—"সাবাস্! এবার পালা প্রফেসরের।"

হাত নেড়ে ফৌজদের আইসোলেশন ওয়ার্ড দেখিয়ে দিয়ে নিজে অগ্রসর হ'ল সেইদিকে।

প্রফেসরের দেহের মধ্যে "ওরেব্বাব্" বলে হঠাৎ ককিয়ে উঠে মাথার পেছন দিক খামচে ধরলাম আমি—ছুরি আর ব্লাস্টার ঠিকরে গেল হাত থেকে।

হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন প্রফেসর—"কি হল? কি হল? অমন করছ কেন?"

"ধাঁই করে মাথায় কে যেন মারল।······খুলিটা মনে হল চৌচির হয়ে গেল।"

আশ্বস্ত হলেন প্রফেসর—"তাই বল। এখানে কেউ তোমার মাথায় মারেনি—বাইরের মাথায় চোট লেগেছে।"

বাইরের মাথা। সেইটাই তো আমার আসল মাথা! গেল নাকি খুলিটা দু-ফাঁক হয়ে! মহাভাবনায় পড়লাম। তা সত্ত্বেও সাহস দেখিয়ে তাচ্ছিল্য করলাম আঘাতটাকে—"তাই বলুন। আমি ভাবলাম—"

প্রফেসব কিন্তু পরক্ষণেই বিষম উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন—"না, না, অত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কোরোনা। ব্যাপারটা সিরিয়াস। ভুলে যেও না, তোমার আমার দুজনেরই এখানকার পরমায়ু খুব সীমিত। তোমার বাইরের দেহ আর এখানকার দেহ কিন্তু একই কলাতন্তু দিয়ে তৈরী। বাইরের দেহ যদি জখম হয়, ধাক্কা তোমার মধ্যেও পৌঁছোবে। হাড়ে হাড়ে টের পাবে। আর যদি বাইরের দেহটা পটল তোলে—"

হাড় পর্যন্ত হিম হয়ে গেল আমার—"এখনো ছ-মিনিট বাকী, প্রফেসর। কথা বন্ধ করে চলুন যদ্দুর সম্ভব কাজ এগিয়ে রাখি।"

শুরু হল পথচলা। ভাইরাস-জখম জায়গাগুলো কালচে মেরে গেছে। আমি চলেছি সেই চিহ্ন দেখে। সুস্পষ্ট চিহ্ন, তাই চলেছি দ্রুতবেগে। দেখতে দেখতে পেঁছে গেলাম একটা প্রকাণ্ড পাতাল-গুহার মত গহ্বরে। সেতুর মত সংকীর্ণ কলাতন্তু ধনুক-ভঙ্গিমায় বেঁকে উঠে গেছে নিতল গহ্বরের ওপর দিয়ে। কিন্তু মাঝামাঝি গিয়েই স্তব্ধ হয়েছে ব্রীজ। সেতুবন্ধন আর হয়নি—আধাখ্যাঁচরা অবস্থাতেই ঝুলছে শূন্যে। হু-হু বাতাসে মথিত শূন্যস্থান। নিতল গহ্বরের তলদেশ থেকে হুহুংকারে উঠে আসছে দমকা বাতাস।

কণ্ঠস্বর খাদে নেমে এল আপনা থেকেই—"এ কোথায় এলাম প্রফেসর ?"

"আমার মনের একদিক থেকে আর একদিকে যাওয়ার ফাঁক যেখানে—সেইখানে।"

"কিন্তু অপর দিকে তো নিকষ অন্ধকার !"

"অন্ধকার তো থাকবেই। যুক্তি আর কল্পনার ফাঁক যে এটা। একদিক থেকে অপরদিক তো দেখতে পাবে না।"

"কিন্তু সেই হতভাগা কি আছে এখানে ? ওপারে কিছু আছে বলে মনে হয় ?"

"দীননাথ, এই হল গিয়ে মন-মস্তিষ্কের সীমান্ত অঞ্চল। অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস।" দু-হাত দুপাশে ছড়িয়ে বললেন প্রফেসর—"ওদিকে মন, এদিকে মস্তিষ্ক। দুটো একেবারে আলাদা জিনিস—অথচ একই জিনিসের অংশ।"

"সমুদ্র আর ডাঙার মত ?"

খুশী হলেন প্রফেসর আমি বুঝতে পেরেছি, দেখে। বললেন—"ঠিক ধরেছো। এতক্ষণে একটা খাঁটি কথা বলেছো !"

এমনভাবে বললেন, যেন এতক্ষণ ঘাস কাটছিলাম। কিন্তু খোঁচাটা গায়ে মাখলাম না। গভীর খাদের তলদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললাম—"তলা দেখা যাচ্ছে না তো !"

চিন্তান্বিত মুখে নিজের অবচেতন মনের অন্ধকার গভীরে তাকিয়ে থেকে প্রফেসর বললেন—"তা ঠিক। মাঝে মাঝে আমিই আমাকে বুঝে উঠতে পারি না !"

আমার একহাত ধরে সংকীর্ণ সেতুপথে পা বাড়ালেন প্রফেসর। এবার

কিন্তু উনি সামনে। এত ঘাবড়ে গেছি যে পা কাঁপছে। কলাতন্তু-সেতু এত সংকীর্ণ যে পা ফেলার পর যখন দেখছি পা ফেলতে ভরসা হয় না মোটেই—তখন গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসছে। আশপাশ দিয়ে গোঁ-গোঁ করে ধেয়ে যাচ্ছে দামাল বাতাস—হাওয়ায় নিশানের মত উড়ছে পরিধেয়—টানের চোটে বেশ কয়েকবার ভারসাম্য হারিয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। পায়ের তলায় মুখব্যাদান করা তলহীন ভয়ানক গহ্বর যেন আমাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করতে লাগল। কি কষ্টে যে মূর্চ্ছিত হওয়া আটকে রাখলাম, তা আমি জানি আর ঈশ্বর জানেন।

ব্রীজ যেখানে শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হল, সেই পয়েন্টে পেঁছে প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র আর এক কাণ্ড করে বসলেন। বিনা দ্বিধায়, এতটুকু ইতস্ততঃ না করে, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তমিস্রাময় শূন্যে পা রাখলেন এবং এগিয়ে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হলেন নিকষ আঁধারে—দৃশ্যমান রইল কেবল যে হাতখানা আমি আঁকড়ে আছি, সেই হাতখানা। মহা দ্বিধায় পড়লাম আমি। কি করি এখন? জেনে শুনে চোখে দেখার পরেও অজ্ঞাত তিমিরে অদৃশ্য হই কি করে? কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকার ফুরসৎও দিলেন না। হ্যাঁচকা টান পড়ল হাতে। হিড়হিড় করে টানছেন প্রফেসর। অদৃশ্য অবস্থাতেও আমাকে ছাড়তে রাজী নন। কী জ্বালা! কী জ্বালা! শুধু একখানা হাত নিবিড় নিশার চাইতেও রহস্যময় অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে হেঁইও-হেঁইও করে টান মারছে আমাকে—ঐটুকু সরু জায়গায় বাতাসের গোঙানির মধ্যে টলমল করতে করতে কাঁহাতক আর টাগ-অফ-ওয়ারে অংশ নেওয়া যায়! যা থাকে কপালে বলে কষে চোখ বন্ধ করে পা বাড়ালাম নিঃসীম শূন্যতার গর্ভে···

ক্রোনোমিটার দেখলেন কো। বক্ষপঞ্জর চূর্ণ করার মত বিশাল একখানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ডবল সাইক্লোনের মত হু-উ-উ-স করে বেরিয়ে এল দুই নাসিকারন্ধ্র দিয়ে।

বললেন ধরা গলায়—"আর মোটে পাঁচ মিনিট······।"

এমন সময়ে শোনা গেল কর্কশ কণ্ঠের অপার্থিব বিজয়োল্লাস—"খবরদার ডক্টর, একদম নড়বেন না।" দরজার সামনে ব্ল্যাস্টার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে মু।

গাউনের তলা থেকে ব্ল্যাস্টার টেনে বার করার চেষ্টা করেছিল নার্স মেয়েটা। কিন্তু হাজার হোক নারীজাতি তো, ক্ষিপ্রতায় মু হারামজাদার সঙ্গে পারবে কেন। গাউনের তলায় হাত ঢোকাতেই মু ব্ল্যাস্টার নিক্ষেপ করল তাকে লক্ষ্য করে। মুণ্ডহীন নার্সের কবন্ধ লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। কো-য়ের দিকে চোঙ ফিরিয়ে শীতল কণ্ঠে মু বললে—"ছেড়ে দিন প্রফেসরকে।"

নিমেষে চ্যাটা গোবিন্দ হয়ে গেলেন কো—"না! কক্ষনো না!"

মূর্তিমান প্রেতের মত এগিয়ে এল মু। দাঁড়াল ঘাড়বেঁকা ডক্টরের ঠিক সামনে। তিনি শিহরিত হলেন মু-য়ের অমানুষিক মুখচ্ছবি দেখে! বীভৎসতায় ভরে উঠেছে চেনা মুখখানা। চোখ নীলচে অঙ্গার, ভুরু বাচ্চা কেউটে, লালচে কর্কশ লোমে ঢাকা সমস্ত চামড়া। ভাইরাস আক্রমণ ঘটলে অনেক রকম 'র‍্যাশ' ফুটে উঠতে দেখেছেন রুগীর সারা গায়ে। গা চুলকোয়, লাল হয়ে ওঠে, দাগডা দাগড়া অথবা ডুমোডুমো হয়ে ওঠে। কিন্তু এ 'র‍্যাশ' তিনি কখনো দেখেননি। তাই গবেষকের অনুসন্ধানী এবং কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে সূচ্যগ্রচাহনি মেলে নিরীক্ষণ করতে গেলেন বিকটদর্শন ভয়াল মুখখানা।

অমনি সড়াৎ করে বিদ্যুৎ-রেখা মু-য়ের কপাল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে কো-য়ের কপাল স্পর্শ করে লকলকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। মিলিয়ে গেল সেকেণ্ড কয়েক পরেই।

চাপা গজরানির সুরে বললে মু—"ছেড়ে দিন প্রফেসরকে।"

টেনে টেনে জড়ানো গলায় কো বললেন—"গোলাম হাজির, হুকুম তামিল হোক।" দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন প্রফেসরের পাশে, খুলতে লাগলেন প্লাস্টিক ফিতের বাঁধন।

তাড়া লাগাল মু—"জলদি করুন। হুজুরের সঙ্গে এখুনি কথা বলা দরকার।"

ভাইরাস-সংক্রামিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়েছিল কো-য়ের কাণ্ডজ্ঞান—আনুগত্য সমর্পিত হয়েছিল ভাইরাস-সেবকদের চরণে। তাই মু-য়ের কথার জবাব দিলেন এইভাবে—"না। দাঁড়াও। হুজুর বিপদে পড়েছেন।"

"কী?" দাঁত খিঁচিয়ে হিংস্র নেকড়ের মত গর্জে উঠল মু।

যেন হেঁচকি তুলে তুলে বললেন কৌ—"মাইক্রো-ক্লোন কপি ব্রেনের মধ্যে ইঞ্জেকশন করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে একটু আগে হুজুরকে খুঁজে বার করে ধ্বংস করার জন্যে। যদি সফল হয় ওদের অভিযান—"

"হবে না! ভণ্ডুল করতেই হবে ওদের অভিযান!

আমতা আমতা করে কৌ বললেন—"কিন্তু সময় আর নেই—ওদের আটকানোও যাবে না।"

"আটকাতেই হবে! আমি বলছি আটকাতে হবে!" বজ্রহুংকারে ঘর কাঁপিয়ে বলল মু।

বাইরের করিডরে ঠিক সেই সময়ে ঘটল আর একটা অঘটন।

ক-৫ য়ের ইলেকট্রনিক ব্রেন 'টিউন' করা ছিল কৌ-য়ের ব্রেনের সঙ্গে। অনুগত অনুচর তো। তাই মনিবের বিপদে অ্যালার্ম সংকেত দেখা দিত তার ব্রেনেও। ব্যবস্থাটা কৌ-য়ের। সার্কিটের মধ্যে নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ঢুকিয়ে রেখেছিলেন।

কৌ যখন গোলাম বনে গেল ভাইরাসের, ঠিক তখনি সম্বিৎ ফিরে এল ক-৫'য়ের। অমনি সচল হ'ল জটিল ইলেকট্রনিক ব্রেন। ব্রেনের মধ্যে স্ক্রীনে ফুটে উঠল 'আইসোলেশন ওয়ার্ডের ভেতরের দৃশ্য। কৌ যে আর মানুষ নন, তা জানা হয়ে গেল পলকের মধ্যে। মানুষদের সেবা করার জন্যেই রোবটদের সৃষ্টি—অমানুষদের নয়। যান্ত্রিক মস্তিষ্কে তাই আর অমানুষ কৌ-য়ের প্রতি কোনো আনুগত্য রইল না।

আমি মটকা মেরে পড়ে থেকে দেখলাম আবার অ্যান্টেনা খাড়া হয়ে গেছে ক-৫'য়ের, দপ দপ করে জ্বলছে নিভছে চক্ষু-স্ক্রীন- -রোবটদের ভাবাবেগ থাকলে বলতাম, শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

কিন্তু তা তো নয়। চক্ষের নিমেষে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে নিয়ে কর্তব্য স্থির করে ফেললে ক-৫। গড় গড় করে চাকার ওপর গড়িয়ে এসে একটা অ্যান্টেনা ছোঁয়ালো আমার কপালে।

আমি মটকা মেরে পড়েই রইলাম। বেঁচে আছি জানলে ক্লোজ-রেঞ্জে ব্ল্যাস্টার ছুঁড়লে আর কি বাঁচব?

কপালে মুখে অ্যান্টেনা বুলিয়ে সুড়সুড়ি দিতে দিতে ক-৫ বললে যথাসম্ভব কোমল যান্ত্রিক কণ্ঠে—"প্রভু!"

আমি নড়লাম না। যন্ত্র আর কুকুরকে আমি বিশ্বাস করি না।

ক-৫ তখন একটা বিচ্ছিরি নষ্টামি করে বসল। কোনো কলের কুকুরের পক্ষে কাজটা সমীচীন নয়। অ্যান্টেনার সরু ডগাটা নাকে ঢুকিয়ে সুড়-সুড়ি দিতেই ভীষণ জোরে হেঁচে ফেললাম।

অমনি অ্যান্টেনাটা নাক থেকে বার করে নিয়ে কপালে মৃদু ইলেকট্রিক কারেণ্ট চার্জ করল ক-৫। চনমনে হয়ে গেল মস্তিষ্ক। তড়াক লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। তেড়েমেড়ে বললাম—"আগে বলো আমাকে টিপ করে ব্ল্যাস্টার ছুঁড়েছিল কেন?"

"বাধ্য হয়েছিলাম বলে। সাময়িকভাবে আমার শক্তির ওপর আরো জোরালো একটা শক্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমার ইচ্ছের সার্কিটগুলো গোলমাল হয়ে গেছিল। নতুন শক্তি উৎপাদন করে নিয়েছি। হুকুম করুন। তামিল করব।"

"শত্রুগুলো গেল কোন্ চুলোয়? প্রফেসরকে পেয়েছে?"

বিষণ্ণ কণ্ঠে ক-৫ বললে—"পেয়েছে। ডক্টর কো ভাইরাস-সংক্রামিত হয়েছেন। নার্সকে মেরে ফেলেছে।"

"বলো কী! এখন কি করছেন ডক্টর?"

"মু-কে ক্লোন করছেন। প্রফেসরের ব্রেনে তাকে ইঞ্জেকশন করে ঢুকিয়ে দেবেন।"

আইসোলেশন ওয়ার্ড অভিমুখে ধাবিত হলাম নক্ষত্র বেগে—"আটকাতেই হবে ডক্টরকে।"

রেলগাড়ীর মত ফুলস্পীডে পেছন পেছন আসতে আসতে ক-৫ বললে —"ও কাজ করবেন না।"

"কেন?"

"প্রফেসরের মাইক্রো-ক্লোন ভাইরাস-হুজুরকে ধ্বংস করতেও তো পারেন —সময়টা দেওয়া দরকার। এখন বাগড়া দেবেন না। ধৈর্য ধরুন।"

সঙ্কীর্ণ সেতুর অপর দিক বরাবর প্রফেসরের ঠিক পেছনেই দেখতে পেলাম আমাকে। হিড়হিড় করে গায়ের জোরে টেনে নিয়ে চলেছেন। রোগাপটকা শরীরটায় যেন ম্যামথ-হস্তীর বল এসেছে। একটু আগেই দুশ্চিন্তায় ভুগছিলাম কোথায় যাচ্ছি দেখতে না পাওয়ায়। এখন ঠিক উল্টো

ব্যাপারটাই ঘটেছে ! কোত্থেকে এলাম, পেছনকার সেই দৃশ্য কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। বেমালুম অদৃশ্য ! বাতাস পুনরুদ্যমে আবার লক্ষ ফণা বাসুকির মত ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছে আশপাশ দিয়ে। যাকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না—সেই বাতাসের নিঃশ্বাসে যে এত গোঙানি, এত গজরানি থাকতে পারে, এ অভিজ্ঞতাও হ'ল সেই মুহূর্তে। প্রচণ্ড ঝাপটায় মাঝে মধ্যে মনে হচ্ছে চরণ যুগল বুঝি স্খলিত হয়ে শূন্যে ঠিকরে যাবে। বিশাল খাদের অপর প্রান্ত চক্ষুগোচর হচ্ছে না একেবারেই—আদৌ হবে কিনা সে সন্দেহও উঁকিঝুঁকি মারছে মনের মধ্যে। প্রফেসরের মন তো—তল পাওয়া কঠিন—এত বিশাল এর অবচেতন অঞ্চল যে এপার-ওপার দেখাও মুস্কিল।

"কিহে ছোকরা, এখন কেমন লাগছে ?" পরমোল্লাসে হেঁকে উঠলেন প্রফেসর—যেন হাওড়ার পোলে হাওয়া খাচ্ছেন।

দম আটকানো স্বরে বললাম—"দারুণ !"

সগর্বে চারপাশ দেখলেন প্রফেসর। হিমালয়-প্রতিম নিরেট খাড়াই তমিস্রা-গিরি-প্রাচীর সামনে। তমিস্রা মাথার ওপর এবং পায়ের নিচেও। যে দিকে তাকাই, সেইদিকেই।

সোল্লাসে ফের বললেন উনি—"অপূর্ব ! অপূর্ব ! মন-মস্তিষ্কের কি আশ্চর্য সীমান্ত অঞ্চল ! কোনো চিন্তার আলোড়ন সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই এখানে···শান্ত···নিস্তব্দ···নিস্তরঙ্গ ! অহো ! অহো !"

শান্ত ! নিস্তব্দ ! নিস্তরঙ্গ ! হু-হু বাতাসে অধীর এই শূন্যতার কপালে অবশেষে এই বিশেষণ ? ভদ্রলোকের বাংলা ব্যাকরণে দখল দেখছি আমার চাইতেও কম !

কাষ্ঠহেসে বললাম—"চলেছি কোথায় ?"

"স্বপ্ন আর কল্পলোকের আশ্চর্য রাজ্যে——"

হাতে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ নিয়ে প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রের ত্রিভঙ্গ-মুরারি শায়িত বপুটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন ডক্টর কো। সিরিঞ্জের মধ্যে বর্ণহীন তরল পদার্থের ভেতরে রয়েছে মু-য়ের মাইক্রো-ক্লোন দেহ। প্রফেসরের মাথায় অতি সন্তর্পণে তরল পদার্থটা ফুঁড়ে ঢুকিয়ে দিলেন ডক্টর······

প্রফেসরের বিকৃত ব্যাদিত মুখগহ্বর থেকে তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে এল ভয়াল ঘর্ঘরে চিৎকার—"তাড়াতাড়ি ! তাড়াতাড়ি ! ওরা যে কাছে এসে গেল ! তাড়াতাড়ি ! তাড়াতাড়ি ! তাড়াতাড়ি !"

ভাইরাস-হুজুরের আতংক-বিকৃত কণ্ঠস্বরের তাগিদ তাড়িয়ে নিয়ে চলল মন-কে প্রফেসরের ব্রেনের মধ্যে দিয়ে। নিউরন কলাতন্তুর কালচে মেরে যাওয়া ছিন্ন ফাঁকটার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ বেগে ধেয়ে গেল রন্ধ্রপথে এবং ক্ষণপরেই আত্মবিস্মৃত উন্মাদের মত বেপরোয়াভাবে ছুটল বায়ুবিক্ষুব্ধ সঙ্কীর্ণ সেতুর ওপর দিয়ে···

ইতিমধ্যে আমি আর প্রফেসর একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ঠিক যেন কালো, চকচকে পাথরের গিরিগুহা।

"প্রফেসর, এই কি আপনার স্বপ্নের দেশ ?"

"সেইদিকেই তো চলেছি···"

শেষ হল সুড়ঙ্গপথ। আমরা বেরিয়ে এলাম একটা উন্মুক্ত অঞ্চলে। না, পুরোপুরি খোলা জায়গা নয়। সুবিশাল একটা গহ্বর—এত প্রকাণ্ড যে হাজারটা বিজাপুর-গোলগম্বুজ তার মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। অতিকায় রজতশুভ্র স্তম্ভ হারিয়ে গেছে দৃষ্টিপথের বাইরে।

কাছেই, গহ্বরের মেঝের ওপর, রয়েছে একটা পিণ্ডিপাকানো পাথুরে মৌচাক। এ অঞ্চলে অদ্ভুতদর্শন বস্তুটা একেবারেই খাপছাড়া—বিকৃত এবং সৃষ্টিছাড়া।

হঠাৎ খুব শান্ত হয়ে গেলেন প্রফেসর। এতক্ষণের এত উত্তেজনা নিমেষ মধ্যে তিরোহিত হল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মুখাবয়ব থেকে। নিমীলিত নয়নে অদ্ভুত পিণ্ডটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন ধীর স্থির প্রশান্ত কণ্ঠে—"এই সেই উৎপাত !"

আমার অবস্থা হল কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। চরম মুহূর্তে প্রফেসর শান্ত হয়ে যান, আমি হই অশান্ত। প্রফেসরকে এবার টেনে হিঁচড়ে আমিই ছুটলাম আগন্তুক উৎপাতের দিকে—যে উৎপাত উনিশ শো একাশি সাল থেকে জীবন দুর্বিসহ করে চলেছে আমাদের।

কাছাকাছি আসতেই অযুত রন্ধ্রময় শিলাখণ্ডের মধ্যে একটা নড়াচড়া লক্ষ্য করলাম। জীবন্ত কিছু একটা সঞ্চরমান রয়েছে পাথরের মধ্যে।

চকিতে দেখলাম আছড়ে-পড়া কয়েকটা শুঁড়—আর একটা ইলেকট্রিক বাল্বের মত বড় গোলাকার হাড়-হিম-করা অশুভ চক্ষুর দ্যুতি।

সঘন নিঃশ্বাস নিয়ে বললাম চাপাগলায়—"সাপের চোখেও এত জিঘাংসা নেই, প্রফেসর।" বলে, একটু কানখাড়া করলাম। পরক্ষণেই বেগে পেছন ফিরে বললাম নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে—"ফাঁদে পড়েছি। পেছনে আসছে আর এক উৎপাত।"

১৬ ।। ভাইরাস-হুজুর

বিপদের মুহূর্তে আমি অশান্ত হই অ্যাড্রেন্যালিন হরমোন-ক্ষরণ বৃদ্ধি পায় বলে। তখন হাতে-পায়ে আকাশের বিদ্যুৎ খেলে যায়। বড়াই করছিনা—পঙ্গপাল-সম ভাইরাস-গোলামদের সঙ্গে আমার মাস্টার প্রিন্টের লড়াই তার প্রমাণ।

আমার ক্লোন-কপিও কম যায় না। পেছনে আর এক উৎপাতের ধাবমান পদধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হতেই হুঁশিয়ার করলাম প্রফেসরকে এবং পরক্ষণেই তাঁর বাক্য নিঃসরণ ঘটবার আগেই ভ্যামুক্ত শায়কের মত ধাবিত হলাম ফেলে আসা সুড়ঙ্গ অভিমুখে—হাতে যুগপৎ উদ্যত রইল ব্ল্যাস্টার এবং ছুরিকা।

প্রফেসর সে দিকে দৃকপাতও করলেন না। ওঁর সমস্ত সত্তা তখন কেন্দ্রীভূত হয়েছে হারামজাদা উৎপাতের কিম্ভূতকিমাকার আলয়ের দিকে। এই সেই গোপন আলয়, যেখানে ঘাপটি মেরে থেকে বেটাচ্ছেলে এতদিন নাজেহাল করে তুলেছে তাঁকে। মাইক্রো-ক্লোন আকারে তাকে অন্বেষণ করার দুরূহ অভিযানে ব্রতী না হলে কস্মিনকালেও তার হদিশ পেতেন না—আমৃত্যু গোলাম হয়ে হুকুম তামিল করে যেতে হত। ভয়ংকর মহাঘোর সেই করাল আততায়ীর সম্মুখীন হয়ে পশ্চাতে আগুয়ান বিপদ বিস্মৃত হলেন তিনি। আমিও আর তাঁকে টানাহ্যাঁচড়া করলাম না। একাই ছুটে গেলান সুড়ঙ্গ অভিমুখে।

সুগভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে চঞ্চল পদক্ষেপে বিদঘুটে ভাইরাস-আলয়ের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন প্রফেসর। শত্রুর মোকাবিলা করার সময় এবার এসেছে। কাছে আসতেই লক্ষ্য করলেন, পিণ্ডাকৃতি মৌচাকের অসংখ্য ফুটো আর খাঁজ খোপের মধ্যে অদ্ভুতদর্শন একটা জীবন্ত প্রাণী নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছে—পুরো মৌচাক যেন তার একার দখলে—রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার

নিশানা মিলছে। লক্ষ্য করলেন একটা শুঁড় দুলছে। চকচকে ভিজে ভিজে লাল মাংসের শুঁড়। আর লক্ষ্য করলেন, ইলেকট্রিক বাল্বের মত একটা কৃষ্ণকায় চক্ষু প্রত্যঙ্গ—এদিকে ওদিক দুলে খুঁজছে তাঁকে। এই-টুকুই দেখেই প্রফেসর অনুমান করে নিলেন পৃথিবীর কোনো নৈশ-দুঃস্বপ্ন দিয়েও কল্পনা করা কঠিন অপার্থিব এই প্রাণীটার দেহাকার। শুধু একটা শুঁড় আর চক্ষু মেলে ধরেই আপাততঃ সে ক্ষান্ত বটে, প্রয়োজন হলে অযুত রন্ধ্রপথে ধেয়ে আসতে পারে আরও অনেক অজ্ঞাত দুঃস্বপ্নসম আকৃতি।

আমি হ'লে এমতাবস্থায় স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান থাকতাম। কিন্তু ভিন্ন ধাতুতে নির্মিত প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র। তাই অব্যাহত রইল অগ্রগতি। অচঞ্চল চরণে অগ্রসর হয়ে দাঁড়ালেন শিলাস্তূপের সামনে। হেঁকে বললেন—"কে আছো হে ভেতরে! নাম কি তোমার?"

এ রকম একটা উত্তেজনাময় মুহূর্তে, জীবন নিয়ে যেখানে টানাটানি চলছে, সেখানে এই ধরনের সংলাপ শোভন কেবল প্রফেসরের পক্ষেই।

শিলাখণ্ডে ঘাপটি মেরে থাকা বিটলে বোধহয় এই জাতীয় অকুতোভয় বিশ্রম্ভালাপের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই ক্ষণকাল নীরব রইল।

আবার অমায়িক কণ্ঠে আপ্যায়ন জানালেন প্রফেসর—"ভয় কি? আমি তো নিরস্ত্র।"

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। বিভিন্ন রন্ধ্রে বার কয়েক উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল বেশ কয়েকটা টকটকে লাল মাংসের লিকলিকে শুঁড়। মিশ-কালো গোলক-চক্ষুটা উপর্যুপরি কয়েকবার নিষ্প্রভ এবং সপ্রভ হল। অদ্ভুত গাঢ় দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল সেই গোলক চক্ষুর সমতুল্য চক্ষু প্রফেসর তাঁর বহু আশ্চর্য অভিযানে বেরিয়েও কখনো দেখেননি।

তারপর যেন গভীর জলের মধ্যে বুদবুদ কাটল সশব্দে। ঢক্-ঢক্ ঘট্-ঘট্ ঘর্ঘরে গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল উদ্ধত ভঙ্গিমায়—"আমি হুজুর! আমিই কেন্দ্রিন! আমি সহস্রজ্যোতি! আমি কালকূট গরল! আমার কটুগন্ধে বিশ্বলোক মূর্চ্ছিত হয়! আমি অতুল তেজা! আমি অপ্রতিহতবীর্য! আমি—"

"থামো! থামো!" ভাইরাস-হুজুরের আত্মম্ভরিতা প্রথমবার শ্রবণ করার সৌভাগ্য হয়নি প্রফেসরের, তখন তিনি সমাধিস্থ ছিলেন। এখন শুনে কান ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল। কড়া গলায় দাবড়ানি দিয়ে বললেন—"তুমি যেই

হও না কেন, অনধিকার প্রবেশ করেছো, আমার অবচেতন মনের শান্তি নষ্ট করেছো, আমার বিপাকক্রিয়া বিঘ্নিত করেছো।" একটু বিরতি দিলেন প্রফেসর। তারপর বললেন—"কেন্দ্রিন বললে তুমি। কিসের কেন্দ্রিন শুনতে পারি?"

"ঝাঁকের কেন্দ্রিন।"

"কিসের ঝাঁক?"

"আমার গোলামদের! আমার তেজঃপুঞ্জের কেন্দ্রিন! আমি আত্ম-তেজে যাদের সৃষ্টি করে চলছি, তাদের কেন্দ্রিন! আমি সর্বসংহারক আবার আমিই সৃষ্টিকর্তা! আমার বশংবদ গোলামদের মহাপ্রভু কেন্দ্রিন আমিই! আমি প্রসন্ন থাকলে তোমার মঙ্গল হবে।"

"বটে! বটে! তা কেন্দ্রিন মহাপ্রভু, এত জায়গা থাকতে আমার ব্রেন-টাকে তোমার পছন্দ হ'ল কেন?"

"তোমার ধীশক্তির জন্যে।"

"তা ঠিক! তা ঠিক! কিন্তু আমার মস্তিষ্ক দখল করার তোমার কোনো অধিকার আছে কী?"

"আছে বৈকি!"

"তোমার মত অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বালখিল্যের কোনো অধিকারই নেই আমার—"

উগ্রকণ্ঠ এবার বজ্রকণ্ঠে পরিণত হল—"আমি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ! আমি বালখিল্য! রে রে মূঢ়! আমার কোপানলে সহস্র উল্কাপাত হয়, প্রলয়-কালীন অতি ভীষণ মেঘের মত ঘনাবলী মুষলধারে রক্তবৃষ্টি করতে থাকে, নভোমণ্ডল প্রকম্পিত হয়। অহঙ্কার পরতন্ত্র হয়ে আমাকে পরিহাস বা অবমাননা করতে যেও না। আমি খর্বাকৃতি এবং নিরাহার হলেও বজ্র-স্বরূপ এবং কোপনস্বভাব!"

"সাধু! সাধু!" পটাপট শব্দে হাততালি দিলেন প্রফেসর—"আপাততঃ তুমি গোষ্পদে আসীন হয়েছো এবং দুর্বলও হয়েছো। সুতরাং আবার বলছি, আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করার কোনো অধিকার তোমার নেই। এ মস্তিষ্ক তোমার মত দস্যুর উপযুক্ত নয়।"

লক্ষ ভুজঙ্গ ফণাবিস্তার করল যেন লক্ষ রন্ধ্রপথে। বিষমক্রোধে মৌচাক সদৃশ শিলাখণ্ড নৃত্য করে উঠল তাথৈ তাথৈ ছন্দে—"রে রে পাপিষ্ঠ!

ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটা প্রাণীর অধিকার আছে নিজেকে টি‍ঁকিয়ে রাখার, বংশ-বৃদ্ধি করার, নিজের প্রজাপতিকে অক্ষয় রাখার···ঠিক এই ভাবেই তোদের পৃথিবীর আদিম প্রজাতিরা অস্তিত্ব রক্ষা করেছে নিজেদের। আমিও তাই। আমি ছিন্ধি, ভিন্ধি, প্রধাব, ঘাতয়, পাতয়, মারয় তত্ত্বে বিশ্বাসী।"

মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হল প্রফেসরের—"কি তত্ত্ব ?"

"ছিন্ধি, ভিন্ধি, প্রধাব, ঘাতয়, পাতয়, মারয়।"

"সেটা আবার কী ? বৈজ্ঞানিক, না দার্শনিক তত্ত্ব ?"

"বাঁচার তত্ত্ব।"

"মানেটা কী ?"

"ছেদন কর, ভগ্ন কর. বেগে দৌড়ে অগ্রসর হও, আঘাত কর, পাতিত কর, বধ কর !"

"এ তো দেখছি রণনীতি !"

"চিরন্তন রণনীতি ! বেঁচে থাকার নীতি। আমি আদিম, আমি ত্রিকাল, আমি—"

"শোনো, শোনো তোমার নীতিই তোমাকে শোনাই। বেঁচে থাকার অধিকার তোমার যেমন আছে, আমারও তেমনি আছে, ঐ ছিন্ধি ভিন্ধি না কি যেন ছাই বললে—ও নীতি আমারও আছে। টি‍ঁকে থাকার তাগিদে তোমাকেও আমি ছিন্দি ভিন্ধি করতে পারি তো ?"

"সহস্রবার পারো। অস্তিত্ব রক্ষার নীতিই একমাত্র নীতি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে !"

ছপাং করে একটা চাবুকের মত শুঁড় আছড়ে পড়ল প্রফেসরের গণ্ড-দেশে। হাত বুলিয়ে নিয়ে উনি দেখলেন গাল কেটে গেছে রক্ত ঝরছে।

ঠাণ্ডাগলায় বললেন—"ভারী অন্যায়।"

গর্জে উঠল জিঘাংসাপুঞ্জিত কণ্ঠস্বর—"সময় তোমার ফুরিয়ে আসছে। আমাকে নিকেশ করার ক্ষমতা তোমার নেই। নিরস্ত্র তুমি—কয়েক মিনিটের মধ্যে তোমার নিজের অস্তিত্বও থাকবে না।"

নীরব রইলেন প্রফেসর। সেই অবসরে আবার কান ঝালপালা করা আত্মপ্রশস্তি শুরু করল কেন্দ্রিন মহাপ্রভু।

"আমি অবধ্য ভাইরাস। ঝাঁকের হুজুর। কোটি কোটি বছর সুপ্ত থেকেছি, গুপ্ত থেকেছি মহাশূন্যে। উপযুক্ত বাহকের প্রতীক্ষায় থেকেছি

মহাকালের গর্ভে——”

আর সহ্য করতে পারলেন না প্রফেসর। ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—“বাহক মানে ? আমি কি মুটে ?”

কর্ণপাত করল না ভাইরাস-হুজুর—“মানুষ এখন কি করছে ? ঝাঁকে ঝাঁকে নিজের প্রজাতি পাঠিয়ে দিচ্ছে মহাকাশে—উপনিবেশের পর উপনিবেশ সৃষ্টি করে গ্রহে গ্রহে বিজয়কেতন উড়িয়ে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে নিজেদের —দিকে দিকে বাজছে তাদের জয়ডংকা—আধিপত্য বিস্তারে অনন্যমন আজকের মানুষ। আমারও তাই অধিকার আছে পরদেশলোভী এই মানুষকে জয় করার, গোলাম বানিয়ে রাখার। নক্ষত্রে নক্ষত্রে যারা হানা দিয়ে ছায়াপথের পর ছায়াপথ দখল করে চলেছে, আমার অধিকার আছে আমারই ঝাঁক দিয়ে তাদের পদানত করে রাখার।”

রাগ সামলে নিয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখলেন প্রফেসর। বললেন—“মানুষ তো বাইরের দুনিয়া দখল করছে, কিন্তু তুমি যে বাইরের আর ভেতরের দুটো দুনিয়াই দখল করার প্ল্যান করেছো। সূক্ষ্মজগৎ থেকে আরম্ভ করে স্থূলজগৎ—সবই অধিকারে আনতে চাইছো। সেটা কি ঘোরতর অন্যায় নয় ?”

“ন্যায় অন্যায়ের বিচার অস্তিত্ব রক্ষার রণকৌশলে ঠাঁই পায় না। তোমাদের কৃষ্ণ কি করেছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ? আমিও বহুকাল প্রতীক্ষায় থেকেছি। মহাশূন্যের করাল শীতল নিঃসীমতায় কালক্ষেপ করেছি, মনুষ্য-জাতির প্রতীক্ষায় নিযুতবর্ষ অতিবাহিত করেছি। সময় হয়েছে নিকট—এখন শুধু মহাকাশ নয়, মহাকাল-ও আমার হাতের মুঠোয় !”

“মহাকাল তোমার হাতের মুঠোয় ? কিভাবে ?”

“নির্বোধ ! তুমিই সেই মহাকালপতি ! তুমিই এ যুগের এবং বহুযুগের টাইম-লর্ড ! সময়-পথ তোমার পায়ের তলার ! টাইম-মেশিন তোমারই আবিষ্কার !”

“টাইম-মেশিন !”

“হ্যাঁ, টাইম-মেশিন ! তোমার মধ্যে দিয়েই, তোমার ব্রেনের মধ্যে দিয়ে, তোমার টাইম-মেশিনের দৌলতে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের একচ্ছত্র অধিপতি হব আমি—ভাইরাস-হুজুর, সময়াধিপতি, মহাভয়ংকর—”

মনস্থির করে ফেললেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র। কবন্ধ-কলেবর ক্রূর-

শিরোমণি এই সর্বনাশকে নিপাত করতে হবে—আর দেরী নয় !

সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথের গাঢ় অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বেশ কিছুক্ষণ ওৎ পেতে রইলাম আমি। উদ্যত রইল ছুরি আর ব্ল্যাস্টার দু-হাতে। শিহরিত হল প্রতিটি লোমকূপ। অণুপরমাণু দিয়ে অনুভব করলাম আগুয়ান আততায়ীর অস্তিত্ব। সে আসছে···সে আসছে···সে আসছে !

সহসা দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হল একটা নরাকৃতি মূর্তিমান আতংক। সঙ্গে সঙ্গে যেন গাণ্ডীবের টংকার জাগ্রত হ'ল হাতে পায়ে—ঐরাবত গতিবেগে ধেয়ে গেলাম সেদিকে !

কিন্তু পরক্ষণেই বিষম আতংকে পেছিয়ে এলাম ক্যাঙারু লাফ মেরে। একী দেখছি সামনে ? দূর থেকে যাকে নর-কলেবরে মূর্তিমান দানো বলে মনে হয়েছিল—কাছাকাছি আসতেই দেখলাম তার সর্বাঙ্গ ছেয়ে গেছে দ্রুত স্পন্দিত শ্বেতদেহী ফ্যাগোসাইটে। মু। মু-য়ের একী হাল হয়েছে ? চেনা যায় না। আপাদমস্তকে ফ্যাগোসাইটদের বোঝা নিয়েও সে অগ্রসর হচ্ছে কেবলমাত্র উন্মত্ততার বলে বলীয়ান হয়ে—হলফ করে বলতে পারি, এ-অবস্থায় কোনো সুস্থ প্রাণীর পক্ষে একপদ অগ্রসর হওয়াও সম্ভব ছিল না। আমি কি পেরেছি ? ভূলুণ্ঠিত হয়েছিলাম। আর্ত চীৎকার করেছিলাম। প্রফেসর ফলস অ্যালার্ম না দিলে নিশ্চিহ্ন করে দিত আমাকে দুর্ধর্ষ ফ্যাগোসাইট ফৌজ।

অভিভূত হয়ে রইলাম তাই ভাইরাসের সংক্রমণ মহিমা দেখে।

কিন্তু তা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। সহসা আমাকে আবির্ভূত হতে দেখে থমকে গিয়েছিল মু। পরমুহূর্তেই ঝেড়ে ফেলেছিল ক্ষণিকের দ্বিধা। চারদিক থেকে সেঁটে থাকা ফুলে-ফুলে ওঠা ফ্যাগোসাইট নাছোড়-বান্দাদের পিণ্ডির মধ্যে দিয়েই হাতের ব্ল্যাস্টার উদ্যত করেছিল আমার দিকে।

ব্যস, তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হল আমার প্রতিবর্তী ক্রিয়া। ফের চালু হয়ে গেল হাত আর পায়ের ডায়নামো। ঠিক সেই সময়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় ব্ল্যাস্টার বর্ষণ করল মু। কিন্তু আমার বডিতে তখন ফোর-ফর্টি ভোল্টকেও ম্লান করে দেওয়ার মত ইলেকট্রিক কারেণ্ট বইছে। চক্ষের নিমেষে গোঁৎ খেলাম মেঝের ওপর। ভূতল আশ্রয় করে লম্বমান অবস্থাতেই উপর্যুপরি

ব্ল্যাস্টার-নিক্ষেপ করলাম শরীরী বিভীষিকাকে লক্ষ্য করে ।

এত নিকট থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ব্ল্যাস্টারের প্রতিটি তেজ-গোলক শূন্যে বিলীন করে দিল মু-য়ের এক-একটা দেহাংশ। আমি আর শেষ দেখার জন্য সময় ব্যয় করলাম না। ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে পবনবেগে ফিরে এলাম প্রফেসরের সমীপে।

উল্লাস-মন্থর কণ্ঠে তখন বিজয়-ভাষণ সমাপ্ত করছে ভাইরাস-হুজুর —"প্রফেসর, অতএব প্রণিধান করে দেখো, আমার এই অপ্রতিহত ঝাঁকের সঙ্গে পারবে কেন তোমাদের মত নশ্বর ক্ষুদ্র প্রাণীরা ? আমরাই এখন মহাকাশ, মহাকাল, মহাবিশ্বের একমাত্র নবীন অধিপতি। ভীমরুলের চাক হবে এই ঘাঁটি—আমাদের দপ্তর ।"

"নবীন অধিপতি ?" বঙ্কিমকণ্ঠে বললেন প্রফেসর—"আমার সাহায্য পেলে তবেই তো !"

"তোমার সাহায্য তো পাবই হে কীটাণুকীট ! তোমার এখানকার সময় তো ফুরিয়ে এসেছে। কথার জাল মেলে এতক্ষণ সময় নষ্ট করলাম তো ঐ জন্যেই ! ফাঁদে পা দিয়েছো হে গর্দভ। দেখছো না এরই মধ্যে তোমার অস্তিত্ব শেষ হতে চলেছে ?"

মুখে হাত বোলালেন প্রফেসর। চামড়া যেন হাতে ঠেকল না—এত পাতলা কাগজের মত ফিনফিনে। অনুভব করলেন, ফাটল আবির্ভূত হচ্ছে সর্বাঙ্গে। সভয়ে স্মরণ করলেন, সীমিত পরমায়ুর নিছক একটা কার্বন কপি তিনি। চৈতন্য জাগ্রত হ'ল কিন্তু বড় দেরীতে…বড় দেরীতে ! আরব্ধ কর্ম সমাপন করার আগেই ফুরিয়ে এল পরমায়ু……

ঠিক এমনি একটা সংকটজনক শ্বাসরোধী নাটকীয় মুহূর্তে হনুমান জনক পবনদেবের গতিতে সোঁ সোঁ করে ছিটকে বেরিয়ে এলাম আমি। প্রবেশ করলাম কল্পনাতীত প্রকাণ্ড গম্বুজ-গহ্বরে। আমাকে দেখেই আর্ত চীৎকার করে উঠলেন প্রফেসর—"দীননাথ ! দীননাথ ! ব্ল্যাস্টার আমাকে দাও !"

ব্ল্যাস্টার হাতেই ছিল। কাছে গিয়ে দেওয়ার মত সময়ও আর নেই তখন। দূরে থেকেই ছুঁড়ে দিলাম তাঁর দিকে। বুড়োর হাড়ে যেন ভেল্কী খেলে গেল শেষ মুহূর্তে। ক্রিকেট-টেস্টেও অমন দর্শনীয় ক্যাচ কেউ

দেখেনি। শূন্যপথেই খপ্ করে ব্ল্যাস্টার লুফে নিয়ে স্প্রিংয়ের মত ঘুরে গেলেন বুড়ো বৈজ্ঞানিক এবং-বর্ষণ করলেন শিলাখণ্ডের দিকে।

ভাইরাস-হুজুর তখন প্রস্তর-আলয় চৌচির করে বেরিয়ে আসছে বাইরে। যেন স্ফটিক-পিণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে ভেতরকার প্রচণ্ড প্রচাপে। পালানোর ফিকির এঁটেছে শয়তান শিরোমণি। চক্ষুগোলক হুতাশন-গোলকের মতই দপ্ দপ্ করছে প্রফেসরের সংহার মূর্তি দেখে!

প্রফেসর তখন অস্তিত্বের শেষ পর্যায়ে পেঁাছেছেন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছে থর থর করে। নিস্তেজ হয়ে এসেছে দুই চক্ষুর হীরক দ্যুতি। সেই অবস্থাতেই চৌচির-হয়ে-আসা প্রস্তর-আলয় লক্ষ্য করে দেহের সর্বশক্তি দিয়ে ব্ল্যাস্টার নিক্ষেপ করে বুকফাটা হাহাকার করে উঠলেন শেষবারের মত—"দূর হ'! দূর হ'। দূর হ' আমার ব্রেন থেকে!" ব্ল্যাস্টার খসে পড়ে গেল হাত থেকে। টলমল করে উঠলেন প্রফেসর। লুটিয়ে পড়লেন ভূতলে।

দৌড়ে এসে নতজানু হয়ে বসলাম তাঁর পাশে। আমার দেহও তখন বিশুষ্ক এবং দ্রুত ফেটে ফুটে চলেছে। সর্বাঙ্গে আবির্ভূত হচ্ছে ছোট বড় অজস্র ফাটল। গা হাত-পা চড়-চড় করছে। বেশ বুঝছি, অনাবৃষ্টিতে বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রদাহে মেদিনী-পৃষ্ঠ যেমন ফেটে চৌচির হয়ে যায়, আমার অবস্থাও হচ্ছে তথৈবচ। সেই সঙ্গে অনুভব করছি ভয়ংকর পরিণতিটা—আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছি আমিও—চলচ্চিত্রের রুপোলী পর্দায় ছায়াছবি যেমন ফেড-আউট হয়ে একটু একটু করে মিলিয়ে যায় অনস্তিত্বের গর্ভে—আমার অবস্থাও হচ্ছে হুবহু সেই রকম। তা সত্ত্বেও রুদ্ধশ্বাসে আর্তকণ্ঠে বিষম উত্তেজনায় যেন শ্মশান-ক্রন্দন করে উঠলাম তাঁর কানের কাছে—"প্রফেসর! প্রফেসর! বিদেয় হয়েছে কি হারামজাদা?"

অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন প্রফেসর। ভীমরুলের চাকের মত শিলাখণ্ড তখন শতধাবিদীর্ণ—খণ্ড খণ্ড আকারে প্রক্ষিপ্ত চারিদিকে এবং অংশগুলো অবিশ্বাস্য বেগে রেণু রেণু হয়ে গিয়ে পরিণত হচ্ছে কৃষ্ণধূলিতে। কালো ধুলো উড়ছে, ধীরে ধীরে থিতিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ধূলির মেঘের মধ্যে ভাইরাস-কেন্দ্রিনের কোনো চিহ্নই নেই।

অতিকষ্টে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন প্রফেসর—ক্ষীণ কণ্ঠে, নিঃশ্বাসের স্বরে, মিলিয়ে যাওয়া বাতাসের সুরে বললেন কোন মতে

—"অশ্রুনালী···অশ্রুনালী··· !"

ধরে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু আমার দু-বাহুর মধ্যেই মিলিয়ে গেলেন উনি। পড়ে রইল কেবল ধড়াচূড়া। সেকেন্ড কয়েক পরেও তা-ও শূন্যতার শোষণে আকৃষ্ট হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।

এরপরই অদৃশ্য হলাম আমি নিজে। আমার তখনকার অনুভূতি বর্ণনা করে খরস্রোতা এই কাহিনীতে ভাসমান পাঠক পাঠিকাদের বিরক্তি উৎপাদন করতে আর চাই না। তবে তারা অনুমান করে নিতে পারে, আমার অবয়ব বিলীন হয়ে যাওয়ার পর পড়েছিল ছুরি, প্ল্যাস্টার আর পোশাকগুলো ক্ষণেকের জন্য। তারপর তাও হারিয়ে গেল অনস্তিত্বের গর্ভে। অনচ্ছ, অস্পষ্ট হয়ে এসে বিলীন হল শূন্যে। আসল আমি আর প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র তখনও লড়ছি আর ধস্তাধস্তি করছি রিসার্চ হসপিট্যালে—আমাদের কার্বন-কপিদের কিন্তু আর কোনো অস্তিত্বই রইল না।

রুধিরবর্ণ লোহিতকায় চক্ চকে একটা বস্তু কেবল পিছলে গড়িয়ে ধেয়ে গিয়েছিল প্রফেসরের মন-গহবরের মেঝে দিয়ে···অশ্রুনালী অভিমুখে।

আইসোলেশন ওয়ার্ড।

প্রফেসরের মুখাবয়ব লালচে কর্কশ তারের মত শক্ত লোমে প্রায় ছেয়ে এসেছে। এক চোখের কোণে টল টল করে উঠল একবিন্দু অশ্রু। প্রস্তুত হয়েই ছিলেন কো। এই টুকু সময়ের মধ্যে ভাইরাস সংক্রমণে তিনিও রূপা-ন্তরিত হয়েছেন নরাকার দানবে। মুখমণ্ডল ছেয়ে গেছে লালচে কর্কশ শক্ত তারের মত লোমে। কাঁচের রডে অশ্রুবিন্দু ধরে নিয়ে চালান করলেন একটা কাঁচের ডিসে।

আসল মু সবুজাভ অঙ্গার চক্ষু মেলে যেন অগ্নিবর্ষণ করল অশ্রুবিন্দু-টার ওপর। বললে চাপা হিংস্র গলায়—"ধ্বংস করুন! এখুনি ধ্বংস করুন হতভাগাদের!"

মাথা নাড়লেন কো—"না। কি-কি ঘটল ভেতরে, আগে তা জানা দরকার। পূর্ণ অবয়ব ফিরিয়া দেওয়া দরকার সেই কারণেই। সময় থাকতে থাকতেই জেরা করে বার করে নিতে হবে সব খবর।"

কথা বলতে বলতে ডিসটাকে বয়ে নিয়ে গেলেন ক্লোনিং বুথে। প্রফেসর যে ভাবে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সেইভাবে কণ্ট্রোলের হাতল ধরে

ঠেলে দিলেন উল্টোদিকে। সুইচ টিপে মেশিন চালু করে দিয়ে পেছিয়ে এলেন তফাতে।

মেঘমন্দ্র গুঞ্জন ধ্বনি জাগ্রত হ'ল মেশিনের মধ্যে। যেন লক্ষ ভীমরুল ধেয়ে আসছে, লক্ষ শব্দ সৃষ্টিকারী পতঙ্গ আকাশবাতাস তোলপাড় করছে। তার পরেই বুথের ভেতরে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল একটা আকৃতি।

হ্যাঁ, একটা আকৃতি। একটা আকারহীন আকারও বলা চলে। কেন না, সে আকার আমার নয়, প্রফেসরেরও নয়…পার্থিব কোনো মনুষ্যাকারই নয়…কথিত আছে, রামের জন্য সেতুবন্ধকালে নল-বানরকে সৃষ্টি করেছিলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও তিনি এ হেন মূর্তি সৃষ্টি করতে পারতেন কিনা সন্দেহ…

বুথের মধ্যে সেই সৃষ্টিছাড়া আকারটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। একই সময়ে ভাইরাস-সংক্রমণের যাবতীয় লক্ষণও মুছে যেতে লাগল শায়িত প্রফেসরের কলেবর থেকে অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে। দেখতে দেখতে পুরো-পুরি পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হলেন তিনি। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত হয়ে গেল আগের মত—আদি এবং অকৃত্রিম প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র ফিরে এল প্রভঞ্জন বেগে—পরিবর্তনটা এমনই আকস্মিক এবং বিস্ময়কর যে চক্ষুকর্ণ দিয়ে দেখেও যেন প্রত্যয় হয় না। উন্মুক্ত হ'ল দুচোখের পাতা। স্বাভা-বিক সুস্থ চোখে দৃষ্টিপাত করলেন ডাইনে বাঁয়ে ওপরে নিচে। সতর্ক, হুঁশিয়ার চাহনিতে আবিলতার লেশমাত্র নেই।

বুথের দরজা খুলে ধরল মু। শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভয়, বিস্ময় যুগপৎ যেন বিনয়ের অবতারে পরিণত করল তার হিংস্র আকৃতিকে। সাক্ষাৎ ভগবান বুঝি দর্শন দানে ধন্য করেছে ভক্তকে। কৃতার্থ মু অবিকল সেই ধরনের ভক্তিভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ধীরপদে নত মস্তকে পেছিয়ে এল বুথের সামনে থেকে।

শুধু কি ভক্তি? ভয় জিনিসটাও আচ্ছন্ন করে তুলেছিল মু-য়ের মত কাঠগোঁয়ার বেপরোয়া অমানুষটাকেও। নইলে অমন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে কেন? কেন সবুজাভ অঙ্গারসম চক্ষু প্রত্যঙ্গ দুটো নিষ্প্রভ হয়ে আসবে নিরতিসীম আতংকে?

বুথের ভেতরটা পুরোপুরি ভরে উঠেছে বীভৎস একটা আকৃতিতে। সে আকৃতি এমনই কদর্য এবং কিম্ভূতকিমাকার যে সহস্র বর্ণনা সত্ত্বেও

মনে হয় অলীক, অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব। রুধির বর্ণে রঞ্জিত তার গাত্র-বর্ণ। আকারে পূর্ণাবয়ব মানুষের মত বিরাট। সমস্ত শরীরটা চক্‌চকে। সর্বাঙ্গ থেকে আছড়ে আছড়ে পড়ছে অগুন্তি শুঁড়—অনেকগুলো অক্টোপাশকে একত্র করলেও এহেন মূর্তিমান বিভীষিকা সৃষ্টি সম্ভব নয়। প্রকাণ্ড গোলক-চক্ষু একটি নয়—একাধিক। সব ক'টি চক্ষুই ঘূর্ণিত হচ্ছে, দুলছে এবং নরকের অগ্নি যেন বর্ষণ করছে আইসোলেশন ওয়ার্ডের চারিদিকে। প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রের অনুকরণ যন্ত্র বিপরীত দিকে সচল থাকায় অণু অবস্থা থেকে বিবর্ধিত হতে হতে বিরাটাকার প্রাপ্ত হয়েছে রৌরব-বিভীষিকা!

সিন্ধুর অতল থেকে যেন চাপা শব্দে বুদবুদ উঠে এল ওপরে—গুম্‌গুম্‌ ঘর্ঘরে গলায় বললে কল্পনাতীত আতংক—"হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছো কী? দেখতে পাচ্ছো না নড়তে পারছি না? ধরে বার করো!"

অগ্রসর হ'ল মু—সঙ্গে আর একজন সংক্রামিত স্যাঁঙাৎ। দু-জনেরই পা টলছে ভয়ে।

এমন সময়ে বৃদ্ধ প্রফেসরের কণ্ঠে জাগ্রত হ'ল বাসুকির গর্জন—"কো!"

বেগে ঘুরে দাঁড়ালেন কো। আঁৎকে উঠে প্রফেসর প্রত্যক্ষ করলেন তাঁর কর্কশ লোম ছাওয়া মুখাকৃতি। গুঙিয়ে উঠলেন শিহরিত স্বরে—"কী সর্বনাশ!"

পরিতৃপ্ত কণ্ঠে কিন্তু বললেন কো—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এখন হুজুরের গোলাম। তাঁর আদেশই আমার একমাত্র পথনির্দেশ—উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায়।"

চোখ ফেরালেন প্রফেসর। বুথের ভেতর থেকে দু-জনে দু-পাশ থেকে ধরে অবর্ণনীয় আকৃতিটাকে তখন বাইরে বার করছে! ফুলে ফুলে উঠছে বীভৎস মূর্তিটা নিয়মিত ছন্দে—স্পন্দিত হচ্ছে ভয়াল ভঙ্গিমায়।

নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর। ধীরে ধীরে অপরিসীম ঘৃণায় আকুঞ্চিত হ'ল চোখমুখ। প্রবল বিবমিষায় যেন শিউরে উঠলেন। বললেন তাচ্ছিল্যের সুরে—"কী আশ্চর্য! এই অসহায় চিংড়ি মাছটা আপনাদের হুজুর?"

খ্যাঁক করে উঠল মু—"চোপরাও! মুখ সামলে কথা বলবেন! ঝাঁকের কেন্দ্রন উনি—"

"ভীমরুলের চাক বলো! পালের গোদাটা তো দেখছি ভীমরুলের চাইতেও অসুন্দর!"

তেড়ে এল মু—ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল অঙ্গারচক্ষু। কিন্তু ঢক্-ঢক্ গুম-গুম শব্দে তাকে নিরস্ত করল কেন্দ্রিন—"দাঁড়াও! নিয়ে চল আমাকে ওর কাছে!"

অনুচরসহ মু বীভৎস প্রাণীটাকে বয়ে নিয়ে এল খাটে লম্বমান প্রফেসরের সামনে। প্রফেসরের চোখ দুটো যেন অণুবীক্ষণ যন্ত্র হয়ে গেল। ভেতরকার বৈজ্ঞানিক সত্তাটা সীমাহীন অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ডবল অণুবীক্ষণ দিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল কাঁকড়া-চিংড়ি-অক্টোপাশের সমাহার বিদঘুটে জীবটাকে। দেখেশুনে মনে হল, ভারী গতর নিয়ে এর পক্ষে স্বইচ্ছায় সঞ্চরণ তো অসম্ভব, সিধে হয়ে থাকাও সম্ভব নয়—কেউ না ধরে থাকলে তালগোল পাকিয়ে এখুনি দলা পাকিয়ে যাবে যেন। যে হারে আকৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে মনে হয় সম্ভবতঃ পূর্ণ আকৃতি এখনো পায় নি কদাকার কেন্দ্রিন। সময়কালে নিশ্চয় পরিপার্শ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে···শক্তি সঞ্চয় করে বলীয়ান হয়ে উঠবে···

ভেবেচিন্তে সুর নরম করে প্রফেসর বললেন—"স্থূল জগতে খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না? বেশ তো ছিলে সূক্ষ্ম জগতে।"

"আপাততঃ হচ্ছে, সয়ে যাবে যথা সময়ে," প্রফেসরকে আশ্বস্ত করল কেন্দ্রিন।

"ভেবেছিলাম তোমাকে নিশ্চিহ্ন করেছি।"

"ভুল! ভুল! যে পথে বেরিয়ে আসবে ঠিক করেছিলে, সেইপথেই পালিয়ে এসেছি আমি—তোমার চোখের মধ্যে দিয়ে।"

দারুণ ভাবনায় পড়লেন যেন প্রফেসর—"মনের মধ্যে বসেছিলে তো—সব খবরই জেনে গেছিলে—"

"আবার ভুল করলে হে সময়াধিপতি! এ ভুলের দাম তোমার কাছে অনেকখানি। যাই হোক, কৃতজ্ঞ রইলাম তোমার কাছে তোমার এই ডাই-মেনশনাল স্টেবিলাইজার যন্ত্রটার জন্যে।"

প্রফেসর গুম হয়ে রইলেন। পাঠকপাঠিকারা যারা টেলিভিশনের বা রেফ্রিজারেটরের ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারের সঙ্গে পরিচিত, ডাইমেনশনাল স্টেবিলাইজার নামটা তাদের কাছে কিম্ভূত নাও মনে হতে পারে। ত্রিমাত্রিক

জগত থেকে চতুর্থ মাত্রিক জগতে যাতায়াতের সময়ে 'এই যন্ত্রটি প্রফেসরের উদ্ভাবিত টাইম মেশিনে অপরিহার্য'। নচ্ছার ভাইরাস-হুজুর খটমট এই নামটাও জেনে বসে আছে প্রফেসরের মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশ করে থাকার সময়ে।

ক্রুর কপট হাসিতে আইসোলেশন ওয়ার্ড মুখরিত করে ফের বললে কদাকার প্রাণীটা—"খুবই অবাক হয়েছো হে মূর্খাধিপতি টাইম-লর্ড! তোমার মস্তিষ্কের নাড়ি নক্ষত্র জেনে তবেই তো বহিরাগমন করলাম—তোমার আর নিস্তার নেই।"

দাঁত কিড়মিড় (মানে, মাড়িতে মাড়ি ঘষে—বিষম রাগ হ'লে উনি মাড়ি ঘর্ষণ করেন—দাঁত তো নেই) করে প্রফেসর বললেন—"বাক্যিচচ্চড়ি থামাও!"

ঘর প্রকম্পিত হল ভয়াল অট্টহাস্যে—"কথাগুলো উপাদেয় না লাগাই স্বাভাবিক হে গর্দভস্য গর্দভ। তোমারই যন্ত্র তোমার শত্রুকে আজ বড় সুখের আলয়ে এনে ফেলেছে। অণু-জগতে আর ঘাপটি মেরে থেকে বংশ বৃদ্ধি করতে হবে না আমাকে। আমার এই ঝাঁক যখন পালে পালে ডিম ফুটে বেরুবে টাইটানে, আর তাদের অদৃশ্য অতি-ক্ষুদ্র প্রাণী আকারে থাকতে হবে না—দুর্বল হয়ে থাকতে হবে না—হবে পরম বীর্যবান মহাশক্তিধর, অবধ্য অজেয় প্রাণী! অজেয়! খেয়াল রেখো হে নির্বোধ সম্রাট! অজেয় হবে আমার ঝাঁক! মনুষ্য-যুগ অন্তে পেঁছেছে—এবার শুরু হ'ল ভাইরাস যুগ!"

ঘৃণায় নাক সিঁটিয়ে প্রফেসর বললেন—"ও সব বাগাড়ম্বর আগেই শোনা হয়ে গেছে হে কীটাণুকীট ভাইরাস শিরোমণি! তোমার মতই তোমার ঝাঁকেদের প্রতিটা বদ্ধ উন্মাদকে কি করে টিপে মেরে ফেলতে হয়, তা আমি জানি!"

ভাইরাস-সংক্রমণের আর একটা লক্ষণ হ'ল সব ক'টা রিপু উগ্র হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় রিপু ক্রোধটাকেও ভাইরাস-গোলামদের ক্ষিপ্ত করে তোলে পান থেকে চুন খসলেই। মু-য়ের উন্মত্ত আচরণে এই লক্ষণ বারংবার প্রকাশ পেয়েছে। এবার প্রকাশ পেল কো-য়ের ক্ষিপ্ততায়। হুজুরকে হেনস্থা যে করে, তাকে তো আর বরদাস্ত করা যায় না। ক্রোধে যেন বর্ণ পর্যন্ত পরিবর্তন করে ফেললেন কো। ঝুঁকে পড়লেন প্রফেসরের ওপর। একটা বিজলি ফ্ল্যাশ লকলকিয়ে খেলে গেল তাঁর আর প্রফেসরের চারচোখের মধ্যবর্তী শূন্যতায়

—পরক্ষণেই বিজলি রেখা প্রতিহত হয়ে ফিরে এল কো-য়ের দুই ভুরুর মাঝখানে। যেন অদৃশ্য সংঘাতে ঠিকরে যেতে যেতে কোনরকমে সামলে নিলেন নিজেকে।

বিমূঢ় প্রফেসর মুহূর্তে বুঝলেন কি ঘটে গেল। প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত বিপুল আশার প্লাবনে ভেসে গেল তাঁর নিরাশ অন্তরের দু-কূল। 'ইমিউন' হয়ে গেছেন তিনি! রোগ প্রতিষেধের ক্ষমতা এসে গেছে তাঁর মধ্যেও। ভাইরাস-সংক্রমণ আর সম্ভব নয়! স্বয়ং ভাইরাস-হুজুর তাঁর মস্তিষ্কে নিবাস রচনা করে তাঁকে এই রোগ প্রতিষেধক শক্তি দান করে গেছে নিজের অজান্তেই! সোজা কথায় ভ্যাক্সিন নেওয়া হয়ে গেছে তাঁর। বিশেষ বিশেষ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে সেইসব রোগাক্রান্ত জীবের দেহ থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেই রোগের নিস্তেজীকৃত জীবাণু রস নিয়ে সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়ার নামই তো 'ভ্যাকসিনেশন' বা 'টিক নেওয়া'। প্রথম গো-বসন্তের টিকা আবিষ্কার করে ডক্টর জেনার মানব জাতির মঙ্গল করেছিলেন, বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর বিভিন্ন রোগজীবাণুর টিকা বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রবর্তন করেছিলেন। প্রথম দিকে কেবল জীবিত রোগজীবাণু নিয়েই টিকা দেওয়া হ'ত। সেই প্রক্রিয়ায় স্বয়ং ভাইরাস-কেন্দ্রিন তাঁর শরীরে অবস্থান করে তাঁকে সেই টিকা দিয়ে এসেছে। এখন তিনি ভাইরাসের অবধ্য। তাঁর মনকে দখল করার আর কোনো শক্তি নেই ভাইরাসের! এ লড়াইয়ে এখন তিনি হবেন অপ্রতিহত, অজেয়! পাল্টা মার দেওয়ার সময় হয়েছে এতক্ষণে!

কিন্তু বড়ই স্বল্পস্থায়ী হ'ল তাঁর স্বস্তিবোধ। মু হতভাগা বিজলির পরাজয়-বরণ দেখেই স্থির করে নিয়েছিল পরবর্তী কর্তব্য। চরম সিদ্ধান্ত নিল সঙ্গে সঙ্গে। ক্রোধে বিবর্ণ মুখে লাফিয়ে এগিয়ে এল উদ্যত ব্লাস্টার হাতে।

বিকট চীৎকার করে উঠল ভাইরাস-হুজুর—"না! না! এখন না? টাইটানের ঝাঁকের সামনে ফেলে দাও অপদার্থটাকে—ছিঁড়ে খাক ওরা!"

এর চাইতে বরং চকিত মৃত্যুও যে পরম বরণীয় ছিল প্রফেসরের কাছে!

১৭ ॥ বিষঘ্ন ওষুধ

দূরদর্শন শক্তিবলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়েছিলেন বিদুর। আমিও আইসোলেশন ওয়ার্ডের বিস্ময়কর ঘটনাবলী জ্ঞাত হলাম ক-৫'য়ের ইলেকট্রনিক মগজের দৌলতে।

আমি তখন দাঁড়িয়ে আছি লকার-পাল্লার দর্পণের সামনে। সপ্রশংস চোখে নিজেই নিজেকে তারিফ করছি। রিসেপসন কক্ষে এই ফার্স্ট-এইড লকারের পাল্লা জোর করে ভেঙেছি একটু আগে। ভাইরাস-সংক্রমণের প্রথম পর্যায়ে যত কিছু মলম আর ড্রেসিং প্রয়োজন হয়, এলোপাতাড়িভাবে সেইসবের মধ্যে থেকে নিজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করেছি। ডাক্তারের পরিচ্ছদ অংশে সংস্থাপন করেছি। ছদ্মবেশ এখন সম্পূর্ণ।

সহর্ষে জিজ্ঞেস করলাম ক-৫কে—"কিরকম লাগছে বলো তো আমাকে?"

প্রশ্নের তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারল না ক-৫। বললে সংক্ষেপে—"বন্ধু।"

পরিচ্ছদের তলায় লুকোনো ব্ল্যাস্টারটা হাত বুলিয়ে পরখ করে নিয়ে বললাম—"কেন্দ্রিন ব্যাটাচ্ছেলের ধারে কাছেও যদি পেঁছোতে পারি, বন্ধুত্ব কাকে বলে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব।"

টংকার-কণ্ঠে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করল ক-৫—"প্রভু, শত্রুরা আসছে এদিকে। সঙ্গে আছেন প্রফেসর।"

চকিতে একটা দরজার আড়ালে গিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়ালাম দু-জনে।

মূল অলিন্দ বরাবর অগ্রসর হচ্ছে অসাধারণ একটা শোভাযাত্রা। পুরোধা প্রাণীটি হ'ল ভাইরাস-হুজুর স্বয়ং। মু আর তার স্যাঙাৎ দু-পাশ থেকে ধরাধরি করে তাকে নিয়ে চলেছে। ফুলে ফুলে উঠছে তার কদাকার আকৃতি—আত্যন্তিক স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে মুহুর্মুহু। সঘন নিঃশ্বাস বুদবুদের মত গুব্-গুব্ শব্দে ফেটে পড়ছে গলার মধ্যে। যেন পিপেভর্তি তরল পদার্থ ছলকে ছলকে উঠছে নড়াচড়ার ফলে।

ঠিক পেছনেই হসপিট্যাল ট্রলীতে শুইয়ে প্রফেসরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসছে জান্তব চেহারার ডক্টর কো।

অধীর কণ্ঠে বুদ্‌বুদ্ কাটা শব্দে ঘর্ঘর করছে কেন্দ্রিন মহাপ্রভু

—"সত্বর করো ! বিলম্ব কোরো না ! ডিম পাড়ার সময় হয়েছে নিকট ! ভেক আর মৎস্যের ন্যায় রাশি রাশি ডিম পাড়বো ! ত্বরা করে নিয়ে চল টাইটানের ডিম পাড়ার নির্দিষ্ট আঁতুড়ঘরে !"

পঞ্চাশের দশকের এক প্রবন্ধে বহুরূপী নাট্যসংস্থার প্রাতঃস্মরণীয় শম্ভু মিত্র একটা চমৎকার শব্দ ব্যবহার করেছিলেন—'কণ্ঠ-বাদন' ! ভাইরাসের কণ্ঠ-বাদন শুনলে নিশ্চয় আর একটা নতুন নাম তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে এসে যেত—কণ্ঠ-জগঝম্প ! বিশ্বের সবকটা উদ্ভট বাদ্যযন্ত্র এক সঙ্গে বেতাল বেসুরে বাজলেও বোধহয় এরকম অপূর্ব কর্ণপটহবিদারী শব্দসৃষ্টি সম্ভব হত না । বিচিত্র এই কণ্ঠ-বাদন ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই—আমার অক্ষমতার জন্য পাঠকপাঠিকারা যেন আমাকে ক্ষমা করে ।

দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকলেও কৌ-য়ের শাণিত দৃষ্টি এড়াতে পারিনি । অপাঙ্গে আমাকে দেখে নিয়েই হেঁকে উঠলেন কর্কশ কণ্ঠে—"ডাক্তার, আসুন চটপট ! হুজুরকে সাহায্য করতে হবে আমাকেই—আপনি ট্রলী ঠেলুন ।"

মহাফাঁপড়ে পড়লাম । ছদ্মবেশ আমার সার্থক নিঃসন্দেহে । নইলে ডাক্তার বলে আমাকে ভুল করবেন কেন কৌ । আমাকে যে চিনতে পেরেছেন, এরকম কোনো লক্ষণই দেখালেন না । কতকটা আমার ছদ্ম রূপের মহিমায়, কতকটা বোধ হয় আত্মম্ভরিতার দরুন । যে অমানুষটা নিজেকে হুজুরের দক্ষিণ হস্ত মনে করে, সে কুচোকাচা নগণ্য ডাক্তারদের খুঁটিয়ে দেখতে যাবে কেন ? প্রেসটিজ নেই ? কাজেই আমার হাতে ট্রলী সঁপে দিয়ে তিনি ছুটে গেলেন মু আর স্যাঙাতের পাশে—ধরাধরি করে নিয়ে চললেন বাগ্মী কৌ রনকে—লেকচারের বিরাম নেই ব্যাটাচ্ছেলের—সমানে গজ গজ করে অসন্তোষ প্রকাশ করে চলেছে । দেরী হয়ে যাচ্ছে ! বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে ! ভেকের ন্যায়, মৎস্যের ন্যায়, রাশি রাশি ডিম ছাড়ার সময় হয়েছে নিকট···অতএব···

চোখে চোখ রাখলেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র । বললেন ফিসফিস করে—"ওহে দীননাথ, তোমার নকল ভুরু যে ঝুলে পড়ল !"

"চু-উ-উপ !" ভুরুটা টিপে টুপে বসিয়ে নিয়ে ঝটপট ছুরী বার করে ঘচাঘচ করে কাটতে লাগলাম প্রফেসরের বাঁধন ।

টাইম-মেশিন যে ঘরে পরিত্যক্ত, সেই ঘরের সামনে আসার আগেই

বন্ধনমুক্ত হয়ে গেলেন প্রফেসর।

এক ঝটকায় ট্রলী ঘুরিয়ে নিলাম টাইম-মেশিনের ঘরের দিকে।

ঘুরে দাঁড়ালেন কৌ—"ডাক্তার, ওদিকে নয়!"

কিন্তু তখন আর বাধা দেওয়ারও সময় নেই। তড়াক করে ট্রলী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন প্রফেসর, ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ঢুকে গেলেন ভেতরে। ক-৫ কোত্থেকে ঝড়ের বেগে এসে সাঁৎ করে খোলা দরজা দিয়ে সেঁধিয়ে গেল ভেতরে। গুরুভার ভাইরাস-হুজুরকে নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল বলে ঝপ করে পেছন নেওয়া সম্ভব হ'ল না কৌ আর মু-য়ের পক্ষে। দল থেকে বেরিয়ে এসে ব্ল্যাস্টার তুলে ধরল মু। কিন্তু তার আগেই ব্ল্যাস্টার চলে এসেছে আমার হাতে, ট্রিগারও টিপলাম সঙ্গে সঙ্গে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম বটে, কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত করে দিলাম মু-কে। সাঁই-সাঁই করে তেজঃপুঞ্জ ধেয়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। পরক্ষণেই লাফ দিয়ে ঢুকে পড়লাম টাইম-মেশিনের ঘরে—দরজা বন্ধ করে দিলাম ভেতর থেকে।

পাল্লায় কান পেতে শোনারও দরকার হ'ল না। শুনলাম মেদিনী-কাঁপানো হুংকায় ছাড়ল মু—"পালালো! পালালো!"

"পালিয়ে যাবে কোথা?" শোনা গেল হুজুরের কণ্ঠ-জগঝম্প—"ফাঁদে পড়েছে। ডাইমেনশনাল স্টেবিলাইজার না থাকলে টাইম-মেশিন নড়বে না। কৌ, তুমি টহল দাও এখানে—প্রফেসর যেন পলায়ন করতে না পারে। প্রফেসর বেরিয়ে এলেই বলপূর্বক তাকে আনয়ন করো টাইটানে।"

দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল কণ্ঠ-জগঝম্প! ভেকের ন্যায়, মৎস্যের ন্যায় ডিম পাড়ার জন্যে আকুলি বিকুলি ক্ষীণতর হয়ে স্তব্দ হল এক সময়ে।

ডাক্তারের ছদ্মবেশ গা থেকে খসিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি।

বললাম—"প্রফেসর, বলুন এবার কি হুকুম।"

গুম হয়ে রইলেন প্রফেসর। তাড়া লাগিয়ে বললাম—"কি হল? বলুন কি করতে হবে?"

বিষণ্ণ কণ্ঠে প্রফেসর বললেন—"কিছুই করার নেই এখন।" একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন দেওয়ালে লাগানো আলোকিত টেলিভিশন পর্দার মত একটা স্ক্রীনের দিকে! চেয়ে রইলাম আমিও। দেখলাম রিসার্চ হসপিট্যালের

এয়ার-লক দেখা যাচ্ছে। একটা রকেট-যান দাঁড়িয়ে আছে সামনে। আকারে ছোট। অল্প পথ পাড়ি দেওয়ার যান নিশ্চয়। হাসপাতাল থেকে টাই-টানে তো হামেশাই যাতায়াত করতে হয়—তার ব্যবস্থা।

সহসা দলবল সমেত এয়ার-লক খুলে বেরিয়ে এল ভাইরাস-হুজুর—উঠল যন্ত্রযানে। বন্ধ হয়ে গেল এয়ার-লকের দরজা।

অস্থির হয়ে বললাম—"প্রফেসর, এখনো সময় আছে। এখনো যদি ওদের আগে টাইটানে পেঁছোতে পারি, কদাকার জানোয়ারটাকে নিকেশ করতে পারব!"

"না, পারব না। ডাইমেনশনাল স্টেবিলাইজার ফেলে এসেছি আই-সোলেশন ওয়ার্ডে—ঐ জিনিস ছাড়া টাইম-মেশিন একচুলও নড়বে না।"

"তাহলে কি ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসে থাকব?" বিশ্বকর্মার প্রস্তুত করা শ্রীক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মূর্তি হতে হবে আমাকে, এই কল্পনায় অস্থির-পঞ্চম হয়ে উঠলাম আমি।

আমার হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত নৃত্য যেন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন প্রফেসর। তারপর ক-৫কে ডেকে বললেন—"ওহে ছোকরা, শোনো তো এদিকে।"

ক-৫ তখন ভীষণ ব্যস্ত। টাইম-মেশিনের চারপাশে চাকার ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে জটিল যন্ত্রপাতি গুলো দেখছে, শুঁকছে, শুঁড় বুলিয়ে পরখ করছে। স্পষ্টতঃ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। অথবা, চমৎকৃত হয়েছে। ভাবাবেগ জিনিসটা রোবটদের সার্কিটে তো থাকে না। প্রফেসরের অমায়িক আহ্বান শুনে মেশিন-পর্যবেক্ষণ স্থগিত রেখে গড়-গড় করে এসে দাঁড়াল সামনে—"হুকুম করুন, প্রভু।"

কি যেন ভাবতে ভাবতে প্রফেসর বললেন—"বাইরে যেতে পারবে?"

"পারব।"

"কো-কে সর্ষেফুল দেখাতে পারবে?"

"ব্যাখ্যা করুন। সর্ষেফুল কি জিনিস?"

"জ্বালালে দেখছি। ওটা একটা বিশেষ শব্দগুচ্ছ—যার মানে মাথায় চোট পাওয়া—অজ্ঞান হওয়া। চোখে তারার ঝলক দেখা।"

"তথাস্তু। আমার অস্ত্রশালায় চার স্তরের অস্ত্র মজুদ আছে। বধ করার, অজ্ঞান করে দেওয়ার, পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেওয়ার——"

"তাই নাকি ? তাই নাকি ? তাহলে বাবা, বধ-টধ আর করতে যেও না। ধাঁই করে মেরে কেবল অজ্ঞান করে দাও। কেমন ? কো-কে আমার দরকার আছে।"

"তথাস্তু !"

"গুড ডগ।"

স্ক্যানার স্ক্রীনের দিকে ফের চোখ তুললেন প্রফেসর। রিসার্চ হসপিট্যালের সমস্ত অঞ্চলের দৃশ্য তন্নতন্ন করে পরিদর্শন করে চলেছে এই গোয়েন্দা-যন্ত্র, সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করছে, কোথাও কোনো গতানুগতিক বহির্ভূত ঘটনা ঘটলেই পর্দায় ফুটিয়ে তুলছে। ক্ষণপূর্বে এই কারণেই এয়ার-লকে ভাইরাস-হুজুরের মিছিল দেখা গিয়েছিল। এবার দেখা গেল টাইম-মেশিনের ঘরের সামনের অলিন্দের দৃশ্য। ছটফট করছেন কো। পায়চারী করছেন। সারামুখে প্রকটিত জান্তব জিঘাংসা। অমায়িক সৌম্যদর্শন সেই কো-কে আর চেনাই যায় না। কিছুক্ষণ এইভাবে পদ চারণা করার পর অগ্রসর হলেন রিসেপসন ডেস্ক অভিমুখে।

অমনি হুকুম ছাড়লেন প্রফেসর—"বেরিয়ে যাও, ক-৫ !" বলেই নিজেই ছিটকে গিয়ে তড়িঘড়ি খুলে দিলেন দরজা—গড়গড় করে চক্রপদে অন্তর্হিত হ'ল ক-৫।

স্ক্যানার-স্ক্রীনে দেখা গেল বিসেপসন ডেস্ক মাইক্রোফোনের সামনে উপবিষ্ট রয়েছেন কো। বলছেন—"ডক্টর কো বলছি···রিসেপশনের সিনিয়র স্টাফ সবাই শুনুন···"

ঠিক এই সময়ে স্ক্রীনে আবির্ভূত হ'ল ক-৫। গড়িয়ে চলেছে কো-য়ের দিকে। শীতল চোখে তাকে নিরীক্ষণ করলেন কো। ভাইরাস-সংক্রামিত হওয়ায় তাঁর আর তখন বোঝবার ক্ষমতাও নেই কুকুরের চেহারায় কম্পিউটার সৃষ্টি কেন করেছেন তিনি—সেই সেন্টিমেন্টের বালাই আর নেই বলেই কড়াগলায় বললেন—"ক-৫, তোমাকে আর দরকার নেই আমার—"

ক-৫'য়ের চোঙ থেকে বিচ্ছুরিত হ'ল এক ঝলক হলুদ দ্যুতি। মুখ থুবড়ে ধরণী আশ্রয় করলেন কো—মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটিও বেরোলো না।

দরজা খুলে বাঁই-বাঁই করে দৌড়ে গেলাম আমি আর প্রফেসর। সে কী দৌড় ! প্রফেসরের স্পীড দেখে মনে হল যেন জিরাফ দৌড়োচ্ছে। পায়ে

যেন একাধিক জয়েণ্ট আছে। আমার আগেই পেঁছে গেলেন রিসেপসন কক্ষে। পেছন ফিরে হেঁকে বললেন—"ট্রলীটা নিয়ে এসো।" ট্রলী ঠেলে নিয়ে এলাম চক্ষের পলকে। কো-কে ধরাধরি করে তুলে ফেললাম তার মধ্যে। করিডরে এসে ছুটতে ছুটতে ট্রলী সমেত কামানের গোলার মত ঢুকে পড়লাম আইসোলেশন ওয়ার্ডে। বিষম ব্যস্ততায় মুহূর্তের মধ্যে যেন বিস্ফোরিত হলেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র। মা দুর্গার মত যেন দশ হাতে কাজ করে চললেন ঝড়ের বেগে। নিজের আঙুল থেকে রক্তের নমুনা নিলেন, স্লাইডে রাখলেন, আমার দিকে ফিরলেন।

"এবার তোমার পালা, দীননাথ! আঙুলটা বাড়াও—তাড়াতাড়ি! আর একটা মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না!"

বচন শুনে পিত্তি জ্বলে গেল আমার। একটু আগেই গড়িমসি করছিলেন—এখন আর তর সইছে না। বাড়িয়ে দিলাম আঙুলটা। স্ক্যাল-পেল দিয়ে কচ্ করে আঙুলের ডগা চিরে দিলেন প্রফেসর। 'উঃ' করে উঠলাম আমি।

দন্তহীন মুখখানা সুমিষ্ট হাসিতে ভরিয়ে তুলে প্রফেসর বললেন—"ভয় কী? এতবড় পালোয়ান তুমি—এক ফোঁটা রক্ত দিতেও প্রাণ বেরিয়ে গেল?"

"তাড়াতাড়ি করুন না!" দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললাম আমি। তারপর রক্তমাখা তর্জনীটা মুখে পুরে চুষতে লাগলাম জ্বালা কমানোর জন্যে।

কমপিউটর-চালিত ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে আমার আর ওঁর নিজের রক্তের নমুনা মাখানো দু-খানা কাঁচের স্লাইড পাশাপাশি ঢুকিয়ে দিলেন প্রফেসর।

আঙুল চুষতে চুষতে হতবুদ্ধির মত তাঁর কাণ্ড দেখতে দেখতে বললাম—"একটু আগেই তো এসব হয়ে গেছে?"

"তখন আমার মধ্যে ভাইরাস ছিল—এখন আমি 'ইমিউন'—রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা এসে গেছে আমার মধ্যে। তুমি আর আমি যখন আমার মাথার মধ্যে অভিযান চালাচ্ছিলাম, নিশ্চয় তখন কিছু একটা ঘটেছে। আমি জানতে চাই সেটা কি!" মাইক্রোসকোপ স্ক্রীনের সুইচ 'অন' করলেন প্রফেসর। তন্ময় চোখে আলোকোজ্জ্বল রেখাচিত্রগুলো পড়ে গেলেন। বল-লেন স্পষ্ট কণ্ঠে—"এবার বুঝেছি! ইণ্টারেস্টিং! রিয়্যালি ইণ্টারেস্টিং!"

স্ক্রীনে তখন ঝিলিমিলি আলোর খেলা চলছে। অজস্র আলোক-প্যাটার্ন ইলেকট্রনিক স্পীডে আসছে, আকার পরিবর্তন করছে, ছোট হচ্ছে, বড় হচ্ছে দ্রুত ধেয়ে যাচ্ছে, দূর থেকে ছুটে এসে বিরাট হতে হতে যেন চোখের ওপর আছড়ে পড়ছে। প্যাটার্ন পরিবর্তনের সেকী স্পীড! চেয়ে থাকতে থাকতে যেন চোখে ধাঁধা লেগে যায়, পা টলতে থাকে, মাথা ঘুরতে থাকে। যেন একটা ভীষণবেগে চলমান বায়ু-যানে আসীন আমি, আশপাশ দিয়ে নক্ষত্রবেগে হরেক রকম প্যাটার্নের পর প্যাটার্ন ছুটে এসেই মিলিয়ে যাচ্ছে…আবার আসছে…আবার আসছে…শেষ নেই…বিরাম নেই……

মাথা ঘুরে গেল আমার। রেখাচিত্রের ভাষা বোঝার ক্ষমতা আমার মোটা মগজে নেই। তাই হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম—"প্রফেসর! প্রফেসর! মানে বুঝিয়ে দিন!"

নিবিষ্ট দৃষ্টি মেলে ধরে প্রফেসর আত্মস্থ কণ্ঠে বললেন—"কী আশ্চর্য! আমার ব্লাড স্যাম্পল আর তোমার ব্লাড স্যাম্পেলের প্যাটার্ন এক রকম হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছো না?"

"না, না, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। সব প্যাটার্নই তো আলাদা।"

"তোমার মুণ্ডু!" এবার বুঝি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল প্রফেসরের—"ঐ যে বঁড়শির মত একটা আকৃতি দেখছো না? কিলবিল করছে? ঐ হ'ল অ্যাণ্টিবডি।"

"অ্যাণ্টিবডি!"

পূর্ণচোখে এবার আমার দিকে তাকালেন প্রফেসর—"দীননাথ, তোমার মত আকাট মূর্খ আমি খুব কম দেখেছি।"

মুখ চুন হয়ে গেল আমার! কিন্তু সত্যিই তো আমি জানি না অ্যাণ্টি-বডি কাকে বলে।

প্রফেসর বললেন—"ইমিউনিটি কাকে বলে, তাও নিশ্চয় জানো না। ইমিউনিটি হ'ল রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা। এ রকম ক্ষমতা স্বাভাবিক বা জন্মগতও হ'তে পারে। আবার ভ্যাকসিন, টিকা ইত্যাদি প্রয়োগেও জন্মানো যায়। এই রোগ-প্রতিরোধ শক্তির তারতম্যের জন্যেই একই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় থেকেও কেউ রোগাক্রান্ত থাকে, কেউ বা সুস্থ থাকে। বুঝলে?"

"হ্যাঁ।"

"এই ভাইরাস হারামজাদা তোমাকে রোগাক্রান্ত করতে পারেনি, কেন না তোমার ইমিউনিটি জন্মগত—মস্তিষ্ক এত কম যে বুদ্ধি প্রায় নেই বললেই চলে। ভাগ্যক্রমে এই বিপদে সেটাই শাপে বর হয়েছে—তোমার যে ইমিউনিটি আছে, আমার ছিল না। কেন না, আমার মস্তিষ্ক—"

"জানি, জানি। কিন্তু অ্যান্টিবডি—"

"বলছি। বাগড়া দিও না। বিভিন্ন রকমের রোগ প্রতিরোধক ইমিউনিটি স্বরূপ জীবের রক্তে রোগ-জীবাণু ঢুকলে স্বভাবতঃই যে-সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাদেরকেই বলা হয় অ্যান্টিবডি। রক্তে প্রবিষ্ট জীবাণুরা এদের প্রভাবে বিনষ্ট হয়, বা এদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় জীবাণুদের বিষ-রস নির্বিষ হয়ে পড়ে। মহামান্য এই অ্যান্টিবডি তোমার রক্তে ছিল আগে থেকেই—এখন দেখছি আমার রক্তেও তার আবির্ভাব ঘটেছে—আগে কিন্তু ছিল না।"

"কিন্তু আমার অ্যা-অ্যান্টিবডি আপনার রক্তে ঢুকলো কি করে?"

"খুব সহজে, মূর্খ, খুবই সহজে। প্রশ্নটা নিজেই নিজেকে করলে জবাব পেয়ে যেতে। তোমার ক্লোন তো ঢুকেছিল আমার দেহে?"

"হ্যাঁ ঢুকেছিল।"

"তোমার ক্লোন তো তোমারই টিশু থেকে তৈরী হয়েছিল?"

"তা তো বটেই।"

"অত পণ্ডিতের মত মাথা নেড়ো না। পণ্ডিতমূর্খ কোথাকার! তোমার সেই টিশু মিশে গেছে আমার রক্তে, ইমিউনিটি চালান হয়ে গেছে আমার মধ্যেও।"

"অ।"

"আবার 'অ' বললে? মানে, কিছু বোঝোনি?"

"না, না, বুঝেছি। আমার ইমিউনিটি পেয়ে আপনি এখন বর্তে গেছেন।"

খোঁচাটা গায়ে মাখলেন না প্রফেসর। বললেন—"এখন একটাই কাজ করতে হবে আমাদের। আলাদা করতে হবে এই অ্যান্টিবডিকে, বিশ্লেষণ করতে হবে, নকল বানাতে হবে, কো-য়ের দেহে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তাহলে ও সুস্থ হলে, বাকী সবাইকেও একই ভাবে সারিয়ে তুলতে পারবে।"

"এত সহজ ?" সত্যিই মন মানাত চাইল না প্রফেসরের পরিকল্পনা। এত সহজে নচ্ছার ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে ? আমারই —ইমিউনিটির দৌলতে ? আমারই মূর্খতার অ্যান্টিবডির কাছে হার মানবে ভাইরাসের প্রবলপরাক্রম ? ভারতেও গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দিল—অবিশ্বাস্য ! অসম্ভব !

বললাম—"ভাইরাস হুজুর ? সে ব্যাটা তো পার পেয়ে যাবে। টাইটানে তো সে এখন, ভেকের ন্যায়, মৎস্যের ন্যায় লাখে লাখে ডিম পেড়ে চলেছে।"

"একটা একটা সমস্যার সুরাহা করা যাক। অত হুড়বড় কোরো না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম ! আগে নিজেদের বাঁচাই, তারপর ভেকের ন্যায়, মৎস্যের ন্যায় ডিম পাড়ার গুষ্টিতুষ্টি করা যাবে খন।"

ভেকের ন্যায় মৎস্যের ন্যায় নির্বোধ চাহনি মেলে রইলাম আমি !

রিসার্চ হসপিট্যালের যন্ত্রযান তখন বেগে ধেয়ে চলেছে টাইটান অভিমুখে। পাশে লাল রেডক্রশ দেখা যাচ্ছে। ভেতরে ঠাসা বিচিত্র আরোহী। মু কন্ট্রোলে বসে যন্ত্রযান চালাচ্ছে। কৌন্দিন্য মহাপ্রভু ত্বরণ-কোচে আড় হয়ে পড়ে আছে। অ্যাক্সিলারেসন বললে হয়ত ইংরাজি মিডিয়ামের পাঠকপাঠিকারা বুঝতে পারবে। চলমান বস্তুর গতিবৃদ্ধির হার-কে বলে অ্যাকসিলারেসন। গতিবেগের এই ত্বরণ বা অ্যাক্সিলারেসন প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে ৩২ ফুট হারে বাড়ে। না বাড়লে নিক্ষিপ্ত গোলাগুলি প্রভৃতির গতি হবে স্থির, অর্থাৎ প্রারম্ভিক গতি বরাবর একই থাকবে। রকেট-যানের আরোহীরা এই প্রচণ্ড ধাক্কা সইবার জন্যে নরম কোচে শুয়ে পড়ে—মনে হয় যেন হাড় পর্যন্ত মড় মড় করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে—সারা দেহ থেঁৎলে যাচ্ছে। ভাইরাস-হুজুরের অবস্থাও হয়েছে তাই। অ্যাকসিলারেসন কোচে পড়ে থেকেও খাবি খাচ্ছে, ভীষণ ভাবে স্পন্দিত হচ্ছে বিপুল কলেবর—এই বুঝি থেঁৎলে চটকে একাকার হয়ে গেল। চারপাশ থেকে গোলামবৃন্দ ধরে রেখেছে তাকে, সভয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার তো নেই। ঐ অবস্থাতেই কিন্তু যন্ত্রযান নিনাদিত হচ্ছে তার কণ্ঠ জগঝম্পে—"তাড়াতাড়ি ! তাড়াতাড়ি ! উল্লুকের বাচ্চা, আরো তাড়াতাড়ি চালা !"

গোলামদের সঙ্গে এইভাবেই কথা বলার রেওয়াজ। সুতরাং গণতন্ত্রের

যুগের সমানাধিকার চেতনা সম্পন্ন পাঠকপাঠিকারা যেন শিউরে না ওঠে। ভাইরাস-হুজুর ব্রহ্মাণ্ড অধিপতি হলে এর চাইতেও জঘন্য গালাগাল আর অত্যাচারের জন্যে যেন প্রস্তুত থাকে মানব জাতি।

কিন্তু যন্ত্রযান তো পুরোদমেই ছুটছে! আর কতজোরে ছুটবে? 'উল্লুকের বাচ্চা' সম্বোধনে পরম-আপ্যায়িত হয়ে মু তাই বললে—"এর চেয়ে বেশী জোরে যাওয়া আর সম্ভব নয়, হুজুর। মোটর জ্বলে যাবে।"

"যাক! জ্বলে যাক! টাইটানে আগে পেঁছোই, তারপর ট্যাঙ্ক ভর্তি থুক থুক করবে আমার ডিম! অহো! অহো! ক'টা ট্যাঙ্ক রেডী রেখেছো?"

"হুকুম দিয়ে দিয়েছি। অনেক।"

"তাড়াতাড়ি! আরো তাড়াতাড়ি রে গাধার বাচ্চা!"

"প্রফেসরের কি হবে?"

"কৌ ওকে খাঁচায় পুরে নিয়ে আসবে টাইটানে। তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! সব জ্বালানি ঢেলে দে! তাড়াতাড়ি চ' না রে শু—"

এই গালাগালটা লেখার অযোগ্য বলে আর 'রিপিট' করলাম না।

বিনীতভাবে স্পীড-কন্ট্রোলের লিভারটা সামনে ঠেলে দিল মু। ভীষণ গর্জনে ছুটন্ত তারার মত ছিটকে গেল যন্ত্রযান—থরথর করে কেঁপে উঠল ছোট্ট কেবিনখানা।

আমি আর প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র সেই মুহূর্তে মহা উদ্বেগে ঝুঁকে রয়েছি ডক্টর কৌ-য়ের ওপর। কিছুক্ষণ আগেই বিষঘ্ন ওষুধ ফুঁড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর শরীরে। প্রতিক্রিয়া দর্শনের অভিলাষে এই সাগ্রহ প্রতীক্ষা।

আচমকা লক্ষণটা দৃষ্টিগোচর হ'ল আমারই চোখে। চাপা গলায় বললাম বিষম উত্তেজনায়—"প্রফেসর! প্রফেসর! দেখেছেন?"

অবিশ্বাস্য গতিবেগে ভাইরাস-সংক্রমণের বাহ্যিক লক্ষণ তিরোহিত হচ্ছে কৌ-য়ের মুখমণ্ডল থেকে। বীভৎস ভুরু, কর্কশ লোম—হু-হু করে যেন সেঁধিয়ে গেল শরীরের মধ্যেই। অচিরেই পূর্বাবস্থা ফিরে পেলেন কৌ।

জয় হোক আমার অ্যান্টিবডির! ইচ্ছে হল তুরুকনাচ নাচি!

কৃতিত্বটা কিন্তু অম্লানবদনে ছিনিয়ে নিলেন প্রফেসর। বললেন হৃষ্ট কণ্ঠে—"বুঝলে হে দীননাথ, মাঝে মাঝে নিজেই চমকে যাই আমার প্রতিভা

দেখে।"

দিতাম একখানা জবর জবাব, কিন্তু সময় পেলাম না। চোখ খুললেন কৌ। আবিল চোখে আচ্ছন্নের মত পিটপিট করে প্রথমে তাকালেন আমার দিকে, তারপর প্রফেসরের দিকে।

বললেন স্খলিত কণ্ঠে—"কি ব্যাপার বলুন তো ?" বলতে বলতে উঠে বসলেন খাটের ওপর। চারপাশ দেখে নিলেন। "আমার নার্স গেল কোথায় ?"

"পরলোকে। কিচ্ছু মনে পড়ছে না ?"

ভুরু কুঁচকোলেন কৌ—"মু ঘরে ঢুকল মনে আছে—তারপর একটা ফ্ল্যাশ দেখলাম—তারপর আর কিচ্ছু না—প্রফেসর, এক্সপেরিমেণ্ট সাকসেস-ফুল তো ?"

"হঁ্যা-ও বটে, না-ও বটে," মুখভঙ্গী করে বললেন প্রফেসর। "ভাই-রাস-হুজুর বেটাচ্ছেলে চম্পট দিয়েছে, খারাপ খবর এইটাই। আমার তৈরী ডাইমেনশনাল স্টেবিলাইজারটাই যত নষ্টের মূল। বেটাচ্ছেলে তারই দৌলতে মানুষের মত বড় হয়ে গেছে। রওনা হয়েছে টাইটানের দিকে—ডিম পাড়বে নাকি ভেকের ন্যায়, মৎস্যের ন্যায় !"

"আর আমি ? আমাকেও নিশ্চয় কব্জায় এনে ফেলেছিল ?" বলতে বলতে মুখের ওপর হাত চালিয়ে ডক্টর দেখে নিলেন স্বাভাবিক হয়েছেন কিনা।

"তা এসেছিল। কিছু সময়ের জন্যে। এখন আপনি কবলমুক্ত। কারণ কি জানেন ? আমি ইমিউনিটি ফ্যাক্টর আবিষ্কার করেছি—"

সাত তাড়াতাড়ি বললাম—"আমারই অ্যাণ্টিবডি থেকে।"

অপ্রসন্ন চোখে আমাকে নিরীক্ষণ করে নিয়ে প্রফেসর বললেন—"হঁ্যা, দীননাথেরই মূর্খতার অ্যাণ্টিবডি থেকে।"

মুখ লাল হয়ে গেল আমার। কি জবাব দেব ভাবছি, প্রফেসর সে সময় আর দিলেন না। কৌ-কে বললেন—"কাজেই কিছুক্ষণের জন্যে অন্ততঃ আমরা এখানে নিরাপদ।"

খুশী উপচে পড়ল কৌ-য়ের চোখে মুখে—"ইমিউনিটি ফ্যাক্টর যদি দীননাথ বাবুর দৌলতে পেয়ে থাকি, তাহলে তাঁর ঋণ আমি—"

কথাটা শেষ করতে দিলেন না প্রফেসর। বললেন নির্লজ্জের মত—

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অ্যান্টিবডি ওরই, কিন্তু পেয়েছেন আমার দৌলতে। আমিই ভেবে চিন্তে দেখলাম দীননাথের মধ্যে যা আছে, নিশ্চয় আমাদের মধ্যে তা নেই—তাই এই বিপত্তি।" বলে, দুধের মত সাদা তরল পদার্থের একটা শিশি তুলে দিলেন কৌ-য়ের হাতে—"এই সেই বিষঘ্ন ওষুধ—অ্যান্টি-ডোট। আপনার কাজ কিন্তু অনেক ডক্টর। এই অ্যান্টিডোট যদি ইমি-উনিটি দান করতে পারে, তাহলে এ-থেকেই ভাইরাস-হুজুরকে আক্রমণ করার দাওয়াই বার করা যেতে পারে, ঠিক কিনা?"

আঁৎকে উঠলেন কৌ—"ভাইরাস-হুজুরকে আক্রমণ করবেন? ওরে বাবা, সে যে দারুণ বিপজ্জনক ব্যাপার, প্রফেসর।"

"বিপজ্জনক তো বটেই! কিন্তু তা না করে যদি ডিম পাড়তে দিই বেটাচ্ছেলেকে, আর সেই ডিম ফুটে যদি আরও ভাইরাস বেরিয়ে আসে, তাহলে দানব-পঙ্গপালের প্লেগে গোটা ছায়াপথটার বিপদ সমাসন্ন।"

"তা বটে! তা বটে!" বড়ই ভাবিত দেখালো কৌ-কে—"আচ্ছা ধরুন ভাইরাস হারামজাদাকে ধ্বংস করার একটা পথ বার করা গেল, তখন কি এই অ্যান্টিডোট সময় মত টাইটানে পৌঁছে দিতে পারবেন?"

"তা পারবো বৈকি!" বুক ফুলিয়ে বললেন প্রফেসর। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন বুথের সামনে। জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রটাকে সস্নেহে চাপড়ে বললেন—"এই তো আমার হারানিধি—টাইম-মেশিন আবার সচল হবে…"

হুজুর ডিম পাড়বে, কাতারে কাতারে ভাইরাস সেই ডিম ফুটে বেরুবে—একি চাট্টিখানি কথা? তাই বিপুল আয়োজন চলেছে টাইটানে সেই মুহূর্তে। বিরাট ট্যাঙ্কটা চারদিক থেকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ভেতরে ঢোকার পথ শুধু একটাই—একটা ধাতুর দরজা। যেমন পুরু, তেমনি মজবুত।

একজন গোলাম-বৈজ্ঞানিক পুরু প্লাস্টিক-কাঁচের জানালা দিয়ে তাকালো ভেতরে। ধাতুর দরজার গায়ে পোর্টহোলের মত গোলাকার গবাক্ষ। দেখল, অতিকায় ট্যাঙ্কটা ফুটন্ত, বুদবুদময় তরল পদার্থে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। পাশেই আঁটা একটা কন্ট্রোল প্যানেলের রেখাচিত্র দেখে যেন নয়ন সার্থক হল অমানুষ বৈজ্ঞানিকের। তাপমাত্রা, পুষ্টিকর দ্রব্য,

পরিবেশ—সমস্তই যথাবিহিত, যেমনটি হওয়া উচিত সেই রকম।

গর্বের হাসি হেসে গোলাম-বৈজ্ঞানিক গিয়ে দাঁড়াল কোণে রাখা স্পেশ-রেডিওর সামনে। স্পীকার-মাইক্রোফোনটা তুলে নিয়ে বললে জলদগম্ভীর স্বরে—"চ বলছি টাইটান থেকে। চ বলছি টাইটান থেকে। মৌচাক প্রস্তুত। ডিম পাড়ার ট্যাঙ্কগুলোও প্রস্তুত। তাপমাত্রা আর আর্দ্রতা সঠিক।"

ঘাড় ফিরিয়ে সগর্বে ফুটন্ত দ্যুতিময় ট্যাঙ্কের চেহারাখানা দেখে নিয়ে ফের বললে গলা চড়িয়ে—''হুজুর, আপনার প্রতীক্ষায় প্রস্তুত আমরা—আসুন, শুরু হোক ঝাঁকের যুগ!"

যন্ত্রযানের মারাত্মক স্পীডে তখন ভয়ংকরভাবে কাঁপছে কন্ট্রোল কেবিন—এই বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। তাতেও সন্তুষ্ট নয় ভাইরাস-হুজুর। তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—"তাড়াতাড়ি! আরও তাড়াতাড়ি!" স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে জুতো খুলে সপেটা হুজুরের মুখে মারত মু। কিন্তু এখন যে গোলাম। তাই বললে অসহায় গলায়—''এর বেশী জোরে তো আর চালাতে পারবো না। চরম স্পীডে ছুটছি—"

''কোনো কথা শুনতে চাই না···আরো জোরে চালা বাঁদরের বাচ্চা! ডিম পাড়ার আর দেরী নেই······"

ভীমবেগে ধেয়ে চলল যন্ত্রযান। টাইটানে পেঁছোনো মাত্র কিন্তু শুরু হয়ে যাবে মানব জাতির শেষ লগ্ন······

পাঠকপাঠিকারা কি উৎকণ্ঠিত? আমি নিরুপায়!

১৮ ॥ মৌচাক

আইসোলেশন ওয়ার্ডে তখন আবার প্রবল ব্যস্ততা দেখা দিয়েছে। আমি, প্রফেসর আর ক-৫ রিসার্চ হসপিট্যাল থেকে সংক্রামিত ডাক্তারদের পাকড়াও করে আনছি অজ্ঞান অবস্থায়। পা টিপে টিপে আগে আমি দেখে নিচ্ছি, অমানুষ গোলামরা রয়েছে কোথায়, কোন ঘরে—পেছন থেকে ক-৫ সুড়ুৎ করে এগিয়ে গিয়ে হলুদ রশ্মি নিক্ষেপ করে তাদের চৈতন্যহরণ করছে। হিড়হিড় করে অচৈতন্য দেহগুলো আমি টেনে আনছি আইসোলেশন ওয়ার্ডে। প্যাঁট প্যাঁট করে অ্যান্টিডোট শরীরে ফুঁড়ে দিচ্ছেন কো।

কিছু চিকিৎসককে এই ভাবে নিরাময় করার পর তারাই আবার শশব্যস্তে আরও অ্যান্টিডোট উৎপাদন করছে, সতীর্থদের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ছে এবং তাদের আরোগ্য করছে। সময় লাগছে প্রচুর, ধীরে ধীরে কাজ এগোলেও রিসার্চ হসপিট্যালের স্বাভাবিকতা কিন্তু ফিরে আসছে একটু একটু করে।

এই পর্যন্ত বেশ লাগছিল আমার। লাফঝাঁপ করতে চিরকালই আমার ভাল লাগে। কিন্তু তারপরেই আবার অস্থির হলাম। ডক্টর আর প্রফেসর দুজনে খুব ব্যস্ত মারণ-ভাইরাস উৎপাদন নিয়ে—এমন মারাত্মক হবে সেই মারণ-ভাইরাস যা কেন্দ্রিন মহাপ্রভু আর পুরো ঝাঁকটাকে সবংশে কব্জায় আনবে। খুবই দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়া। তাই আমার ধৈর্য ফুরিয়েছে। মুখোশপরা ডাক্তারদের ভাইরাস-কালচারের ডিশ হাতে ছুটোছুটি দেখতে দেখতে চোখ টাটিয়ে উঠেছে।

অধীর কণ্ঠে অবশেষে বলেই ফেললাম—"আর কত দেরী, প্রফেসর ?"

"তাড়া দিও না। ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি দ্রুতবেগেই চলছে—তাড়া দিয়েও কিছু হবে না। কম্পিউটার-মাইক্রোসকোপে ক-৫কে কানেকসন করে দিয়েছি সবচেয়ে শক্তিশালী ভাইরাস প্রজাতি জন্মালেই খবর দেবে ও।"

আকাশ পাতাল ভাবলাম কিছুক্ষণ। তারপর বললাম—"অত ঝুটঝামেলায় দরকার কী ? পুরো টাইটান-টাকেই বোমা মেরে উড়িয়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। ভাইরাস-হুজুর, ডিম ভর্তি ট্যাঙ্ক—সব ধ্বংস হয়ে যাক।"

ধমকের সুরে প্রফেসর বললেন—"বোমবাজিটা ভালোই শিখেছো দেখছি। সব সমস্যার সমাধান একটাই জানো—মারো বোমা! পার্টি করো নাকি ?"

"চট করে কাজ হাসিল হয় কিনা বলুন ? চক্ষের পলকে শত্রু নিপাত।"

কৌ তেড়ে উঠলেন—"বোমাটা কোথায় ? এটা কি অস্ত্রাগার যে বারুদের ডিপো নিয়ে বসে আছি ? হাসপাতালে গোলাগুলি থাকে ?"

ডবল ধমক খেয়ে কথার মোড় ঘুরিয়ে নিলাম—"তাহলে কি করতে চান বলুন ? লড়াইটা করবেন কি করে ?"

এমন সময়ে ভারিক্কি চালে গড়গড়িয়ে সামনে চলে এলো ক-৫। ভাবখানা যেন যুদ্ধজয় করে এলো। বললে গম্ভীর গলায়—"প্রজাতি নং

ঙ-৩০৯ সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী।"

উত্তেজনায় প্রায় দুম্ করে ফেটে পড়েন আর কি কো। দৌড়ে গেলেন সারি সারি ভাইরাস-প্রজাতির দিকে। এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়েই দুহাত মাথার ওপর তুলে সৌম্যদর্শন বৈজ্ঞানিক গৌরাঙ্গ-ভঙ্গিমায় নৃত্য করতে করতে বললেন—"প্রফেসর! মাই ডিয়ার প্রফেসর! এক লক্ষ অভিনন্দন গ্রহণ করুন! এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল।" পরক্ষণেই সহকারী ডাক্তারদের ওপর হুকুম ছাড়লেন—"ব্যাচ নম্বর ঙ-৩০৯-য়ের উৎপাদন শুরু করে দিন সবাই মিলে। এখুনি! এখুনি! আর একটা সেকেন্ডও নষ্ট করা চলবে না!"

মদন আর কী! এখন আর মোটে তর সইছে না!

প্রফেসর হেঁট হয়ে ক-৫য়ের পিঠ চাপড়ে বললেন উত্তেজনা সামাল দিয়ে "বেঁচে থাকো, বাবা, দীর্ঘজীবি হও!"

এ সব নাটক দেখবার মত মনের অবস্থা আমার নেই তখন। তেড়ে উঠলাম—"এবার কি করতে হবে, তাই বলুন।"

"ডিমভর্তি ট্যাঙ্কে ঙ-৩০৯-কে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপর ধৈর্য ধরতে হবে। ঠিক যেভাবে ভাইরাস-হুজুর আণুবীক্ষণিকভাবে আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল—একই পন্থায় ঙ-৩০৯ চড়াও হবে ওদের ওপর—আণু-বীক্ষণিকভাবে! পরিষ্কার কাজ, কি বলো হে ছোকরা?"

ব্যঙ্গের সুরে বললাম—"খুব পরিষ্কার কী? সময় থাকতে যদি টাইটানে পেঁছোতে পারি, মু-য়ের চোখে ধুলো দিতে পারি, ডিমের ট্যাঙ্ক পর্যন্ত পেঁছোতে পারি, তবেই তো ঙ-৩০৯কে ঢালবেন। অত সোজা নয়, প্রফেসর। বোমা মেরে সবশুদ্ধ উড়িয়ে দেওয়া ওর চাইতে অনেক সোজা।"

"খুন খারাপি আমি পছন্দ করি না।"

"তবে এত হাঙ্গামা করছেন কেন?"

মোক্ষম প্রশ্ন। কোণঠাসা করতে পেয়েছি এবার প্রফেসরকে। ওঁরই কথার প্যাঁচে জড়িয়ে দিয়েছি ওঁকে।

কিন্তু চীজ বটে একখানা প্রফেসর। বললেন সঙ্গে সঙ্গে—"ভাইরাসেরও অধিকার আছে ভাইরাস হিসেবে থাকার—কিন্তু দানব-ঝাঁক নিয়ে ছায়াপথ দখল করার কোনো অধিকার তার নেই। মহাবিশ্বে প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট

জায়গা আছে—নইলে ব্রহ্মাণ্ডের ভারসাম্যই নষ্ট হয়ে যাবে। ভাইরাস-হুজুরকে তাই মারণ-ভাইরাস দিয়ে বলহীন করব—একেবারে মারব না—প্রজাতি নম্বর ঙ-৩০৯কে সেইভাবেই উৎপাদন করা হচ্ছে।"

চোখ কপালে উঠে গেল আমার। এমন কি কৌ পর্যন্ত চমকে উঠলেন। বললেন আতীক্ষ্ম কণ্ঠে—"সেকী! ঐ সর্বনাশকে টিঁকিয়ে রাখার দরকারটা কী?"

ভারিক্কি গলায় প্রফেসর বললেন—"আছে, আছে, দরকার আছে।"

"কী দরকার?"

"সেটা কি এখনই জানা দরকার?"

"নিশ্চয়!"

"সময় খুব কম। প্ল্যানটা খালি শুনুন। ওকে ওর ডেরায় নিয়ে যাবো।"

"ওর ডেরা! সে তো মহাশূন্যে!"

"আছে, আছে, ওরও একটা ডেরা আছে। যেখানে আছে ওরই মত আরও ভাইরাস।"

"কিন্তু সেটা কোথায়?"

"পরে বলব।"

"কিন্তু ও তো তা বলেনি?"

"ও বলেনি—আমার ভয়ে। কিন্তু আমার এই ব্রেনখানা দেখেছেন।" নিজের উন্নত ললাটে টোকা মারলেন প্রফেসর—"এই ব্রেনের কাছে কিছুই গোপন থাকে না।"

তিক্ত গলায় ডক্টর বললেন—"বড়াই পরে করবেন। কি করবেন সেখানে ওকে নিয়ে গিয়ে?"

"নিস্তেজ ভাইরাসকে দিয়ে ওদের সাঙ্গপাঙ্গদের বুঝিয়ে দেব মানুষের পেছনে লাগতে এলে পরিণামটা কি হয়। তারপর আমি আর দীননাথ—দুজনেই যখন ওদের অবধ্য—ঙ-৩০৯ ছড়িয়ে দেব যাতে প্রত্যেকেই নিস্তেজ শক্তিহীন হয়ে যায়—ভবিষ্যতে ডেরা থেকে কেউ আর ছিটকে বেরিয়ে এসে ছায়াপথের বিপদ ডেকে আনতে না পারে।"

প্ল্যানটা মনে ধরল ডক্টরের। আমতা আমতা করে বললেন—"কিন্তু ডেরাটা কোথায় বলবেন তো?"

আবার এক ধমক লাগালেন প্রফেসর—"এই দীননাথ অপোগণ্ডটার মত এক কথা বারবার জিজ্ঞেস করছেন কেন ? বললাম তো পরে বলব ।"

আমি কিন্তু ভবি ভোলবার নয় । বিড় বিড় করে বললাম—"কি দরকার অত ঝামেলায়—সোজা বোমচার্জ করলেই ল্যাটা চুকে যায় !"

"থামো তুমি !"

কৌ দৌড়ে গিয়ে ভ্যাকুম-পাত্রটা নিয়ে ফিরে এলেন—"এই নিন প্রফেসর । ব্যাচ প্রস্তুত ।"

পাত্রটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ আধবোঁজা চোখে সেদিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর । তারপর বললেন স্বগতোক্তির সুরে—"চমৎকার ! চমৎকার ! এবার যাত্রা শুরু হোক টাইম-মেশিনের !"

এদিকে টাইটান ঘাঁটিতে শুরু হয়েছে আর এক রোমাঞ্চকর পর্ব ।

কেন্দ্রিন শয়তান বেরিয়ে এল এয়ারলকের মধ্যে দিয়ে । অতি মন্থর গতিতে যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে এগিয়ে গেল করিডর বরাবর । পরম অনুগত বান্দারা চারপাশ থেকে ধরে তাকে নিয়ে চলল ট্যাঙ্কের দিকে । যেন ঠাকুর নিয়ে চলেছে বেদীতে বসিয়ে পুজো করবে বলে !

অতিকায় জুলানি ট্যাঙ্কের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল চ । বুক ফুলিয়ে হ্যাচ খুলে ধরল হুজুরকে দেখেই । হাঁসফাঁস করতে করতে ট্যাঙ্কের কিনারায় গিয়ে উঠল শয়তান শিরোমণি ।

গলার মধ্যে জল নিয়ে গার্গল করলে যে রকম বিটকেল শব্দ হয়, অবিকল সেই রকম আওয়াজে বললে—"মনে রাখিস, যতক্ষণ মৌচাকের মধ্যে থাকব, ততক্ষণ পাহারা দিতে হবে আমাকে । ঝাঁকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তোদের হাতে ।"

অপরসীম শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে রইল মু, চ আর অন্যান্য গোলামবৃন্দ । পুষ্টিকর দ্রব্য বোঝাই ট্যাঙ্কের মধ্যে অন্তর্হিত হল কেন্দ্রিন ।

পেছিয়ে এল চ । দরজা বন্ধ করে দিল সশ্রদ্ধ ভঙ্গিমায় ।

ঝাঁক সৃষ্টি শুরু হতে আর দেরী নেই ।

প্রফেসর তো নিমীলিত নয়নে বললেন—"এবার যাত্রা শুরু হোক টাইম-মেশিনের !" আমি কিন্তু ভরসা পেলাম না ।

সদলবলে আমরা তখন এসে দাঁড়িয়েছি তারামণ্ডলের মত বিরাট সেই

হলঘর খানায়। যে-ঘরের চার দেওয়ালের বদলে বহু দেওয়াল এবং সবগুলো দেওয়ালই বিভিন্ন কোণে বাঁক নিতে নিতে সিলিং বানিয়ে ফেলেছে। গম্বুজ আর ঘরের মাঝামাঝি ধাতব-দেওয়ালের গা থেকে নরম দ্যুতি ঠিকরে আসছে। আমরা যেন এসে দাঁড়িয়েছি দ্যুতিময় একটা হীরকখণ্ডের ঠিক মাঝখানে।

সামনেই দাঁড়িয়ে আমাদের সময়-গাড়ী—অটল, অনড়। খুব আস্তে আস্তে ঘুরছে প্রকাণ্ড ফ্লাই হুইলটা।

এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম। চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল সেই দৃশ্য। মহাশূন্যে সময়-পথে টলমল করতে করতে, ডিগবাজি খেতে খেতে ছুটছে সময় যন্ত্র। যেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে একটা জাহাজ। অত্যুজ্জ্বল কতকগুলো আলোকবিন্দুর সঞ্চরণ দেখা যাচ্ছে…ফ্লাই হুইল ঘুরছে দ্রুতবেগে…প্রফেসর বললেন, "সময়-গাড়ী এখুনি হল্ট করবে। চুপ করে বসে থাকো। অটোমেটিক রিটার্ন চালু আছে। ঠিক তিন মিনিট পরেই টাইম-মেশিন নিজে থেকেই ফিরে যাবে ১৯৮১-র কলকাতায়।" আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম—"মাত্র তিন মিনিট?" প্রফেসর বলেছিলেন—"অটোমেটিক রিটার্ন যদি বিগড়ে গিয়ে না থাকে, তবেই তিন মিনিট। নইলে যে কত মিনিট, তা আমিও বলতে পারব না।"

প্রফেসরের আশংকাই সত্যি হয়েছে শেষ পর্যন্ত। অটোমেটিক রিটার্ন কিন্তু বিগড়েছে। নইলে সমর-গাড়ী এখনো এখানে কেন? ফ্লাই-হুইল তো চালু রয়েছে। কিন্তু ১৯৮১ র কলকাতায় তো সময়-গাড়ী রওনা হয়নি! আর, অটোমেটিক রিটার্ন যদি বিকল থাকে, তাহলে সময়-গাড়ীর যন্ত্রপাতিও ঠিক আছে কিনা সন্দেহ। এই ঘরে থামবার সময়ে যা কয়েকখানা ডিগবাজি খেয়ে ঠিকরে গিয়েছিল—কলকব্জার মধ্যে আরও ভাঙচুর হয়েছে কিনা, ঈশ্বর জানেন।

তাই ভরসা পেলাম না প্রফেসরের কথায়। টাইম-মেশিনে চড়া আর নিরাপদ নয়। এই ভয়েই বারবার প্রস্তাব করছিলাম, এদেরই কোনো যন্ত্রযানে চেপে দূর থেকে বোমা ফেলা যাক।

কিন্তু প্রফেসর তো দেখছি নির্বিকার। বুক ফুলিয়ে চিবুক উঁচু করে বিরাট একটা কিছুর মত গটগট করে গিয়ে উঠে বসলেন সময়-গাড়ীর গদীতে। হেঁকে বললেন—"পা যে আর নড়ছে না তোমার! উঠে এসো না।"

পাছে কো-য়ের সামনে আবার মুখনাড়া খেতে হয়, তাই কথা বাড়ালাম না। এক যাত্রায় আর পৃথক ফল হয় কেন, এই ভেবে উঠে বসলাম তাঁর পাশে। কানে কানে বললাম—"মেশিন ঠিক আছো তো ?"

উচ্চকন্ঠেই জবাব দিলেন প্রফেসর—"ডাইমেনশনাল স্টেবিলাইজার নিয়ে যাওয়ার সময়ে সেটা দেখে যাওয়া হয়েছে।"

"অটোমেটিক রিটার্ন ?"

জবাব দিলেন না প্রফেসর, বুঝলাম ঐ ব্যাপারটায় এখনো উনি নিশ্চিত নন। মরুক গে, যাঁর গাড়ী, তিনিই যখন চালক—তখন তিনিই নিজে থেকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন'খন ১৯৮১র কলকাতায়।

"চললাম, ডক্টর," স্টার্টারে হাত রেখে বললেন প্রফেসর।

"যাবার সময়ে যাই বলতে নেই প্রফেসর। বলুন, আসি।" একেবারে মা দিদিমা'র ঢংয়ে বললেন কো। শুনেই মনটা কিরকম করে উঠল আমার।

মুচকি হাসলেন প্রফেসর।

বললেন—"দেখা যাক।"

কি দেখতে চান ? ধাঁধায় পড়লাম।

"জয় হোক আপনার," বললেন কো।

"আপনারও হোক," বলে স্টার্টার ঠেলতে গিয়ে থমকে গেলেন প্রফেসর—"ডক্টর।"

"বলুন !"

"ক-৫'কে ধার দিতে পারেন ?"

"কেন বলুন তো ?"

"বড় ন্যাওটা হয়ে পড়েছে আমার—মন কেমন করছে কিনা, তাই।"

"বেশ তো, সঙ্গে নিন না। ক-৫, প্রফেসর যা বলবেন, শুনবে। যাও।"

"তথাস্তু, প্রভু," বলেই গড়গড়িয়ে লাফ দিয়ে ক-৫ উঠে এল সময়-গাড়ীতে।

কয়েক পা পেছিয়ে গেলেন কো।

স্টার্টার ঠেলে দিলেন প্রফেসর। গোটা টাইম-মেশিনটা আচমকা যেন সামনের দিকে টলে পড়ল। এ-অনুভূতি আগেও হয়েছিল। মনে হয়েছিল যেন পাতাল-গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। প্রফেসরকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। এখন সে সব কিছুই করলাম না। কাঠ

হয়ে শুধু বসে রইলাম। বেশ বুঝলাম ফোর্থ ডাইমেনশানে এসে পড়েছি। অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশানের মধ্যে রয়েছি। ছুটে চলেছি সময় পথে। থমথমে নীরবতার সেই চার মাত্রিক জগতের বর্ণনা আগেও দিতে পারিনি— এখনো পারব না।

টাইটান ঘাঁটির অলিন্দ পথে গটমট করে তখন হেঁকে চলেছে মু— পেছনে সাঙ্গপাঙ্গ। প্রত্যেকের হাতে ব্ল্যাস্টার। গোলোক ধাঁধার মত গলি ঘুঁজির গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে একজন করে গোলামকে পাহারায় রেখে যাচ্ছে।

হুজুরের হুকুম ঘাঁটি সুরক্ষিত রাখতে হবে। সে হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল করে বিরাট জ্বালানি ট্যাঙ্কের সামনে আবার ফিরে এল মু। পোর্টহোল জানলা দিয়ে দেখল ভেতরে।

নির্জীবের মত পড়ে রয়েছে হুজুর। ধূসর বর্ণের বুদ্‌বুদ্‌ কাটা জেলী সাগরে ধীর ছন্দে স্পন্দিত হয়ে চয়েছে পরম স্বস্তিতে। চারপাশে ওপরে নিচে থুক থুক করছে হাজার হাজার লাখ লাখ ডিম। গোলাকার সাদা ডিম। আকারে টেনিস বলের মত বড়। ফুটন্ত জেলী ট্যাঙ্কে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে···আপনা থেকেই তা দেওয়া হয়ে চলেছে—সময় হলেই ডিম ফুটে বেরিয়ে আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে······

বাহাদুর চালক বটে প্রফেসর। অদ্ভুত নৈপুণ্যে সময়-গাড়ীকে দৃশ্যমান করে তুললেন সুপারভাইজর মু-য়ের অফিস কক্ষে। টলমল করল না। গত-বারের মত থামবার সময়ে পর পর ডিগবাজী খেয়ে ছিটকে ফেলে দিল না।

নেমে দাঁড়ালাম আমরা। অটোমেটিক রিটার্ন তো বিকল। ভয় কিসের? দেওয়ালের ভিসিফোন স্ক্রীনে দেখা গেল ডিম পাড়ার ট্যাঙ্কের ভেতরের দৃশ্য। ফুটন্ত জেলীতে ভাসমান অগুন্তি ডিমের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন প্রফেসর।

বললেন—"হুম! ডিম পাড়া পুরোদমেই চলেছে দেখছি।"

আমি কিন্তু রোমাঞ্চিত হলাম সেই গা-ঘিনঘিনে দৃশ্য দেখে। বললাম সভয়ে—"কী এটা?"

"ঝাঁক। ডিম ফুটে বেরোনোর জন্যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর দেরী করা সমীচীন হবে না।"

বলেই আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন—"কি হল ? অমন কাঠ হয়ে গেলে কেন ?"

"পায়ের আওয়াজ পাচ্ছেন না ?"

"কই না তো ?" অফিসঘরের দরজার দিকে তাকালেন প্রফেসর।

"আমি পাচ্ছি। পাহারাদার আসছে এদিকে। সময়-গাড়ীর আওয়াজ নিশ্চয় কানে গেছে।"

হাতের ইসারায় ওঁকে পেছিয়ে যেতে বললাম। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম দরজার আড়ালে। হাতে রইল ব্ল্যাস্টার।

ইঙ্গিত করতেই বুঝলেন প্রফেসর। ডাক দিলেন পরম ফুর্তিতে—"ভেতরে এসো হে !"

হাতে ব্ল্যাস্টার নিয়ে চৌকাঠ পেরোলো প্রহরী। আমি ব্ল্যাস্টার ছুঁড়লাম। নির্ভুল লক্ষ্য। টলমল করে উঠেই আবার সিধে হয়ে গেল কিন্তু সে—পড়ে গেল না। আবার ছুঁড়লাম ব্ল্যাস্টার। আবার…আবার ! এত কাছ থেকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু একবারও তাকে শোয়াতে পারলাম না। যন্ত্রণায় বীভৎস মুখটা কেবল বেঁকে গেল। হাতের ব্ল্যাস্টার আস্তে আস্তে টিপ করল আমার দিকে। আবার ব্ল্যাস্টার বর্ষণ করলাম। এবারও কোনো কাজ হল না।

আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে কি করব ভাবছি, অবশ্য তখন পরলোকের কথাই কেবল ভাবা উচিত ছিল—প্রহরীর ব্ল্যাস্টার চোঙ তখন উঠে আসছে আমার বুকের দিকে—

এমন সময়ে কাজ দিল ক-৫'য়ের উপস্থিত বুদ্ধি। নিঃশব্দে গড়িয়ে এসে নাকের চোঙ থেকে ব্ল্যাস্টার বর্ষণ করল। এবার আর প্রহরী বাছাধন পার পেল না। দড়াম করে পড়ল মুখ থুবড়ে—আর নড়ল না।

এতক্ষণ দম নিতেও পারিনি। মরণ সামনে দেখলে বুঝি এমনি অবস্থাই হয়। এবার গভীর শ্বাস নিয়ে বললাম—"ক-৫। তুমি না থাকলে আজ…কিন্তু প্রফেসর, ব্যাপার কি বলুন তো ? ব্ল্যাস্টার কাজ করল না কেন ?"

নিস্পন্দ প্রহরীর দেহটা তখন উল্টে পাল্টে দেখছেন প্রফেসর। ভাইরাস-সংক্রমণ খুব বেশী রকমের হয়েছে দেখা গেল। গা ফুটে সব চিহ্নই অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকট। মুখ, হাত ঘন শক্ত তারের মত কর্কশ লোমে ছেয়ে

গেছে। ভুরু দুটোয় যেন দু-আঁটি কালো খড় বাঁধা রয়েছে। বীভৎস! কদর্য! ভয়ংকর!

প্রফেসর বললেন—"মহাসমস্যায় পড়লাম হে দীননাথ।"

"কি হয়েছে?"

"ব্যাটাচ্ছেলেদের আভ্যন্তরীন কোষ গঠন পাল্টে যাচ্ছে। বিকিরণ-শক্তিকে রুখে দেওয়ার শক্তি কোষে কোষে জেগে উঠছে।"

"এখন উপায়?"

উপায়টা আর শোনা হল না। তার আগেই আরেকটা মহাসমস্যা এনে হাজির করল ক-৫—"প্রভু! আমার আক্রমণ-ক্ষমতা দারুণ ভাবে কমে আসছে…রিজার্ভ ফুরিয়ে আসছে…।" বলতে বলতে ম্যাড়মেড়ে হয়ে এল বেচারীর দুই চোখ, ঝুলে পড়ল সব কটা অ্যান্টেনা-শুঁড়, নড়ন চড়নও প্রায় আর রইল না—যেন একটা নিস্পন্দ যন্ত্র!

"সর্বনাশ।" বললাম আমি—"ক-৫ তো খতম হতে চলল, আমার ব্ল্যাস্টারও অকেজো। কি করি এখন বলুন তো?"

প্রফেসরের ঘোলাটে চোখে হীরক দ্যুতি দেখা গেল। এ দ্যুতি যখনই দেখা যায়, বুঝতে পারি প্রফেসরের উর্বর মস্তিষ্ক ভীষণ ভাবে সচল হয়েছে। উজ্জ্বল চক্ষু আমার ওপর নিবদ্ধ রেখে বললেন উনি—"দীননাথ।"

"বলুন।"

"আমার বুদ্ধিমত্তার ওপর আস্থা আছে?"

"কী বলছেন? আমার আস্থা থাকবে না তো—"

"তাহলে বুদ্ধির খানিকটা এবার খরচ করা যাক," বলতে বলতে করিডরে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর। পেছন পেছন দৌড়োলাম আমি। ক-৫কেও ডেকে নিয়ে এলাম। ক্ষ্যাপাটে প্রফেসর না জানি শত্রুপুরীতে আবার কি ঝামেলায় পড়েন।

কিছু দূর যেতে না যেতেই একটা চার মাথার মোড়ে এসে পৌঁছোলাম। ব্ল্যাস্টার হাতে রক্ষী মোতায়েন সেখানে। দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। ফিস্ ফিস্ করে ক-৫কে বললেন প্রফেসর—"পাহারাদারকে দেখছো?"

"হ্যাঁ।

"ওকে ভুলিয়ে নিয়ে যাও অন্যদিকে।"

সঙ্গে সঙ্গে সড়াৎ করে রক্ষীর সামনে গড়িয়ে গেল ক-৫। হতভম্ব রক্ষী ক্ষণকাল বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থেকে ব্ল্যাস্টার উঁচিয়ে ধরল পরক্ষণেই। এঁকেবেঁকে দৌড় দিল ক-৫। শুরু হয়ে গেল ব্ল্যাস্টার-বর্ষণ। কোনো-টাই কিন্তু স্পর্শ করল না ক-৫'কে। ছুটন্ত দুই মূর্তি দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল দূরে।

পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম আমি আর প্রফেসর। এ বর্মরডর শেষ হয়েছে বিশাল একটা গহ্বরে। ঘোলাটে অন্ধকারে ছাওয়া। আলো থেকেও নেই যেন। গহ্বরটা কেনটাকির ম্যামথ-গুহাকেও হার মানিয়ে দেয়—এত বড়। গা ঘেঁসে রয়েছে সারি সারি পেল্লায় গ্যাস ভর্তি ট্যাঙ্ক। কেন্দ্রে বসানো ডিম পাড়ার অতিকায় ট্যাঙ্কখানা। বাইরে পাহারা দিচ্ছে দুই মূর্তিমান—মু আর চ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রফেসর ভাবছেন এরপর কি করবেন, এমন সময়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে এসে পেছন হল্ট করল ক-৫। পাল্টু-নেওয়া রক্ষীর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছে। চৌকস কুকুর বটে!

"হুকুম তামিল করেছি, প্রভু।"

"গুড ডগ ক-৫। এবার তোমার পালা, দীননাথ।"

"কি করব?"

"কুকুরটাও দেখছি তোমার চাইতে তাড়াতাড়ি বোঝে!"

একটা যন্ত্র-কুকুরের সঙ্গে তুলনা করায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে অপমানে চিড়বিড় করে উঠল আমার। মাথা ঠাণ্ডা রাখলাম অতি কষ্টে।

প্রফেসর বললেন—"ক-৫ এখুনি যা করল, ঠিক তাই করো। পথ ভুলিয়ে ঐ দুই মক্কেলকে অন্য দিকে নিয়ে গিয়ে রাস্তা সাফ করে দাও আমার।"

"ওঃ, এই ব্যাপার," বলেই রাগ অপমান ভুলে পা বাড়ালাম তৎক্ষণাৎ। পেছন থেকে হাত ধরে টেনে ধরলেন প্রফেসর। বললেন স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে —"টাইম-মেশিনে ফের দেখা হবে, কেমন? আগে যাও তুমি—কাজ সেরে যাচ্ছি আমি।" বলে দুই চোখের নিবিড় দৃষ্টি মেলে ধরলেন আমার ওপর। স্থির গভীর চাহনি! আমি সে চাহনির মানে বুঝলাম এবার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে। উনি মরণপণ করে এগোচ্ছেন। বড় বিপজ্জনক ঝুঁকি নিচ্ছেন। কি সেই ঝুঁকি আমি জানি না। আমাকে বলেন নি। কিন্তু চোখের

চাইনির নীরব ভাষা থেকে বুঝলাম—নাও ফিরতে পারেন।

আমি সব বুঝেও বাধা দিলাম না। একটা কথাও বললাম না। দিয়ে তো কোনো লাভ নেই। সেণ্টিমেণ্টের দাম ওঁর কাছে কানাকড়িও নেই। নীরবে শ্রদ্ধায় হাত দুটো শুধু চেপে ধরে পরক্ষণেই পেছন ফিরে দৌড়ে গেলাম খোলা জায়গায়।

চকিতে তৎপর হল চ। উঁচিয়ে ধরল ব্ল্যাস্টার। শক্তিপুঞ্জ ধেয়ে এল আমাকে লক্ষ্য করে। আমি তার জন্যে তৈরী ছিলাম। মুহূর্তের মধ্যে মেঝেতে লাফ মেরে গড়িয়ে গিয়ে আবার উঠে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলাম পাশের আর একটা করিডরে। পেছন পেছন ছুটে এল চ।

মু কিন্তু নড়ল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ট্যাঙ্কের সামনে।

পরে শুনেছিলাম, প্ল্যান অনুযায়ী কাজ না হওয়ার বিষম মুষড়ে পড়েছিলেন প্রফেসর। রোবট হয়েও প্রফেসরের শুকনো মুখ দেখে মায়া হয়েছিল ক-৫য়ের।

বলেছিল ফিস ফিস বরে—"ভাবছেন কেন? আমি তো রয়েছি।"

"আমাকে একলা ফেলে যাবে?" রোবট বলেই অসঙ্কোচে প্রাণের ভয় মুখে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন প্রফেসর।

প্রফেসরের হুকুমের অপেক্ষা না রেখেই সোজা মু-য়ের দিকে ছুটে গিয়েছিল ক-৫—

চোখের পলক ফেলবার আগেই ব্ল্যাস্টার বর্ষণ করেছিল মু। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। ক-৫ ব্ল্যাস্টার চালিয়েছিল ইলেকট্রনিক স্পীডে। কিন্তু শক্তির ভাঁড়ার ফুরিয়ে আসায় তার নিজের গতিই তখন মন্থর, লক্ষ্যও স্থির রাখতে পারেনি। মু কুপোকাৎ হওয়া দূরে থাকুক, উল্টে এমন নির্ভুল লক্ষ্যে ব্ল্যাস্টার বর্ষণ করেছিল যে চর্কিপাক খেয়ে ঘুরতে আরম্ভ করেছিল ক-৫। আবার ব্ল্যাস্টার ছুঁড়েছিল মু। এবার একেবারেই বেসামাল হয়ে সোজা ধেয়ে গিয়ে ট্যাঙ্কের দরজার কাছেই বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ক-৫, আর নড়েনি।

প্রফেসর এই সুযোগের অপব্যবহার করেন নি। ক-৫ মরল কি বাঁচল, তা দেখবার ফুরসৎ তখন তাঁর ছিল না। অস্ত্র-যুদ্ধ শুরু হতেই মু-য়ের দৃষ্টি চলে গিয়েছিল ক-৫য়ের ওপর। সেই সুযোগে বাঁই বাঁই করে আড়াল থেকে বেরিয়ে ট্যাঙ্কের দরজার সামনে পৌঁছেছিলেন তিনি। একহাতে

ভ্যাকুম বাক্স ধরে আরেক হাতে হ্যাচ নিয়ে টানাটানি করছেন—

এমন সময়ে আরও কয়েকবার শক্তি-বর্ষণ করে ক-৫কে সাবাড় করতে গিয়ে মু-য়ের চোখ পড়ে গিয়েছিল তাঁর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে হাতিয়ার ছুঁড়েছিল তাঁকে টিপ করে। চকিত বর্ষণে লক্ষ্য ঠিক থাকেনি—প্রফেসরের প্রাণপাখী খাঁচায় থেকে গেছে—কিন্তু চুরমার হয়ে গেছে হাতের ভ্যাকুম বাক্স। অমূল্য সিরাম গড়িয়ে গিয়েছে মেঝের ওপর দিয়ে।

"হায়, হায়" করে উঠেছিলেন প্রফেসর। মূহ্যমানের মত চেয়েছিলেন মাটির দিকে—প্রাণের মায়াও বিস্মৃত হয়েছিলেন সেই মুহূর্তে।

তাঁর সেই স্থাণু বিমূঢ় অবস্থা দেখে মায়া হয়নি কিন্তু হতচ্ছাড়া মু-য়ের। হাতিয়ার তাঁর দিকে উঁচিয়ে রেখেই পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসেছিল সামনে। বলেছিল নির্দয় কণ্ঠে—"হুজুরের খিদে এবার মেটা হারামজাদা," বলে, একহাতে খুলতে গিয়েছিল ডিমভর্তি ট্যাঙ্কের দরজা।

সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিলেন প্রফেসর। সেইসঙ্গে রসজ্ঞান। ঐ অবস্থাতেও। ভনিতা করে বলেছিলেন—"ওর ভেতরে ঢোকার আমার কিন্তু ইচ্ছে নেই।"

"তোর ইচ্ছে অনিচ্ছের কি দাম আছে রে, হারামজাদা ?" গর্জে উঠেই হ্যাঁচকা টানে হ্যাচ খুলে ধরেছিল মু। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ভেসে এসেছিল রক্ত হিম করা লক্ষ পতঙ্গের গুঞ্জন।

যেন আগ্রহ আর বাগ মানতে চাইছে না, এমনি একখানা ভাব করে ভেতরে উঁকি মেরে দেখেছিলেন প্রফেসর। অনেকগুলো ডিম এর মধ্যেই ফুটে গেছে, ভেতরকার প্রাণীগুলো স্বচ্ছ ডানা নাড়ছে এত জোরে যে এরোপ্লেনের ঘুরন্ত প্রপেলারকেও হার মানিয়ে দেয়—দেখাই যাচ্ছে না ডানাগুলো।

প্রফেসর যেন খুশীতে ফেটে পড়েছিলেন অভূতপূর্ব এই দৃশ্য দেখে—"দ্যাখো, দ্যাখো, কাণ্ড দ্যাখো! এর মধ্যেই ডিম ফুটে বেরোতে আরম্ভ করে দিয়েছে! অভিনন্দন জানাতে আপত্তি আছে ?"

মু-য়ের তখন অমানুষিক অবস্থা। রসজ্ঞান থাকবে কেন ? ঘ্যাঁক করে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে—"ঝাঁকের মধ্যে যা রে, গাধার বাচ্চা! চেটে পুটে যখন খাবে, তখন বোল চাল ঝাড়িস্! হুজুর জিন্দাবাদ!" হাতিয়ার দিয়ে হ্যাচের মধ্যে প্রফেসরকে সুড় সুড় করে ঢুকে পড়তে বাধ্য করেছিল দাঁত মুখ খিঁচিয়ে।

অপরূপ সেই দাঁত-খিঁচুনি দেখেও নাকি বিচলিত হন নি প্রফেসর নাট-

বল্টু-চক্র। আসলে মরতে হবে জেনেই মরিয়া হয়ে গেছিলেন। সবারই তাই হয়। মরার আগে ভয় পায়, মরার সময় আর ভয় থাকে না।

এটাও ঠিক যে, যে নির্ভয়, ভাগ্য তারই সহায়। এ ক্ষেত্রেও ভাগ্য সদয় হলেন প্রফেসরের ওপর। নইলে এ কাহিনী পড়বার সুযোগ আর কেউ পেত না।

প্রফেসরকে দাঁত খিঁচুনি দেখানোর জন্যে, ক-৫'কে ছেড়ে এগিয়ে এসেছিল মু। তাই পেছন ফিরেও এতক্ষণ দেখেনি তর্জন গর্জনে তন্ময় থাকায়। তাই দেখতে পায়নি, ঠিক পেছনেই ঈষৎ নড়ে উঠেছিল ক-৫। অসাড় হয়ে পড়ে থাকলেও একেবারে খতম তো সে হয় নি—শক্তি-বর্ষণ তাকে সংহার করতে পারেনি—নিস্তেজ করে দিয়েছিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলো। কিন্তু রোবট মাত্রেরই ক্ষমতা থাকে নিজেকে মেরামত করে নেওয়ার—অন্ততঃ কিছুটা। তাই ঐটুকু সময়ের মধ্যেই ঝিমুনি কাটিয়ে নড়ে উঠেছিল ক-৫। স্তিমিত চক্ষু-পর্দায় আলোক-ঝিলিক দেখা গিয়েছিল। প্রফেসরের অসহায় অবস্থা দেখেই টনক নড়েছিল। স্টোরেজ ব্যাটারীতে যে-টুকু শক্তি তখনো অবশিষ্ট ছিল, কুড়িয়ে বাড়িয়ে তাই জড়ো করেছিল নাকের হাতিয়ার-চোঙে। তারপর কাঁপতে কাঁপতে উঠে এসেছিল নলচেটা, স্থির হয়েছিল মু-য়ের পিঠের দিকে এবং ভলকে ভলকে বেরিয়ে এসেছিল মারণ-রশ্মি—যা অদৃশ্য কিন্তু ভয়ংকর। একবার নয়…দুবার নয়…বারবার রশ্মিবর্ষণ করে চলেছিল ক-৫, যতক্ষণ না স্টোরেজ ব্যাটারী নিঃশেষিত হয়।

মু-য়ের ভগবান ভাইরাস-হুজুরও এই সংহার রশ্মির অতগুলো বর্ষণ হজম করে সিধে থাকতে পারত না। কাজেই যেন কাটা কলাগাছ ধড়াস করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। মুখ দিয়ে রক্ত-জল-করা গোঙানি শোনা গিয়েছিল কয়েকবার। তারপর মুণ্ডহীন, হাতহীন, পা-হীন একখানা ভয়াবহ বিকটাকৃতি ধড় পড়ে রইল মেঝের ওপর।

পাপিষ্ঠ মু-য়ের দিকে চেয়ে কিন্তু যেন দুঃখই পেয়েছিলেন প্রফেসর। হাজার হোক মানুষ হয়ে তো জন্মেছিল—রোগে পড়ে এমনি হয়ে গিয়েছিল—অ্যান্টিডোট চিকিৎসায় আবার ভাল করে তোলা যেত।

মনটা তাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল প্রফেসরের। তারপরেই হুঁশ হয়েছিল ক্যাবলার মত দাঁড়িয়ে থাকার সময় এটা নয়। দৌড়ে গিয়ে আগে দমাস্ করে বন্ধ করে দিয়েছিলেন ট্যাঙ্কের দরজা। তারপর ক-৫ কে বলে-

ছিলেন—"সাবাস। এবার চলো পালাই। এখনো সময় আছে। মিনিট-খানেকের মধ্যেই বিস্ফোরণ ঘটবে—"

ক্ষীণ স্বরে বলেছিল ক-৫—"উপায় নেই, প্রফেসর। আমার সব শক্তি শেষ। যেতে পারব না।"

"যেতেই হবে," কান পাকড়ানোর মত ক-৫'য়ের একটা অ্যান্টেনা-শুঁড় পাকড়ে হিড়হিড় করে টানতে টানতে দৌড় দিয়েছিলেন প্রফেসর।

অমনি ডিমভর্তি ট্যাঙ্কের মধ্যে থেকে শোনা গিয়েছিল ভাইরাস-হুজুরের জগঝম্প কণ্ঠের গার্গল-করা হুহুংকার—"ফিরে আয় রে প্রফেসর! ফিরে আয়! ওরে আয়! আয়! তোকে যে আমাদের বড্ড দরকার!"

সেই অপার্থিব নিনাদ শুনেই প্রফেসরের নাকি তখন জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আর কি দাঁড়ান তিনি? পড়পাড়িয়ে দৌড়েছিলেন ক-৫'কে টেনে হিঁচড়ে।

প্রফেসরের মন খারাপ হয়েছিল বটে মু-য়ের পতন দেখে, আমি কিন্তু হতাম না। শত্রুর শেষ রাখতে নেই, শাস্ত্রে আছে। যে রুগী আমাকে মারতে আসে, তাকে ছেড়ে কথা কইব কেন?

তাই ছুরী হাতে দাঁড়িয়েছিলাম অন্ধকারে ঘাপটি মেরে। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রফেসর এসে দাঁড়ালেন আমার পেছনে। সংক্ষেপে শুনে নিলাম, পরিকল্পনা তাঁর ফেঁসে গেছে। সিরাম মাটিতে গড়াচ্ছে। এখন উপায়? উপায় একটাই ছিল। আমার পদ্ধতি অনুযায়ী প্রফেসরকে বলতেই মুখিয়ে উঠলেন তিনি—"তোমার মত উজবুক আর দুটো দেখিনি। হাজার হাজার শত্রুকে একা তুমি ছুরী মেরে সাবাড় করতে পারবে? তাছাড়া—"

ঠিক এই সময়ে প্রফেসরের অসাবধানী চিৎকার শুনে পাঁই-পাঁই করে দৌড়ে এল চ। ব্যাস, আমার অস্ত্র হাতেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে দিলাম হারামজাদার বুকে—হাত থেকে হাতিয়ার ঠিকরে গেল মাটিতে।

রক্তমাখা ছুরিটা জামায় মুছতে মুছতে বললাম ঠাণ্ডা গলায়—"দেখলেন তো, কত কম সময়ে কাম ফতে—"

"দীননাথ!"

"আপনার প্ল্যান ফেঁসে গেছে, এবার আমার প্ল্যান—"

"আরেকটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।"

"আবার! আপনার প্ল্যান আর দরকার নেই। আমি একাই—"

"দীননাথ!" কড়া গলায় ধমকে উঠলেন প্রফেসর। "ছেলে মানুষী কোরো না।" ফুটো বেলুনের মত চুপসে গেলাম আমি। উবে গেল অমানুষ বধের উৎসাহ। একটা কুকুরের সামনে মুখনাড়া কাঁহাতক আর সহ্য হয়।

প্রফেসর দ্রুত বললেন—"সময় খুব কম। এদিকে ক-৫'য়েরও শক্তির ভাঁড়ার খালি—ওকে চাঙা করা দরকার। তুমি ওকে নিয়ে ফিরে যাও টাইম-মেশিনে—"

"কিন্তু প্রফেসর—"

"যা বলছি, তাই করো।"

"যো হুকুম", সেলাম ঠুকে ব্যাজার মুখে ক-৫ কে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে দৌড়োলাম সময়-গাড়ীর দিকে। যেতে যেতে পেছন ফিরে দেখলাম, চ-য়ের ঠিকরে যাওয়া হাতিয়ারটা তুলে নিয়ে উল্টো দিকে দৌড়োচ্ছেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র।

কোথায় যাচ্ছেন, পরে জেনেছিলাম। মৃত্যুপণ করেও শেষ সম্ভাবনাটা সফল করার জন্যে উনি ফিরে যাচ্ছিলেন যমের মুখে······

১৯॥ নরকের আগুন

বিশাল গহ্বরের মধ্যে সারি সারি ট্যাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রফেসর। স্থির চোখে দেখে গেলেন একটার পর একটা ট্যাঙ্ক। চোখ আটকে গেল একটা ট্যাঙ্কের ওপর। মনে মনে বললেন—"পেয়েছি। এই সেই ট্যাঙ্ক।" ট্যাঙ্কের গায়ে লাগানো একটা চাকা ঘোরাতেই শোনা গেল হিস্‌হিস্ শব্দ। গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ।

এবার এসে দাঁড়ালেন ডিমভর্তি ট্যাঙ্কটার পেছনে। এখানেও একটা ট্যাঙ্কের স্টপকক খুলে দিলেন। সোঁ-সোঁ করে বেরিয়ে এল গ্যাস···

দৌড়ে এলেন মাঝের ডিমভর্তি ট্যাঙ্কের সামনে। হ্যাচ-টা যেখানে তলার কব্জার ওপর ঘুরে যায় খোলবার সময়ে, ধাতুর তৈরী সেই ফ্রেমে ঠেসে গুঁজে দিলেন রশ্মি-অস্ত্রটা। পকেট হাতড়ে বার করলেন একটা সরু

নাইলন সুতোর গোলা। লম্বা সফরে বেরুলেই সামান্য এই জিনিসটা পকেটে রাখেন প্রফেসর। অনেক কাজে লাগে। যারা দেশ বেড়ানোর বাতিকে ভোগে, এই অভ্যেসটা তাদেরও আছে।

সুতোর একপ্রান্ত বাঁধলেন হ্যাচের হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে। সেই ফাঁকে পোর্ট হোল দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন ভেতরে। আরও ডিম ফুটেছে। আরও প্রাণী ভন্ ভন্ করছে। ডানা আছড়াচ্ছে। ছানাপোনার মধ্যে গা এলিয়ে পড়ে আছে ভাইরাস-হুজুর। আকারে আরও বেড়ে উঠেছে এইটুকু সময়ের মধ্যেই। এত বড় যে গতর নাড়ানোর ক্ষমতাও আর নেই।

দেখেই শিউরে উঠলেন প্রফেসর। সরে এলেন। সুতো টান-টান করে বাঁধতে লাগলেন রশ্মি-বন্দুকের ট্রিগারে।

পোর্ট হোল খোলাই ছিল। প্লাস্টিক-কাঁচের মধ্যে দিয়ে প্রফেসরের আদল দেখেই ধুমধাম আওয়াজ করে হেঁকে উঠল ভাইরাস-হুজুর—"কে গো? প্রফেসর নাকি?"

"ও বাবা! গলায় যে মধু ঝরছে," সুতোয় গিঁট দিতে দিতে আবোল তাবোল কথা আরম্ভ করে দিলেন প্রফেসর। সময় খুব কম। পোর্ট হোলের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে পোকাগুলোকে—দানবিক গঙ্গা ফড়িংয়ের মত আকার হয়েছে এক-একজনের। সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে আরও ডিম ফুটছে, আরও ভাইরাস-ছানা ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে।

জগঝম্প-কণ্ঠ এবার প্রকৃতই জগঝম্প-নিনাদে পরিণত হল—"ওরে বেল্লিক! ওরে শূকর! ওরে মর্কট! তোর আর রেহাই নেই!"

পুলকিত স্বরে গলার স্বর চড়িয়ে প্রফেসর বললেন—"ওরে খোকন! ওরে শিশু! ওরে নির্বোধ! জ্যোতিষী আমার হাত গুণে বলেছে শতবর্ষ পরমায়ু আমার।" বলতে বলতে শেষ গিঁটটা কষে বাঁধা হয়ে গেল। ফ্রেমের খাঁজে রশ্মি-বন্দুক চেপে বসেছে কিনা, পরখ করাও হয়ে গেল। নল-চেটা ঠিক দিকে ফেরানো আছে, তাও দেখা হয়ে গেল।

যেন গার্গল-করতে করতে বিকট গলায় বাজখাঁই চিৎকার ছাড়ল এবার ভাইরাস-হুজুর—"ওরে গাধা! ওরে পাঁঠা! ওরে শুওর! পালিয়ে তুই যাবি কোথা? আমার ঝাঁকই তোকে শুষে নেবে—"

সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পেছিয়ে এলেন প্রফেসর—"আগে তুই বেরো ভেতর থেকে—তবে তো তোর ঝাঁক নাগাল পাবে আমার!"

"আহাম্মক! আহাম্মক! আহাম্মক!" বিশাল গহ্বর মনে হল যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে চেঁচানির ঠেলায়—"ধাতুর তৈরী সামান্য এই দেওয়ালটা আমার গতিরোধ করে থাকবে, এই ধারণা তোর মস্তিষ্কে এল কি করে রে অর্বাচীন—"

যাকে অর্বাচীন বলা হল, তিনি কিন্তু ততক্ষণে অলিম্পিক-দৌড় দৌড়োচ্ছেন টাইম-মেশিনের দিকে।

যেন সহস্র অক্টোপাশের অগুন্তি শুঁড় প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ল ফুটন্ত জেলীর মধ্যে, সহস্র কৃষ্ণকায় গোলক-চক্ষুর মধ্যে থেকে বিচ্ছুরিত হ'ল উন্মত্ত ক্রোধাগ্নি। স্বয়ং রৌরব-অধিপতিও সেই ভয়ংকর মূর্তি দেখলে বুঝি আঁৎকে উঠে মূর্চ্ছা যেতেন। পর মুহূর্তেই দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ভীম বেগে ভাইরাস-হুজুর নিজের বিপুল দেহটাকে নিক্ষেপ করল হ্যাচ-দরজার ভেতর দিকে। সেকী প্রচণ্ড সংঘাত! মড় মড় করে উঠল পুরু ধাতুর প্রাচীর। তেউড়ে বেঁকে ঠেলে বেরিয়ে এল বাইরের দিকে!

কেন্দ্রিন ক্ষিপ্ত হয়েছে, সুতরাং ঝাঁক তো হবেই। পঙ্গপালের মত শব্দ সৃষ্টিকারী পতঙ্গবাহিনীও বিষম রাগে ফেটে পড়ল তৎক্ষণাৎ। আচম্বিতে লক্ষগুণ বৃদ্ধি পেল গুঞ্জন ধ্বনি। হাজার হাজার কনকর্ড জেটবিমানের কর্ণবধিরকারী প্রলয়ংকর শব্দে ধাতুর ট্যাংক তো বটেই, বিশাল গহ্বরের শৈল প্রাচীরও বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হল সেই মুহূর্তে। ভীষণ সেই আওয়াজকে কোনো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শুধু সেই আওয়াজই যে কোনো জীবের আত্মারামকে খাঁচাছাড়া করার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রফেসর অবিশ্বাস্য বেগে দৌড়ে ফিরে এলেন টাইম-মেশিনে। আমি আর ক-৫ আগেভাগেই উঠে গ্যাঁট হয়ে বসেছিলাম। আমার অবশ্য হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছিল অশ্রুতপূর্ব সেই ভয়ংকর আওয়াজে। গোটা টাইটান উপগ্রহটাই বুঝি থরথর করে কাঁপছিল। সেকী শব্দ! গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়! এখনও আমার কলম কাঁপছে লিখতে লিখতে।

প্রফেসর তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই স্টার্টার ঠেলে দিলেন এক ধাক্কায়, সঙ্গে সঙ্গে যেন সামনে হেলে পড়ল সময়-গাড়ী। চারপাশ ধোঁয়াটে হয়ে এল। অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেশনশনে তো এলামই, সেইসঙ্গে সময়-গাড়ীকে

রকেট গাড়ীর মতই নক্ষত্রবেগে মহাশূন্যে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন প্রফেসর।

অনেক উঁচু থেকে তাই দেখলাম অকল্পনীয় এক আতশ বাজীর খেলা। বাজী পোড়ানো পৌষ মেলায় দেখেছি, নেতাজীর জন্মদিবসেও দেখেছি, গড়ের মাঠে ফৌজী তারাবাজীও দেখেছি। কিন্তু সেদিন যে আগুন আর আলোর খেলা দেখেছিলাম, তেমনটি কখনো দেখিনি।

তার আগে যা ঘটেছিল বিশাল গহ্বরের ভেতরে, প্রফেসরের মুখে তার সরস বর্ণনা শুনেছিলাম। ভাইরাস-হুজুর হারামজাদা শিকার পলায়মান দেখে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হয়ে ধাতুর ট্যাঙ্ক গায়ের জোরে ভেঙে বেরিয়ে আসতে গিয়েছিল। আগে ভেঙে ঠিকরে গিয়েছিল হ্যাচ-দরজা। তৎক্ষণাৎ সুতোয় টান পড়তেই ব্ল্যাস্টারের ট্রিগার টানাও হয়ে গিয়েছিল। উপর্যুপরি ব্ল্যাস্টার বর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছিল সটান মিথেন-ভর্তি ট্যাঙ্কের দিকে—যেদিকে নলচেটা ফিরিয়ে রেখে এসেছিলেন ধুরন্ধর প্রফেসর। মিথেন স্টোরেজ ট্যাঙ্ক বিদীর্ণ হতেই ভীষণ সোঁ-সোঁ শব্দে ভরে উঠেছিল গহ্বর—লকলকে আগুনের স্তম্ভ লাফ দিয়ে উঠেছিল ট্যাঙ্কের ভেতর থেকে। ঠিক সেই সময়ে ডিমভর্তি ট্যাঙ্ক ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল ভাইরাস-কেন্দ্রিন—মুহূর্তের মধ্যে প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে আগুন ধরে উঠেছিল তার চারপাশের পুঞ্জ পুঞ্জ গ্যাসে······

আগুন···আগুন···শুধুই আগুন! অতবড় গহ্বরটা ভরে উঠেছিল লেলিহান পুঞ্জিত অগ্ন্যুৎসবে। অনেকগুলো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত একসঙ্গে স্বল্প পরিসরে ঘটলে যে নারকীয় অগ্নিলীলা দেখা যায়, সেই ধরনের অগ্নির বেড়াজালে হারিয়ে গিয়েছিল ভাইরাস-হুজুর আর তার অগুন্তি ছানাপোনা। অসহ্য যন্ত্রণায় শেষ আর্তনাদ ত্যাগ করেছিল হুজুর—লক্ষ রাক্ষসের কণ্ঠে গার্গল-করার মত সেই অবর্ণনীয় আর্ত চীৎকারই ভাইরাস-হুজুরের শেষ চীৎকার—পরক্ষণেই গর্জমান অগ্নিসমুদ্র গ্রাস করেছিল পুরো ঝাঁকসহ তাকে—অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সর্বভুক অগ্নি-দেবতার জঠরে······

নিরাপদ দূরত্বে শূন্যে ভেসে থেকে দেখলাম তার পরবর্তী দৃশ্য। বিস্ফোরণের দৃশ্য। অবিশ্বাস্য দৃশ্য। সবার আগে স্টোরেজ স্টেশন ফেটে উড়ে গিয়ে লেলিহান অগ্নিশিখা মেলে ধরল লক্ষ সূর্যমুখী ফুলের মত। অহো! অহো! সেকী অপরূপ বর্ণসুষমা! আগুনের মধ্যেও যে

এতরঙের বাহার, এত অজস্র আকারের তারাবাজী থাকতে পারে, তা কি কেউ কখনো ভেবেছে? পাঁচহাজার তিনশ একুশ সালের টাইটানের প্রলয়াগ্নি দেখে সত্যিই সেদিন আমার নয়ন সার্থক হয়েছিল। এত কষ্ট ভুলে গেছিলাম। ভবিষ্যতের অভিযানে সেই আমার পরম লাভ।

হাজার পুষ্পের মত পাপড়ি, হাজার বাসুকির মত আগুনের ফণা, হাজার আঁকড়, হাজার ডালিয়ার মত রঙের খেলা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল বিস্ফোরিত স্টোরেজ ট্যাংক থেকে সমস্ত টাইটান পৃষ্ঠে। কালো মহাকাশের পটভূমিকায় দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল পুরো উপগ্রহটা। জ্বলন্ত একটা বল ভাসতে লাগল মহাশূন্যে—গর্জমান অগ্নি-গোলক!

পরম সন্তোষে দুহাত কচলে প্রফেসর বললেন—"কি রকম দেখছো হে ছোকরা?"

"উত্তম দৃশ্য!"

"ব্রেনখানা দেখেছো আমার?"

"বুদ্ধিটা কিন্তু আমার।"

"তোমার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। গোড়া থেকেই আমি বলেছিলাম বোম মেরে উড়িয়ে দিন পুরো উপগ্রহটাকে। কাঙালের কথা বাসি হলে টকে, সেই তো—"

নির্লজ্জের মত প্রফেসর বললেন—"আইডিয়াটা তোমার হতে পারে, প্ল্যানটা আমার। বোমা পেতে কোথায় বাছাধন?"

"আপনি পেলেন কোথায়?"

"বানিয়ে নিলাম হে খোকন, বানিয়ে নিলাম। ঐ জন্যেই তো কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তোমার আমার এই ব্রেনখানার কাছে।"

"বাক্যিচচ্চড়ি থামাবেন?" জ্বলন্ত টাইটান-বলের দিকে চোখ রেখে বললাম—"বোমাটা বানালেন কি করে বলুন।"

"খুব সহজে। মিথেন অ্যাটমসফিয়ারে ভাল করে অক্সিজেন মিশিয়ে দিয়ে ব্ল্যাস্টার ছুঁড়ে দিলাম। ব্যস, কেল্লা ফতে! মিথেন স্টোরেজ ট্যাংকটা ঐ জন্যে আগে উড়িয়ে দিয়েছি—আমি জানতাম ও রকম একটা মিথেনের ভাঁড়ার ঐখানেই আছে তা থেকেই শক্তি সৃষ্টি করে চালু রয়েছে টাইটানের সমস্ত যন্ত্রপাতি। তাই তো হে, ক-৫?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" সায় দিল ক-৫।

"এবার তো যেতে হয় রিসার্চ হসপিট্যালে।"

"কেন, প্রভু ?"

"সেকি হে ! তুমি তো আমার সম্পত্তি নও। ফিরিয়ে দিতে হবে না তোমাকে ডক্টরের কাছে ?"

"তথাস্তু !" কি রকম যেন বিমর্ষ গলায় বললে ক-৫। স্বর পরিবর্তনটা অদ্ভুত। ক-৫ কি আমাদের ছেড়ে যেতে চায় না ?

রিসার্চ হসপিট্যালের রিসেপসন কক্ষ।

বিদায় অভিনন্দন জানাতে সময়-গাড়ীকে ঘিরে ধরেছেন কৌ এবং অন্যান্য ডাক্তার আর নার্স'রা। ক-৫য়ের শক্তি-কোষে নতুন করে শক্তি ঠেসে দেওয়ায় সে-ও বেশ চনমনে। ঘুর ঘুর করছে সময়-গাড়ীর আশে পাশে।

আমি আর প্রফেসর উঠে বসে আছি ভেতরে। প্রফেসরের চোখ কিন্তু রোবট-কুকুরের দিকে। একটু যেন সজলও বটে।

কৌ তা লক্ষ্য করেছিলেন।

বললেন মৃদু হেসে—"ক-৫য়ের জন্য মন কেমন করছে ?"

প্রফেসর বলে উঠলেন—"কই, না তো ?"

কৌ বললেন—"ক-৫য়ের প্রাণও কাঁদছে আপনার জন্যে। আমি বুঝি।"

"তা হবে।"

"প্রফেসর—"

"বলুন, ডক্টর কৌ।"

"আমাদের যে উপকার করে গেলেন আপনি, তা আমরা কোন দিন ভুলব না। কিন্তু আপনি আমাদের ভুলে যেতে পারেন—"

"না, না, সেকি কথা !"

"যাতে ভুলে না যান, তাই একটা স্মৃতি চিহ্ন আপনি নিয়ে যান।"

"নেব ? কি নেব ?"

"ক-৫'কে।"

"ক-৫ ! ক-৫কে দেবেন ?"

"হ্যাঁ, দেব। আমাদের সবার উপহার হোক এই ক-৫।"

"আপনি ? ছেড়ে থাকতে পারবেন ওকে ?"

হাসবার চেষ্টা করলেন কো—"পারব।···ক-৫ !"

"হুজুর ?"

"আজ থেকে তুমি প্রফেসরের হুকুম মেনে চলবে, কেমন ?"

"তথাস্তু।" বলেই দূর থেকেই সময়-গাড়ীর দিকে লম্বা লাফ দিল ক-৫।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটল অঘটনটা।

বিদায়-নাটকে ব্যাপৃত থাকায় প্রফেসর লক্ষ্য করেননি কন্ট্রোল-প্যানেলের সহসা সজীবতা। আমিও লক্ষ্য করিনি। করলেও বুঝতাম না। আচমকা আপনা থেকেই চালু হয়ে গিয়েছে যন্ত্রপাতি। রিসার্চ হসপিটালে অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে প্রচণ্ড ধাক্কায় বিগড়ে গিয়েছিল অটোমেটিক রিটার্ন—তড়ি-ঘড়ি ডিগবাজী খেয়ে টাইটান থেকে ছিটকে সরে যাওয়ার সময়ে পাল্টা ধাক্কায় আবার ঠিক হয়ে গেছিল অটোমেটিক রিটার্ন। ঠিক হয়েছিল তিন মিনিট আগেই। আমরা কেউ তা খেয়াল করিনি।

খেয়াল হল যখন ক-৫ আসন লক্ষ্য করে লাফ দিল—ঠিক তখনি। তিন মিনিট শেষ হ'ল ঠিক সেই সময়ে। আচমকা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি মেরে চালু হয়ে গেল অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশন। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম আমরা। প্রচণ্ড ভাবে মাথা ঠুকে গেল কন্ট্রোল প্যানেলে। জ্ঞান হারানোর আগে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে যেন দেখলাম, ক-৫য়ের রোবট দেহটা আমাদের ফুঁড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল রিসেপসন কক্ষের মেঝেতে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

২০ ॥ সুদূর অতীতে

অত্যাশ্চর্য এই অভিযান-কাহিনী অন্তে পৌঁছেছে ঠিকই, কিন্তু শেষের চমকটাই এই কাহিনীর সবচেয়ে বিস্ময়কর অংশ।

অটোমেটিক রিটার্ন চালু হয়ে যাওয়ায় জ্ঞান হারানোর আগেই চকিতের জন্যেও একটা পরম সুখাবেশে মনটা নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল। যাক, অবশেষে তাহলে ঘরে ফিরছি। অনেকদিন বিদেশ ভ্রমণ করে কলকাতায় ফেরার

সময়ে মনটা যেমন ঘরমুখো হয়, ঠিক তেমনি অবস্থা হয়েছিল আমার।

ফিরেছিলাম ঠিকই। কিন্তু সোজাসুজি নয়—একটু ঘুরপথে। একটা বলকে সুতোয় ঝুলিয়ে একদিকে টেনে ধরে ছেড়ে দিলে তা কি লম্ব অবস্থায় এসে স্থির হয়ে ঝুলতে পারে? পারে না। ছিটকে যায় অপরদিকে··· বিপরীত দিকে। ডানদিকে থেকে ছেড়ে দিলে পৌঁছোয় বাঁদিকে। এইটাই নিয়ম। দুলন্ত বলটাকে ধরে স্থির করে না দিলে তা এইভাবেই দুলবে। অন্ততঃ কিছুক্ষণ—পেণ্ডুলামের মত।

সময় পথে আমরাও পেণ্ডুলাম হয়ে গেলাম। টাইম-মেশিনও তো প্রকৃত পক্ষে একটা ঘড়ি—যা শুধু সময়ের হিসেবই রাখছে না—সময় পথে ছুটেও চলেছে। কিন্তু তার অটোমেটিক রিটার্ন সত্যিই বিগড়েছিল বলে ভবিষ্যৎ থেকে ঠিকরে এলেও বর্তমান অর্থাৎ ১৯৮১-র কলকাতায় থামতে পারেনি। কখন যে সুদূর অতীতে উধাও হয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে, আমরাও জানতে পারি নি। কারোরই জ্ঞান ছিল না।

আমার মাথায় চোট লেগেছিল বেশী। তাই আমার আগে জ্ঞান ফিরেছিল প্রফেসরের। উনি কন্ট্রোল প্যানেলের বছরের হিসেব দেখে এমন চমকে উঠেছিলেন যে আমাকে ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিতে থাকেন। রামঝাঁকুনিতে আমার স্নায়ুমণ্ডল চাঙা হয়ে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। ধড়মড় করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করেছিলাম—"অমন করছেন কেন?"

চারপাশ তমাল কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেই সঙ্গে সীমাহীন নৈঃশব্দ্য। নিস্তব্দ কাল-গর্ভের অমানিশায় আমরা যেন স্থির ভাবে ভেসে রয়েছি।

কণ্ট্রোল প্যানেলের একটা ডায়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রফেসর বললেন—"দ্যাখো।"

আমি দেখলাম। কাঁটা ঘুরছে বন্ বন্ করে। গতি নির্দেশক কাঁটা। কিন্তু ঘুরছে উল্টোদিকে। আমরা পেছিয়ে চলেছি ঠিকই, কিন্তু প্রফেসর এত উত্তেজিত কেন?

আর একটা ঘড়ির ডায়াল দেখালেন প্রফেসর—"কোথায় চলেছি বুঝেছো?"

আঁৎকে উঠলাম আমি—"একী! ১৯৮১ তো পেরিয়ে এসেছি।"

"তা তো এসেছোই। অনেক আগেই এসেছো। কোথায় যাচ্ছো,

সেইটা দ্যাখো।"

"খৃষ্ট পূর্ব ১৪১৯!"

"হ্যাঁ, ১৯৮১-র আগে—৩৪ টা শতাব্দী আগে!"

"কিন্তু অটোমেটিক রিটার্ন তো চালু রয়েছে?"

"উঁহু। এখনো পুরোপুরি ঠিক হয়নি। যা গোদা পায়ের লাথি ঝেড়েছিলে।"

সব দোষ যেন আমারই। নিজের মেশিনের ত্রুটিটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন বেমালুম। কিন্তু ঝগড়া করার সময় সেটা নয়। উনি আমাকে কথা বলতেও দিলেন না।

বললেন ঈষৎ উৎফুল্ল স্বরে—"ভালোই হল। সুদূর অতীতের কিছু ঘটনা দেখে যাওয়া যাক।"

"কিন্তু বর্তমানে শেষ পর্যন্ত ফিরতে পারবো তো? পেণ্ডুলামের মত ভবিষ্যৎ থেকে তো সোজা চলে এলাম অতীতে—আবার ফিরে যাবো নাকি ভবিষ্যতে? এইভাবেই কি চলবে অনন্তকাল? শেষ পর্যন্ত দোলক হয়েই থাকতে হবে নাকি?"

খেঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর—"কি ঘটবে, তা নিয়ে অভিযাত্রীরা মাথা ঘামায় না—যা ঘটতে চলেছে, তাই শুধু পর্যবেক্ষণ করে। ঘটনা দ্যাখো, অতীতের ঘটনা! ইতিহাসের ঘটনা! যে ঘটনা বিশ্বের কিছু কিছু গবেষক শুধু আন্দাজ করেছেন—চোখে কখনো দেখেননি। আমিও তা জানি—কিন্তু প্রত্যক্ষ করতে চলেছি এখন। অবোধ দীননাথ, এ সুযোগ হেলায় হারিও না।"

উনি তো জ্ঞান দিয়ে খালাস। আমার তখন বুক ধড়ফড় করছে। ঘরে ফেরার আনন্দ তো উবে গেছেই—হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে পরিণতি ভেবে। প্রকৃতির ওপর চালিয়াতি করতে গেলেই তিনি ছেড়ে কথা কন না। আমরা কি তাহলে মহাকালের পথে মাকুর মত টানা আর পোড়েন করেই চলব অনন্তকাল?

আচমকা চারপাশের নিকষ কালো মখমলের পর্দার মত পুরু অন্ধকারের আবরণটা একটু একটু করে ফিকে হয়ে এল। তমিস্রার বুক ফুঁড়ে জাগ্রত হল একের পর এক গ্রহ নক্ষত্র···সীমাহীন মহাশূন্যে ভাসমান দ্যুতিময় সৌর-জগৎ। বহুদূরে সূর্য, তারপর বুধ, পায়ের নিচে পৃথিবী···একপাশে

রক্তরাঙা লালগ্রহ মঙ্গল…বৃহস্পতি থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য গ্রহগুলো খালি চোখে দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা নয়—তাই তা প্রায় অদৃশ্যই রইল।

অস্ফুট চিৎকার শুনে সম্বিৎ ফিরল আমার। নির্নিমেষে প্রফেসর অপরূপ এই দৃশ্য দেখছেন। তারকাখচিত মহাশূন্যের দিকে এমন চোখে তাকিয়ে আছেন যেন ঘাবড়ে গেছেন। শীর্ণ দেহটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। দুই চক্ষু বিস্ফারিত।

দশদিকের ঝিলমিলে তারকা সুষমার পানে বিমূঢ় চাহনি মেলে ধরলাম আমিও। ক্ষণকাল চেয়ে রইলাম সবুজগ্রহ পৃথিবীর পানে—আমার বাড়ী, আমার গ্রহ। কিন্তু আক্কেল বলিহারি যাই প্রফেসরের। বাড়ী ফেরার নাম করছেন না, ফ্যালফ্যাল করে দেখছেন আকাশের তারা, গ্রহ, সূর্য। যেন জন্মে দেখেননি। এত ভ্যাবাচাকা খাওয়ার কি আছে বুঝলাম না। রোজ যা দেখেছেন পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে, আজ না হয় পৃথিবীর বাইরে থেকে তা দেখছেন। চোখ-সওয়া দৃশ্য। নতুন কিছুই তো নেই। তবে চোখ ছানাবড়ার মত করে আছেন কেন?

"প্রফেসর! হ'ল কি আপনার?"

"মূর্খ!"

"আমি তো মূর্খই, কিন্তু আপনি যে মূঢ় হয়ে গেলেন!"

"না, না, তোমাকে বলছি না।"

"তবে কাকে বলছেন, আর কে আছে এখানে?"

"আমি আছি। আমি…আমি একটা মূর্খ।"

পুলকিত হলাম আত্মপ্রশস্তি শুনে—"কেন প্রফেসর?"

"দেখতে পাচ্ছো না?"

"কি দেখতে পাচ্ছি না?"

"প্রতিবেশী কোথায়?"

"কার প্রতিবেশী?"

"পৃথিবীর!"

"মঙ্গলের কথা বলছেন? ঐ তো রয়েছে। কি সুন্দর লাল টকটকে —আরও ঘন লাল—১৯৮১-র পৃথিবী থেকে এমন টুকটুকে গ্রহ কেউ কখনো দেখেছে?"

"আর একজন প্রতিবেশী?"

"ঐ তো বুধগ্রহ—সূর্যের ঠিক পরেই।"

"হঁ্যা, হঁ্যা, সূর্যের ঠিক পরেই বুধ···কিন্তু তারপর? বুধ আর পৃথিবীর মাঝে যিনি থাকেন, তিনি কোথায়? কোথায় গেলেন মণিংস্টার? ভোরের শুকতারা? আমাদের শুক্রগ্রহ?"

ঠাহর করেও সত্যিই দূরে কাছে জ্বলজ্বলে ভোরের তারাকে দেখতে পেলাম না। সেই ভোরের তারা যাকে বছরের কোন কোন সময়ে সন্ধ্যায় দেখা যায় বলে হয় সাঁঝের তারা—যার চলতি নাম প্রভাত তারা। যার চেহারা খানা পৃথিবীর প্রায় সমানই বলা যায় এবং গ্রহদের মধ্যে যে পৃথিবীর সব চাইতে কাছে। অত যে ক্ষুদে গ্রহ বুধ, যার একুশখানা জুড়লে একখানা পৃথিবী তৈরী হয়—তাকেও অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে মহাশূন্যে আছি বলে—কিন্তু শুক্র কই?

অবাক হলাম। কিন্তু কথা বললাম না। বলবার সময়ও পেলাম না। ইতিউতি তাকাতে তাকাতে হঠাৎ একদিকে চোখ পাকিয়ে রইলেন প্রফেসর।

বিজন বিভুঁয়ে এসে প্রফেসরের এহেন উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি আমার সুবিধের ঠেকল না। কি রকম যেন পাগল-পাগল চাহনি।

তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—"ওদিকে আছে বুঝি শুক্র গ্রহ?"

"ইডিয়ট! আমি বৃহস্পতিকে খুঁজছি।"

"কেন?"

"সে গ্রহরাজ বলে। এত বড় গ্রহ আর সৌরজগতে নেই বলে। অন্য আটটা গ্রহকে একসঙ্গে করলেও যার তিনভাগও হওয়া যায় না বলে। তেরোশ পৃথিবীকে পিণ্ডি পাকালে যার একখানা শরীর হয় বলে।"

আমতা আমতা করে বললাম—"কিন্তু সে তো সূর্য থেকে সাড়ে আটচল্লিশ কোটি মাইল দূরে। শুধু চোখে কি দেখতে পাবেন?"

"তাহলে ওটা কী?"

"কোনটা?"

প্রফেসর আঙুল তুলে শুধু দেখালেন। আমি দেখলাম। চোখ কচলে আবার দেখলাম। চুমকি-বসানো মহাকাশের বুকে একটা ধোঁয়ার মত কি যেন চোখে পড়ল।

২১ ॥ গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষ

উন্মত্ত গোঁড়ামিকে ইংরেজিতে বলে ফ্যানাটিসিজ্‌ম্‌। আমি সায়েন্স-ফিকশন পড়তে ভালবাসি, তাই আমাকে সবাই বলে ফ্যানাটিক। প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রের আশ্চর্য কীর্তিকাহিনী লিখলে টিটকিরি দেয়, আমাকে নাকি ফ্যানাটিসিজম-য়ে পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা যখন দার্শনিক হন, কল্পনা বিলাসী হন—তখন কিন্তু তাঁদের কল্পনার নাগাল পাওয়া সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। তাঁরা যে সম্ভাবনাময় আশ্চর্য জগতের স্বপ্ন দেখেন, তা দুঃস্বপ্ন আখ্যা পায় বাস্তব জগতে। কিন্তু মামুলী কল্পনায় যা অবাস্তব, সায়েন্স-ফিকশনের রঙীন কল্পনায় তা অত্যন্ত বাস্তব। প্রফেসরের অসাধারণ অ্যাডভেঞ্চারও সায়েন্স-ফিকশনের মতই চমকপ্রদ, বিস্ময়কর এবং অবাস্তব মনে হতে পারে উন্নাসিক পাঠকপাঠিকার কাছে—কিন্তু সায়েন্স ফিকশন অনুরাগীদের কাছে নয়। এই ভরসাতেই ফ্যানাটিক বদ্‌নামের ঝুঁকি নিয়েও লিখতে বসেছি এই কাহিনী। দীর্ঘ এই অ্যাডভেঞ্চারের পাতায় পাতায় অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা তুলে ধরেছি, অতি-তথ্যনির্ভর করতে যাইনি অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্যে। এ কাহিনী বিজ্ঞান-প্রবন্ধ পাঠকদের জন্যেও নয়—কল্পবিজ্ঞান রসিকদের জন্যে। ভূতের গল্প যেমন ভূতেদের জন্যে লেখা হয় না—কল্পবিজ্ঞানও তেমনি বিজ্ঞানীদের জন্যে লেখা হয় না। তাই বৈজ্ঞানিক তথ্যে ভারাক্রান্ত করে দ্রুতগতি উপাখ্যানটাকে মন্থর বিরক্তিকরও করতে চাই না। অতি-তথ্যনির্ভরতা একটা ব্যাধি—কল্পবিজ্ঞান কাহিনীকাররা এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'ন বলেই তো কল্পবিজ্ঞান সোনার পাথরবাটি হয়ে দাঁড়ায়। না প্রবন্ধ, না গল্প—এক অপরূপ বস্তুতে পরিণত হয়।

গৌরচন্দ্রিকাটুকু সেরে নিলাম পরবর্তী অবিশ্বাস্য অধ্যায়টুকুর জন্যে। এরপর যে ঘটনা পরম্পরা উপস্থাপিত করা হবে, তাতে জ্ঞান বিজ্ঞানের সুবাসটুকুই কেবল থাকবে—কচকচি থাকবে না। কল্পবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য, চিত্তরঞ্জনের আবরণে বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করা—যাতে অনুসন্ধিৎসু মন বিজ্ঞান-তৃষ্ণা মিটিয়ে নিতে পারে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে। আমিও বলব, পরবর্তী অকল্পনীয় ঘটনাপরম্পরা পাঠান্তে পাঠকপাঠিকারা যেন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। যা লিখব, তার প্রতিটি অক্ষর

সত্য—প্রতিটি ঘটনা ঘটে গেছে তিনশ বছর আগে এবং তারপরে। আমি তা স্বচক্ষে দেখে এসেছি। কিন্তু তথ্য নির্ভর বালখিল্য বিজ্ঞানেতিহাসে এখনো তার ঠাঁই হয়নি।

এবার আসা যাক কাহিনীতে।

উন্মত্তের মত ধোঁয়াটার দিকে চেয়েছিলেন প্রফেসর। আমি চোখ ছোট করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। অস্বাভাবিক দ্রুতহারে বড় হয়ে উঠতে লাগল ধোঁয়ার কণা। আকার নিল অগ্নিকণার। সেইসঙ্গে দেখা গেল আরও কতকগুলো ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গ। ছিটকে ছড়িয়ে যাচ্ছে দিকে দিকে। আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে শুধু একটি স্ফুলিঙ্গ। ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠছে···আরও বড়···আরও ···আরও···

ঘাবড়ে গেলাম। হাত চেপে ধরলাম প্রফেসরের – "কী ওটা?"

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থেকে যেন স্বগতোক্তি করলেন প্রফেসর – "কমেট!"

"কমেট! মানে, ধূমকেতু?"

"হ্যাঁ।"

আমার মস্তিষ্ক মন্থর, আমার ব্রেন অল্প, আমার বুদ্ধি কম, আমি নির্বোধ, আমি আহাম্মক, আমি অপদার্থ—আমি যে কিছু না, আমি তা জানি। কিন্তু সেই মুহূর্তে কেন জানি না সচল হল আমার ব্রেন। আসলে মানুষের মগজের খবর আজও কেউ পায় নি। পুরো মগজটা কখনোই সক্রিয় হয় না—হ'লে মানুষ রাতারাতি অতিমানুষ হয়ে যেত।

আমার নিষ্ক্রিয় মগজের জন্যেই তো এত গালমন্দ খাই। কিন্তু তাতে আমার কচু হয়। কেন না, সত্যিই তো আমার মগজ আছে। যতটা বোকা বলা হয় আমাকে, ততটা বোকা আমি নই। নইলে ধূমকেতু শব্দটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অলস মগজটা সহসা অত চঞ্চল হবে কেন? কেন ডায়নামোর মত তড়িৎ-প্রবাহে ভাসিয়ে দেবে আমার মস্তিষ্কের লক্ষকোটি কোষকে? কেন চকিতের মধ্যে মনে পড়ে যাবে এমন কতকগুলো কথা যা আমার মত জড়মস্তিষ্কের মনে রাখা উচিত নয়?

কথাগুলো প্রফেসরকেও বলিনি। বলার সুযোগ বা সময়ও পাই নি। যা ঠাসবুনুনি অ্যাডভেঞ্চার চলছে—ফাঁক পেলে তো বলব। এখন বললাম।

"প্রফেসর।"

আমার বিদ্যুৎ প্রবাহিত ডায়নামো-মগজের তাড়নায় কণ্ঠস্বরেও পরি-

বর্তন এসেছিল। সম্বিৎ ফিরল প্রফেসরের। আগুয়ান স্ফুলিঙ্গের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। বিস্মিত চাহনি। আমার মুখভাব নিরীক্ষণ করলেন। বললেন—"কি হল, দীননাথ ?"

"আপনাকে কতকগুলো কথা বলতে একদম ভুলে গেছিলাম।"

"এখন কথা শোনার সময় নয়। যে আসছে, তাকে দ্যাখো।"

"যে আসছে, কথাগুলো তার সম্পর্কেও তো হতে পারে।"

স্পষ্টতঃ চমকে উঠলেন প্রফেসর—"ধূমকেতু সম্পর্কে ?"

"মনে হয়।"

"কি কথা বলো, তাড়াতাড়ি বলো, হেঁয়ালি বাদ দাও।"

"তাড়াতাড়ি বলা যাবে না, প্রফেসর। একটু ধৈর্য ধরতে হবে। টাইম-মেশিন যখন উল্টে পড়ে থেকে গিয়েছিল রিসার্চ হসপিট্যালে, তখনকার কথা। আপনাকে কব্জায় এনে ফেলেছিল ভাইরাস-হুজুর। আপনার চোখে দেখেছিলাম নীল আগুন। আপনার কণ্ঠে শুনেছিলাম অপার্থিব এক বক্তৃতা। আপনার মুখ দিয়ে আত্ম-কাহিনী শুনিয়ে গিয়েছিল ভাইরাস-হুজুর পরমোল্লাসে। আপনি আমাকে নির্বোধ বলেন, মূর্খ বলেন, গবেট বলেন—কিন্তু সেই দীর্ঘ বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে ঐ ধূমকেতুকে দেখে।"

চোখ জ্বলে উঠল প্রফেসরের। চাপা আর্তনাদের সুরে বললেন—"ইডিয়ট! এতক্ষণ তা বলোনি কেন ?"

"আবার ইডিয়ট বলছেন ?"

"একশবার বলব, হাজার বার বলব। দেরী কোরো না—ফের ভুলে যাবে। ঠিক যে রকমভাবে শুনেছো, সেইভাবে বলে যাও।"

"আমি রেগে গিয়ে ভাইরাস ব্যাটাচ্ছেলেকে বলেছিলাম, যে-চুলোয় ছিলে, সেই চুলোয় বিদেয় হও। প্রফেসরকে রেহাই দাও। ভালো বলিনি ?"

"শাট আপ! ভাইরাস কি বলল ? কোন্ চুলো থেকে এসেছে বলল কিছু ?"

"হ্যাঁ, বলল। বলল, আমার চুলোর কি ঠিক আছে হে ? আমি ভেসে ভেসে বেড়িয়েছি নক্ষত্রদের পাশ দিয়ে, ছায়াপথের পর ছায়াপথের মধ্যে দিয়ে, কত তারকার জন্ম দেখেছি, কত তারকার বিস্ফোরণ দেখেছি, ধূমকেতুর উড়ে যাওয়া দেখেছি, কত গ্রহকে ধূমকেতুর ধাক্কায় নতুন রূপ

নিতে দেখেছি—যেমন ঘটেছিল তোমাদের পৃথিবীর ক্ষেত্রে—ধূমকেতুর ধাক্কায় মহাপ্লাবন হল, অগ্ন্যুৎপাত ঘটল, আকাশ থেকে পাথরবৃষ্টি হল, পেট্রল বৃষ্টি হল, পৃথিবীটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল—আমি তখন পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, সমুদ্র ফুটছে, মহাদেশ তেতে লাল হয়ে গেছে, পাথর গলে যাচ্ছে, জঙ্গল পুড়ছে। আমি দেখলাম, বৃহস্পতি গ্রহের খানিকটা অংশ ছিটকে এসে ধূমকেতু হয়ে গেল—পৃথিবীটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে নিজে হয়ে গেল আর একটা গ্রহ—তোমাদের এখনকার শুক্রগ্রহ। পৃথিবীতে পালে পালে মানুষ মরছে দেখে টহল দিতে গেলাম ছায়াপথের অন্য অঞ্চলে। ফিরে এসে দেখি পৃথিবীতে আবার মেধার সৃষ্টি হয়েছে। সারা গ্রহটাকে চর্কিপাক দিয়ে সন্ধান পেলাম তোমার এই গুরুদেবের—যার চাইতে বড় মেধা আজও কোথাও পাইনি। হে মূর্খ, আমার মধ্যে শক্তি আছে, তবুও আমি অসহায়—কারণ আমার দেহ নেই। আমি সর্বশক্তিমান হয়েও নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকেছি, প্রাণময় হয়েও নিষ্প্রাণ থেকেছি—মন আর মেধার সন্ধানে বুভুক্ষের মত হন্যে হয়ে এক নক্ষত্রজগৎ থেকে আরেক নক্ষত্রজগতে পাড়ি জমিয়েছি। আজ আমার অভিযান সার্থক হয়েছে—পেয়েছি উপযুক্ত আধার—প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র এখন আমার!"

প্রফেসর কিন্তু আমার দিকে কান ফিরিয়ে থাকলেও চেয়েছিলেন সুদূর স্ফুলিঙ্গটির দিকে—আরও কাছে এগিয়ে এসেছে—পুচ্ছ দেখা যাচ্ছে। জ্যোতির্ময় একটা রেখা বিস্তৃত পেছনে। ঠিক যেন ঝাঁটা। চুলের রাশি লম্বমান পেছনদিকে।

ধ্যানস্থ কণ্ঠে প্রফেসর বললেন – "দীননাথ, এই সন্দেহটা তো আমার মনেও অঙ্কুরিত হয়েছে।"

"আপনার মনেও ?"

'এত কথা মনে আছে, আমার কথাগুলো মনে পড়ছে না? আশ্চর্য ব্রেন বটে! মিউজিয়ামে রেখে দেওয়ার মত। ভাইরাসকে যখন বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে, বাধা দিইনি আমি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি বলেছিলেন, বটে, ওকে ওর ডেরায় নিয়ে যাবেন। ডক্টর কো জানতে চেয়েছিলেন, ডেরাটা কোথায়। জানতে চেয়েছিলেন, কি করবেন সেখানে ওকে নিয়ে গিয়ে। আপনি বলেছিলেন – "

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রফেসর বললেন – "নিস্তেজ ভাইরাসকে নিয়ে গিয়ে ওদের সাঙ্গপাঙ্গদের বুঝিয়ে দেব মানুষের পেছনে লাগতে এলে

পরিণামটা কি হয়। তারপর তুমি আর আমি দুজনেই যখন ওদের অবধ্য — ভ-৩০৯ ছড়িয়ে দেব যাতে প্রত্যেকেই নিস্তেজ শক্তিহীন হয়ে যায় — ভবিষ্যতে ডেরা থেকে কেউ ছিটকে বেরিয়ে এসে ছায়াপথের বিপদ ডেকে আনতে না পারে। আমার সে প্ল্যান তো ভণ্ডুল হয়ে গেল।"

"ভালই হয়েছে। ঐ বিটলেদের আস্তানায় যাওয়ার আমার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। কিন্তু প্রফেসর, ধূমকেতুর সঙ্গে ভাইরাসের কি সম্পর্ক?"

প্রফেসর সে কথার জবাব না দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন — "বলো তো এত তাড়াতাড়ি ধূমকেতুটা কেন এগিয়ে আসছে?" বলেই আমার জবাবের অপেক্ষা না রেখে বললেন — "ভবিষ্যৎ থেকে আমরা যে ছুটে যাচ্ছি অতীতে — আর ধূমকেতু আসছে অতীত থেকে ভবিষ্যতে — মহাকালের পথে মুখোমুখি হচ্ছি বলেই ওর স্পীড এত বেশী মনে হচ্ছে।"

"মুখোমুখি হচ্ছি!" আঁৎকে উঠলাম আমি — "বলেন কী? মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে তো _ "

"মাভৈঃ, মূর্খ! আমরা রয়েছি অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশনে — কোনো বস্তু আমাদের সংহার করতে পারবে না — ফুঁড়ে বেরিয়ে যাব!"

"অ।"

"তার মানে কিছুই বোঝোনি।"

"আলবৎ বুঝছি। ঝড় ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মত আমরাও বেরিয়ে যাব। এই তো?"

"তার চাইতে বেশী। ঝড় তো আমাদের কোষের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না — এই ধূমকেতুর মধ্যে কিন্তু আমাদের কোষগুলো মিশে যাবে। সেই সময়ে যদি সময়-গাড়ী বিকল হয়, অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশন থেকে বেরিয়ে আসি — তাহলেই জানবে প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটবে।"

সভয়ে বললাম—"তাহলে দরকার নেই ধূমকেতুর ভেতরে ঢুকে, বাইরে থাকুন। আপনার মেশিনকে বিশ্বাস নেই।"

কড়া গলায় প্রফেসর বললেন—"আমার মেশিনকে তোমার চাইতেও আমি বেশী বিশ্বাস করি, ননসেন্স কোথাকার। আসলে আমি বাইরে থাকব অন্য কারণে—যে প্রলয়ের ফলে পৃথিবীর সব কটা মহাকাব্যে, পুরাণে, কিংবদন্তীতে একটাই কাহিনীর সৃষ্টি, তা স্বচক্ষে দেখব।"

"কি কাহিনী?"

"মহাপ্লাবন।" একটু থেমে বললেন—"আরও অনেক কিছু।"

"প্রফেসর!"

কিন্তু তিনি তখন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলে চলেছেন—"মানুষের জ্ঞানের আধার কি সম্পূর্ণ হয়েছে? মানুষ মনে করে মাত্র কয়েক ধাপ এগুলেই বুঝি ব্রহ্মাণ্ড বিজয় সম্পূর্ণ হবে? ভুল, ভুল! পরমাণু থেকে শক্তি আহরণ করেই মানুষ অহংকারে মত্ত হয়েছে, কিন্তু আজও সে জানে না ক্যানসার রোগ কি করে সারানো যায়, বংশগতিকে কি করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, অন্য গ্রহের সঙ্গে কিভাবে চিন্তা বিনিময় করা যায়। অন্যান্য গ্রহে আদৌ জীবন্ত প্রাণী আছে কিনা: আজও যে-বিজ্ঞান জানতে পারেনি— মহাশূন্যের ভাইরাস-আক্রমণের কাহিনীর ঠাঁই সে বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোনোদিনই হবে না।"

"বিজ্ঞানের ইতিহাসে ঠাঁই না হোক, কল্পবিজ্ঞানের ইতিহাসে তো ঠাঁই হতে পারে?" ফাঁক পেয়েই বলে উঠলাম আমি।

কিন্তু প্রফেসর তখন রোমন্থন-নিমগ্ন। আপন মনেই বলে চলেছেন —"অজ্ঞান মানুষ! এত দম্ভ কেন তোমার? আজও তুমি জানো না প্রাণ কী, কোত্থেকে তার আগমন, অজৈব বস্তু থেকে কি না—তাও সঠিক জানা নেই। এই সূর্য বা অন্যান্য সূর্যের গ্রহ-পরিবারেও আদৌ প্রাণ আছে কি না, থাকলেও তারা আমাদের মতন কি না, তাও তুমি জানো না। তুমি জানো না মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃত রহস্য কী, তুমি জানো না তোমার পায়ের পাঁচ মাইল তলায় পৃথিবীর চেহারাটা কি রকম, তুমি জানো না পাহাড়-পর্বত আর মহাদেশের পর মহাদেশের সৃষ্টি হল কি করে। অনুমিতির অন্ত নেই তোমার, কিন্তু জানো কি, কেন এই সেদিনও হিম আবরণে ঢাকা ছিল ইউরোপ আর নর্থ আমেরিকার অধিকাংশ অঞ্চল? জানো কি মেরু-বৃত্তের মধ্যে তালবৃক্ষ জন্মায় কি করে? একই উদ্ভিদকে কেন পাওয়া গিয়েছে ইউরোপ আর আমেরিকার ভেতরকার সরোবরে? জানো কি সমুদ্রে লবণ এলো কোত্থেকে? মানুষ! লক্ষ লক্ষ বছর এই পৃথিবীর বুকে তুমি রয়েছো। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস জেনেছো মাত্র কয়েক হাজার বছরের—তাও পুরোপুরি জানোনি। বলো তো, ব্রোঞ্জযুগ লোহযুগের আগে এসেছিল কেন মানব সভ্যতায়? লোহা তো আরও বেশী করে ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীতে—তামা আর টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ উৎপাদনের চেয়েও সহজ হল

লৌহ উৎপাদন। তবে কেন ব্রোঞ্জ যুগ এল লৌহযুগের আগে? জানো না, হে মূর্খ মানুষ—তুমি তা জানো না। তুমি জানো না, কোন যান্ত্রিক উপায়ে অ্যান্ডিজ পর্বতের উচ্চ অঞ্চলেও নির্মিত হয়েছিল বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে বিপুল ইমারত। সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের সমাধানও আজও তুমি করে উঠতে পারোনি। পৃথিবীর সব দেশেই মহাপ্লাবনের কিংবদন্তী পাওয়া যায় কেন বলো তো? মহাপ্লাবনের পূর্ববর্তী যুগটাকে অ্যান্টিডিলিউভিয়ান যুগ বলেই খালাস তোমরা—কিন্তু শব্দটার প্রকৃত তৎপর্য কোনো দিন কি মাথায় ঢুকেছে? কলিযুগের শেষের প্রলয় দৃশ্য সম্বন্ধে কোনো বৈজ্ঞানিক ধারণা কি তোমার আছে?"

বিষম ভয় পেলাম। পাগল হয়ে গেলেন নাকি প্রফেসর? এদিকে তো ভীষণ বেগে ছুটে আসছে মূর্তিমান প্রলয়—ঐ ধূমকেতু! প্রফেসরের মস্তিষ্কের উন্মাদ-বীজ কি ঠিক এই সময়েই অঙ্কুরিত হল? কিন্তু ওঁকে ঘাঁটাতেও সাহস পেলাম না। পাগলের মতই বিড়বিড় করে চললেন আগন্তুক ধূমকেতুর পানে চেয়ে থেকে—সম্মোহিতের মত।

"মানুষ! হে মূর্খ মানুষ! অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করছো তুমি! কিন্তু কতটুকু জানো তুমি? তুমি দেখছো সূর্য রোজ পূবে উঠছে, অস্ত যাচ্ছে পশ্চিমে। তুমি জানো চব্বিশ ঘণ্টায় হয় একটা দিন। ৩৬৫ ঘণ্টা ৫ দিন ৪৯ মিনিটে হয় একটা বছর। কলা পরিবর্তন করে চাঁদ আবর্তন করছে পৃথিবীকে—আসছে অমাবস্যা আর জ্যোৎস্না, শুক্লপক্ষ আর কৃষ্ণপক্ষ। মনের আনন্দে কবিতা লিখে চলেছো তাই নিয়ে। তুমি জানো ভূগোলকের অক্ষরেখা রয়েছে ধ্রুবতারা বরাবর এক লাইনে। তুমি জানো, শীতের পর আসে বসন্ত, তারপর গ্রীষ্মের পর বর্ষা। মামুলি ঘটনা—কে না জানে। কিন্তু এই নিয়ম কি অপরিবর্তণীয় নিয়ম? এই ভাবেই কি বলবে চিরটা কাল? এইভাবেই কি ছিল চিরটা কাল? আসছে··· ঐ ধূমকেতু আসছে তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করতে।"

দম নেবার জন্যে এক সেকেন্ড থামতেই আমি ত্রস্তে বললাম—"কিন্তু ও যে এসে গেল—"

"আসুক, আজকের যা কিছু সম্পদ পৃথিবীর, তা ঐ প্রলয়রূপী ধূমকেতুর জন্যেই—আবার যা কিছু বিপর্যয়, তাও ঐ ওর জন্যে। ভাইরাস সংক্রমণের বিভীষিকার বীজও ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে ঐ কালান্তক ধূম-

কেতু···তবুও তুমি এসো, তুমি এসো, তুমি এসো···আমি যে পথ চেয়ে বসে আছি তোমার সৃষ্টি-স্থিতি-লয় লীলা প্রত্যক্ষ করার জন্যে। তুমিই একত্রে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর! তোমাকে প্রণাম!"

উন্মাদ···একেবারেই উন্মাদ হয়ে গেছেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র। তাঁর করজোরে ধূমকেতু-বন্দনার দেহভঙ্গিমা দেখে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল আমার। এদিকে সেই করাল পুচ্ছ দীর্ঘতর হয়েছে···প্রজ্বলিত শীর্ষদেশ বৃহত্তর হয়েছে···পাগল প্রফেসরকে থামাই কি করে?

আপন মনেই প্রফেসর তখন হাসছেন—"এসো, এসো, হে অবিনশ্বর, তুমি এসো! বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদে তোমার কীর্তি রূপকের মাধ্যমে বন্দিত হয়েছে, কিন্তু তোমাকে কেউ দেখেনি। ইতিহাস আর পুরাণে তোমার কাহিনীই নানান গল্পের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে, কিন্তু তোমার কথা সবাই ভুলে গেছে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই তিন কালের মধ্যে বিচরণ করার ক্ষমতা লাভ করে আজ তোমার অতীত কীর্তি প্রত্যক্ষ করতে চলেছি, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রের মধ্যে দিয়ে তোমার অপরূপ বিহার দেখে নয়ন সার্থক করছি। নদ নদী, সমুদ্র, পর্বত, গ্রাম, নগর, উপবন তোমারই সৃষ্টি—এই বিশাল বিশ্বক্ষেত্রে তুমি না থাকলে আজ এই অবস্থায় মানবজাতি উন্নীত হতে পারত না—তোমাকে নমস্কার।"

"প্রফেসর!"

"শাস্ত্রে আছে, প্রথমতঃ এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। সে শাস্ত্র রচিত হয়েছিল তোমার আবির্ভাবের পর। তাতে লেখ ছিল, অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হল। ঐ অণ্ডে অনাদি, অনন্ত, অচিন্তনীয়, অনির্বচনীয়, সত্যস্বরূপ, নির্বিকার, জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হলেন। কে সেই ব্রহ্ম? সে কি তুমি? তোমার থেকেই জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দশদিক্, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাত্রি এবং অন্যান্য বস্তু সঞ্জাত হয়েছিল? প্রলয়কাল উপস্থিত হলে আবার কি এই সবই তোমার মধ্যে লীন হয়ে যাবে? পরব্রহ্ম কল্পনা করা হয়েছে কি তোমাকেই? আর কোনো চিহ্ন থাকবে না? প্রলয়, উৎপত্তি, স্থিতি—ঘূর্ণায়মান সংসারচক্রের মূল কি তুমি? শেষের সেদিনের সম্ভাবনা কি শাস্ত্রে এইভাবেই বর্ণিত হয়েছে? তুমি আসবে মহাকালের পথ পেরিয়ে প্রলয় বিষাণ বাজিয়ে তোমারই সৃষ্টিকে সংহার করতে? সেই কি কলি-

যুগের শেষ ?"

"প্রফেসর ! প্রফেসর ! দোহাই আপনার ?"

"চুপ করো মানুষ ! মূর্খ মানুষ !"

যাচ্চলে ! এতো দেখছি বদ্ধ উন্মাদ !

উন্মাদের গলা তখন ধাপে ধাপে চড়ছে—"সূর্যের আছে ন'টা গ্রহ। বুধের কোনো উপগ্রহ নেই। শুক্রেরও কোনো উপগ্রহ নেই। পৃথিবীর আছে একটা চাঁদ। মঙ্গলের আছে ছোট ছোট দুটো উপগ্রহ—পাথরের দুটো ডেলা বলা যায়—দুটোর একটা এত তাড়াতাড়ি আবর্তন সম্পূর্ণ করছে যে মঙ্গলের একটা দিনও ততক্ষণে ফুরোচ্ছে না। কিন্তু বৃহস্পতির আছে এগারোটা চাঁদ আর এগারোটা বিভিন্ন হিসেবের মাস। শনির আছে নটা চাঁদ। ইউরেনাসের আছে পাঁচটা চাঁদ। নেপচুনের একটা, প্লুটোর কেউ নেই। এইরকমই কি ছিল চিরটা কাল ? এইরকমই কি থাকবে চিরটা কাল ? হে ধূমকেতু, তোমার মতই আর একজন এসে আবার সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যাবে না তো ? গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে নতুন প্রলয়, নতুন উৎপত্তি, নতুন স্থিতির সূচনা করে যাবে না তো ?

"সূর্য তো পাক দিচ্ছে পূব দিক দিয়ে। সমস্ত গ্রহরা সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে নিজের নিজের কক্ষপথে একই দিকে। বেশীর ভাগ চাঁদই ঘুরছে একই দিকে—মানে, ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘুরছে, তার উল্টো দিকে। কিন্তু কয়েকটা চাঁদ তো এই নিয়ম মানে না ? তারা কেন বিপরীত দিক দিয়ে আবর্তন করে ? তাছাড়া, কারোর কক্ষপথই তো দেখছি সঠিক বৃত্ত নয়। গ্রহদের প্রতিটি কক্ষপথে খামখেয়ালীপনার চূড়ান্ত। প্রত্যেকের ডিমের মত কক্ষপথ বিস্তৃত এক-একদিকে।"

পাগলা ঘোড়াকে আচমকা রাশ টেনে হঠাৎ থামিয়ে দেওয়া মুস্কিল। তার সঙ্গে কিছুটা দৌড়ে একটু একটু করে গতি মন্দীভূত করাই সঙ্গত। এই কৌশলই প্রয়োগ করলাম প্রফেসরের ক্ষেত্রে। বিষে বিষক্ষয় করা আর কি। ওঁর পাগলামির সঙ্গে আমিও জুড়লাম আমার পাগলামি।

ওদিকে কিন্তু ক্রমশঃ রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে ধূমকেতু। কালো মহাকাশের বুকে অজস্র রঙের খেলা শুরু হয়ে গেছে।

আমি বললাম—"উল্টো পাল্টা হওয়া আশ্চর্য কি ? হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান ?"

"কি চমৎকার উপমাই দিলে আহা! আহা! হাতের পাঁচটা আঙুল অসমান সব মানুষেরই। সবারই কড়ে আঙুল ছোট হয়, মধ্যমা বড় হয়—সেখানেও একটা মিল আছে। কিন্তু গ্রহদের ক্ষেত্রে, উপগ্রহদের ক্ষেত্রে কেন এত অমিল? কেন বুধ সব সময় একদিক সূর্যের দিকে ফিরিয়ে থাকে, কিন্তু শুক্র থাকে না? কেন মঙ্গল ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২২.৬ সেকেণ্ডে এক পাক খায়, অথচ পৃথিবীর চেয়ে ১৩০০ গুণ বড় হয়ে এক পাক খেতে বৃহস্পতির সময় লাগে মাত্র ৯ ঘণ্টা ৫০ মিনিট? প্লুটো পূব থেকে পশ্চিমে ঘোরে বলে তার সূর্যোদয় ঘটে পশ্চিমে, কিন্তু ইউরেনাসের সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত পূবেও হয় না, পশ্চিমেও হয় না। কাজেই সৌরজগতের সব গ্রহরাই যে কেবল পশ্চিম থেকে পূবে ঘুরবে এবং সূর্য কেবল পূবেই উঠবে, এমন নিয়ম নেই। আশ্চর্য নয় কি?"

"গ্রহগুলো তো আর সূর্যের হাত-পা নয় যে একই নিয়মে চলবে?" টিপ্পনি কাটলাম আমি।

অন্যসময়ে হলে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতেন প্রফেসর। সেই মুহূর্তে আগুনে ধূমকেতুর সম্মোহনী প্রভাবে উনি যেন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। আমার টিটকিরি কানে ঢুকেছে বলেও মনে হল না।

বললেন সেই রকমই আচ্ছন্ন গলায়—"কত প্রহেলিকাই ভীড় করে আসছে মনের মধ্যে—কয়েকটার ব্যাখ্যা এখুনি দেখতে পাবে চোখের সামনে; কিন্তু বাকীগুলোর ব্যাখ্যা তো আজও বিজ্ঞানীরা ভেবে বার করতে পারেন নি? তবে কেন এত লম্পঝম্প? এত সবজান্তা ভাব? এই ঋতু পরিবর্তনের ব্যাপারটাই ধরো না কেন। পৃথিবীর বিষুবরেখা ক্রান্তি বৃত্তের সমতলে সাড়ে তেইশ ডিগ্রী কোণ করে রয়েছে বলেই শীত গ্রীষ্ম বর্ষার আনাগোনা। কিন্তু অন্যান্য গ্রহের ক্ষেত্রে অক্ষরেখা তো খেয়ালখুশী মত হেলে রয়েছে। একই নিয়মে সব গ্রহে তো শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত বসন্তর জয় যাত্রা ঘটে না? কেন? দীননাথ? কেন? কে তার জবাব দেবে? ইউরেনাসের অক্ষরেখা কক্ষপথের প্রায় সমতলে থাকায় প্রায় কুড়ি বছর ধরে একটা মেরুপ্রদেশ সবচেয়ে গরম থাকে, আস্তে আস্তে নামে রাত্রি—আরেক মেরুপ্রদেশে শুরু হয় বিশ বছরের গ্রীষ্ম। চাঁদের কোনো আবহমণ্ডল নেই। বুধের আছে কিনা জানা নেই। শুক্র ঘন মেঘে ঢাকা। কিন্তু জল-বাষ্প একদম নেই। মঙ্গলের আবহমণ্ডল স্বচ্ছ, কিন্তু অক্সিজেন

তার আবহমণ্ডলে নেই বললেই চলে। বৃহস্পতি আর শনিকে ঘিরে আছে গ্যাসের খোলস—তাদের দেহ নিরেট কিনা জানা যায় নি। মঙ্গলের ভল্যুম পৃথিবীর ভল্যুমের ০.১৫, কিন্তু পরের গ্রহ বৃহস্পতি মঙ্গলের চেয়ে ৮,৭৫০ গুণ বড়। সৌরজগতের বাসিন্দা হয়েও গ্রহদের অবস্থান বা আকারে কোনো মিল নেই। অবাক কাণ্ড, তাই না ? মঙ্গলে দেখা যায় 'খাল' আর মেরু-কিরীট, চাঁদে জ্বালামুখ, পৃথিবীতে আয়নার মত আলোক প্রতিফলনকারী সমুদ্র, শুক্রে ঝলমলে মেঘ, বৃহস্পতিতে বেল্ট আর একটা লাল ফুটকি, শনিতে আংটি। বিচিত্র! বিচিত্র!''

এরকম বিচিত্র পরিস্থিতিতেও আমিও কখনো পড়িনি। সময়-গাড়ী ধেয়ে চলেছে মহাকালরূপী ধূমকেতুর দিকে, আর কানের কাছে চলছে পাগলের প্রলাপ অনর্গল ভাবে।

"তাহলেই দ্যাখো দীননাথ, গ্রহ নক্ষত্রের বৈষম্য নিয়েই গড়ে উঠেছে, আশ্চর্য একতা। এদের সাইজ আলাদা, চেহারা আলাদা, আবর্তনের গতিবেগ আলাদা, অক্ষরেখা বসানো উল্টোপাল্টাভাবে, আবহমণ্ডলের উপাদান আলাদা অথবা আবহমণ্ডল বলে আদৌ কিছু নেই, চাঁদের সংখ্যা আলাদা অথবা চাঁদ বলে কিছুই নেই! যেন দৈবাৎ পৃথিবীর বরাতে একটাই চাঁদ জুটেছে, দিন আর রাত পেয়েছি, এক দিনে চব্বিশটা ঘণ্টা পেয়েছি, ঋতু-পরিবর্তন পেয়েছি, সমুদ্র পেয়েছি, জল পেয়েছি, আবহমণ্ডল পেয়েছি, অক্সিজেন পেয়েছি, বাঁয়ে শুক্র আর ডাইনে মঙ্গলকে পেয়েছি। সবটাই কি বরাত, না, এর পেছনে কারও কারসাজি আছে ? সে কি ঐ ধূমকেতু, না আর কেউ ?"

''যেই হোক না,'' মিনতির সুরে এবার বললাম—''এখনই কি তা নিয়ে গবেষণা করতে হবে ?''

"গবেষণা !" যেন আকাশ থেকে পড়লেন প্রফেসর—''গবেষণা করেই কি সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় হে মূর্খ ? নিউটন তো বলেই খালাস মহাকর্ষই গ্রহদের টেনে রেখে দিয়েছে—ছিটকে বেরিয়ে যেতে দিচ্ছে না। গ্রহরা টেনে রেখে দিয়েছে উপগ্রহদের—নইলে কে কবে কোথায় উধাও হয়ে যেত। খুব ভাল কথা। কিন্তু নিউটন মহাশয় তো একবারও ব্যাখ্যা করে দেননি কিভাবে এবং কখন প্রাথমিক টানা হেঁচড়া শুরু হয়েছিল ? গবেষণায় তো পাওয়া গেছে অষ্টরম্ভা। গ্রহজগতের সৃষ্টি রহস্যেরই সন্তোষজনক সমাধান করতে পেরেছে কি গবেষণা ? ফরাসী বিজ্ঞানী লাপ্লাস তো তাঁর

নীহারিকাবাদ দিয়ে একসময়ে খুব হৈ চৈ ফেলেছিলেন। ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা থেকেই নাকি সূর্য আর গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি। সূর্যটা আগে ছিল নাকি একটা চ্যাপ্টা চাকতির মত। ঘুরতে ঘুরতে তার কিনারাগুলো খসে গিয়ে গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই তত্ত্বের যে তিনটি ত্রুটি পরে ধরা পড়ল, তার অন্যতম টি হচ্ছে, তাই যদি হবে তো সৌরজগতের বেশীর ভাগ সদস্য যেদিকে ঘুরপাক খায়, কয়েকটা উপগ্রহ কেন তার উল্টোদিকে ঘোরে? কাজেই নাকচ হয়ে গেল লাপ্লাস থিওরী। হাজির হল জোয়ারী মত। একটা বিরাট তারা সূর্যের খানিকটা অংশ পেটমোটা চুরুটের আকারে ছিঁড়ে নিয়েছিল, তাই থেকেই গ্রহ উপগ্রহ জন্ম নেয়। কিন্তু পেটমোটা চুরুটের মত অংশ থেকে যাদের জন্ম, তাদের সাইজগুলোও তা সেইভাবে ছোট থেকে বড় হয়ে আবার ছোট হয়ে যাওয়া উচিত। সূর্যের কাছে বুধ খুবই ছোট ঠিকই, সূর্যের একদম দূরের প্লুটোও খুব ছোট। কিন্তু পৃথিবী আর বৃহস্পতির মাঝের গ্রহ মঙ্গলের সাইজ তো পৃথিবীর চেয়ে বড় হওয়া উচিত ছিল? কেন হয়নি? নেপচুনও তো ইউরেনাসের চেয়ে বড়—ছোট তো নয়। কাজেই নাকচ হয়ে গেল জোয়ারী মতও। এগিয়ে এল যুগ্ম-নক্ষত্র মত। সূর্য নাকি আগে জোড়া তারা ছিল। একটি তারার বিস্ফোরণ থেকে গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি। এ মতেরও খুঁত বেরিয়েছে পরে। এত গবেষণা করেও সৌরজগতের সৃষ্টি আজও রহস্যাবৃত। তবে আর গবেষণা গবেষণা করে লাফাচ্ছো কেন?"

"লাফাচ্ছি না, ঐ ধূমকেতুটা—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধূমকেতু প্রসঙ্গেই আসছি এবার। ধূমকেতুর উৎপত্তি নিয়েও কি কম গবেষণা হয়েছে? নীহারিকাবাদ আর জোয়ারী মত তো ধূমকেতুর সৃষ্টিরহস্য নিয়ে মাথা ঘামায় নি। হাজির হয়েছে অনেক মতবাদ। কিন্তু কোনোটাই সন্তোষজনক নয়। সূর্য কি সঙ্কুচিত হওয়ার ফলেই ধূমকেতুদের ছিটকে বার করে দিয়েছে? সূর্যের পাশ দিয়ে আরেকটা নক্ষত্র যাওয়ার সময়েই কি ধূমকেতুদের বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে? ধূমকেতুরা কি সৌরজগতের বাইরে অন্যান্য নক্ষত্রজগৎ থেকে এসে বড় গ্রহগুলোর টানে ধরা পড়ে গিয়েছে? বড় গ্রহগুলো কি নিজেদের দেহ থেকে ধূমকেতুদের ঠেলে বার করে দিয়েছে? কেউ জানে না, কেউ জানে না কোটি কোটি বছর আগে আসলে কি ঘটেছিল।"

"আপনিই সব জেনে বসে আছেন," আর রাগ চেপে থাকতে পারলাম না। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়? ওদিকে ধূমকেতুর করালরূপ রক্তহিম করে দিচ্ছে, এদিকে কানের কাছে বিশ্বকোষ সরব হয়েছে। অসহ্য! অসহ্য!

প্রফেসর কিন্তু অম্লানবদনে বললেন—"তা তো জানিই। ধূমকেতু যে এক মজার জিনিস, দীননাথ।"

"মজার জিনিস! ল্যাজটা কত লম্বা হয়ে গেছে দেখেছেন? ওর ঝাপটায় তো পৃথিবী এখুনি খান খান হয়ে যাবে।"

"খান খান যে হয়নি, তা তুমিও জানো। সেকালের লোকেই ল্যাজের ঐ অদ্ভুত চেহারা দেখে ভয়ে মরত। তটস্থ হয়ে থাকত। কিন্তু ১৯১০ সালে হ্যালীর ধূমকেতুর ল্যাজ পৃথিবীকে ঝাঁট দিয়ে চলে গেছিল, কেউ কিন্তু কিছু টের পায়নি। একটা গাছের পাতারও কিছু হয়নি। অসম্ভব হাল্কা ল্যাজ তো, খুবই ফাঁকা ফাঁকা। তাতে ধাক্কা লাগবে কি?"

"কিন্তু এর ঝাঁটা তো দেখছি লম্বা চুলের মত।"

"হবেই তো। ঐজন্যেই তো ওর নাম কমেট, মানে, 'লম্বা চুলওয়ালা'।

"কী ভয়ংকর!"

"এ আর কি ভয়ংকর দেখছো, দীননাথ। ১৮৬১ সালে যে ধূমকেতু-টাকে এক বছর ধরে দেখা গিয়েছিল, তার ল্যাজটা ছিল সত্যিই ভয়ংকর—লম্বায় ১৫-২০ কোটি মাইল তো বটেই। আবার ১৭৪৪ সালে দ্য-শীজোর ধূমকেতুর ছিল ছ-টা ল্যাজ!"

"হ্যালীর ধূমকেতু তো পৃথিবীকে পাশ কাটিয়ে গেছিল?" একটু আশার সুরেই বললাম।

"তা গেছিল," আমাকে একেবারে নিভিয়ে দিয়ে বললেন প্রফেসর—"কিন্তু এই ধূমকেতুটা যাবে না। অথবা গিয়েও ফিরে আসবে।"

"আপনি তো সর্বজ্ঞ নন।"

"কিছু ব্যাপারে তো বটেই," অনেকটা স্বাভাবিক স্বরে বললেন প্রফেসর। "সবাই তো আর পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। অনেক ধূমকেতুই বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি বড় গ্রহদের টানে পড়ে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে যেতে না পেয়ে তার মধ্যেই ঘোরে। বৃহস্পতিকে নিয়ে এত ভয় পাচ্ছি তো সেই কারণেই।"

"কেন?"

"এরকম তিরিশটা ধূমকেতুকে সে ধরে রেখে দিয়েছে। হ্যালীর ধূমকেতু তো নেপচুনের টানে বন্দী হয়েছে। বুধের টানে এন্‌কে-র ধূম-কেতুও এমনি বিপদে পড়েছিল—বেচারীকে সোয়া তিনবছর বছর বাদে ঠিক দেখা যায় আজও। টানাটানিতে কত ধূমকেতুর ল্যাজ ছিঁড়ে গেছে, দেহটাও টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। যেমন ধরো না কেন বায়েলা-র ধূমকেতু। বেশ পৌনে সাত বছর পর-পর আসছিল। ১৮৪৬ সালে হঠাৎ দেখা গেল তার ল্যাজ নেই। দেহের মাঝখানটাও সরু হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে মাঝখানটা ভেঙে দুটো আলাদা টুকরো হয়ে গেল। তারপর আর তাকে দেখা যায়নি। যেদিন তার আসার কথা ছিল, সেইদিন, মানে, ১৮৭২ সালের ২৭শে নভেম্বর দেখা গেল আকাশে যেন আগুন বৃষ্টি হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, বায়েলা-র ধূমকেতু ভেঙে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। প্রায় একই দশাই হবে ঐ ধূমকেতুর। ঘাবড়াচ্ছো কেন?"

"ঘাবড়াচ্ছি কি আর সাধে? হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। তার ওপর আপনার বকবকানিতে—"

"মাথা ঘুরছে? সইয়ে দিচ্ছি, দীননাথ, সইয়ে দিচ্ছি, নইলে যে এর পরের দৃশ্য দেখলে হার্টফেল করবে। অজ্ঞানকে জ্ঞান দিয়ে যাওয়টা ঝকমারি বুঝি, কিন্তু তোমাকে জ্যান্ত ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো, তাই একটু জ্ঞানের ভ্যাকসিনেসন দিয়ে দিলাম—বড় জ্ঞানে আর কুপোকাৎ হবে না।"

"কিন্তু ঐ ব্যাটাচ্ছেলের জন্মটা কোথায়, সে জ্ঞানটুকু তো দিলেন না? জানা নেই নিশ্চয়?"

"কোন্ ব্যাটাচ্ছেলের?"

"ঐ ধূমকেতু ব্যাটাচ্ছেলের! চেহারাখানা দেখুন, ঠিক যেন ঝাঁটার ওপর বসে ডাইনী উড়ে আসছে।"

"অথবা ঢেঁকিতে বসে নারদ উড়ে আসছে। ঢেঁকিবাহন নারদ আর ঝাঁটাবাহন ডাইনীর কল্পনা তো এইভাবেই পৃথিবীর সবকটা দেশেই আজও রয়ে গেছে। সংঘর্ষ বাঁধিয়েছিল এই ধূমকেতু—তাই নাকি নারদ ঝগড়া বাধায়। বিপর্যয় ডেকে এনেছিল বলে ডাইনীও নাকি লোকের অনিষ্ট করতেই আসে। কিংবদন্তী আর পুরাণ কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে তো

এই ভাবেই। আকাশের আতংক বহুপুরুষ পরে পুরাণ কাহিনীর রূপ নিয়েছে। কিন্তু ছিঃ দীননাথ, মহাশয় ধূমকেতুকে ব্যাটাচ্ছেলে বলাটা তোমার ঠিক হয়নি।"

"বাইরের উৎপাতকে ব্যাটাচ্ছেলে বলব না তো—"

"বাইরের উৎপাত কাকে বলছো? সূর্য আর বৃহস্পতির মাঝখানে পঞ্চাশটা ধূমকেতু ঘুরছে—তাদেরকে বাইরের উৎপাত বলতে পারো—ওকে নয়। ওর জন্ম রহস্য আমি জানি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জীবন্ত বিশ্বকোষ আপনি।"

"ছিঃ ছিঃ, শুভলগ্নে মাথা গরম করাটা কি ঠিক? ধূমকেতুর জন্ম কেউ দেখেনি ঠিকই, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে কোটি কোটি বছর আগে বড় গ্রহগুলো যখন গ্যাসীয় অবস্থায় রয়েছে, তখন তাদের গা থেকে ধূমকেতু ছিটকে বেরিয়ে আসা বিচিত্র নয়। বৃহস্পতির গা থেকে সেকেণ্ডে ৩৮ মাইল বেগে একটা পিণ্ড ছিটকে এলে তার পক্ষে মাধ্যাকর্ষণের টান এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস, ঐ যে ধূমকেতুটা আসছে ঝাঁকরা চুলের মত ল্যাজ উড়িয়ে, ওকেও ঠেলে বার করে দিয়েছে বৃহস্পতি এইভাবে। তাই শুক্রকে না দেখে বৃহস্পতিকে খুঁজছিলাম। ভাইরাস হুজুর ঠিকই বলেছিল।"

"ধূমকেতুটাই হয়েছে শুক্র গ্রহ?"

"হ্যাঁ।"

পলকহীন চোখে আগন্তুক ধূমকেতুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ খেয়াল হল একটা প্রশ্নের জবাব প্রফেসর এখনো দেননি। ধূমকেতুর সঙ্গে ভাইরাসের কি সম্পর্ক?

ফের জিজ্ঞেস করলাম প্রশ্নটা।

প্রফেসর আনমনা ভাবে ধূমকেতুর পানে চেয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে সংকুচিত হল দুই চক্ষু। চোখের চাহনি পাল্টে এল আস্তে আস্তে। কঠিন হয়ে এল চোয়ালের হাড়। স্ফীত হল নাসারন্ধ্র।

দু-বার ঠোঁট ফাঁক করলেন কি বলবার জন্যে—বলতে পারলেন না। টকটকে লাল রঙে অপার্থিব মনে হল তাঁর মুখচ্ছবিকে। তৃতীয় চেষ্টায় কথা ফুটল বটে কণ্ঠে—কিন্তু স্খলিত স্বর।

বললেন যেন সম্মোহনের ঘোরে—"দীননাথ, সময় হয়েছে নিকট!"

২২ ॥ শেষের সেদিন ভয়ংকর

বিশ্বাসঘাতক ব্রেনকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব না আমি তারপরের সব কিছু স্পষ্ট মনে করতে না পারার জন্যে। মেধাবী তাকেই বলে যে মগজের নানান কুঠরিতে জমানো স্মৃতি আর জ্ঞানকে প্রয়োজন মত টেনে আনতে পারে। আমার ক্ষেত্রে তা হয় হঠাৎ—স্বইচ্ছায় নয়। তাই আমি মেধাবী নই। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি।

আমার এই স্মৃতিহীনতা কিন্তু শাপে বর হবে পাঠকপাঠিকার কাছে। প্রফেসরের ম্যারাথন লেকচারের একঘেয়েমিতে আর বিরক্তি বোধ জাগ্রত হবে না। আসলে আমার তখন মুহ্যমান অবস্থা। অজ্ঞান যে হয়ে যাইনি, এই যথেষ্ট। কিন্তু আমি আর আমার মধ্যে ছিলাম না। উন্মত্ততা শুধু আমাকে নয়, প্রফেসরকেও আক্রমণ করেছিল। উনি ক্ষিপ্তের মত টাইম-মেশিন চালনা করেছিলেন কখনো অতীতে, কখনো ভবিষ্যতে। কখনো রকেট জাহাজের মতই মহাশূন্যের এদিকে সেদিকে। কখনো ব্যোমযানের মত উল্কাবেগে পৃথিবীর পাহাড় পর্বত জঙ্গলের ওপর দিয়ে। পাগলের মত চেঁচিয়ে গেছেন। পাগলের মত হাত পা ছুঁড়েছেন। পাগলের মত সময়-গাড়ী চালিয়েছেন। অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশনে থাকার ফলে সংঘাতের পর সংঘাত এড়িয়ে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। পাথর বৃষ্টি, অগ্নিকাণ্ড আর সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মধ্যেও অক্ষত থেকেছি। ভূমিকম্প, ছাই, লাভা আমাদের গায়ে আঁচড়টিও ফেলতে পারে নি। কিন্তু বহু সময় আর বহু পথের ব্যবধানে এত কাণ্ড পরের পর দেখে গেছি যে ঘটনা পরম্পরা তো বটেই, সব ঘটনাও মনে থাকেনি। কিন্তু যেটুকু স্মৃতির কোঠা থেকে উদ্ধার করে এই কাহিনী শেষ করতে চলেছি, তা এমনই লোমহর্ষক, কল্পনাতীত এবং ভয়ংকর যে লিখতে লিখতেও হাত কাঁপছে আমার। জানি ছাপাখানার কম্পোজিটররা আমার এই হস্তাক্ষর দেখে কম্পোজ করার সময়ে আমার বাপান্ত করে ছাড়বে···কিন্তু আমি নিরুপায়। এই স্নায়ু দৌর্বল্য কোনোদিনই আর নিরাময় হবে বলে মনে হয় না আমার।

সমুদয় ঘটনাই কিন্তু ঘটেছে আজ থেকে ৩৪ শ' বছর আগে থেকে২৬ শ' বছর আগেকার সময়ের মধ্যে। টাইম-মেশিনের ঘড়ি তার প্রমাণ। মহা-জাগতিক বিপর্যয়ের দুটো সিরিজ প্রত্যক্ষ করেছি আমি। এ ঘটনা

ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যেই—বিকৃত পৌরাণিক গল্পের আকারে বিধৃত রয়েছে পৃথিবীর সব দেশেই—পুরাণ ঘেঁটে বিশ্লেষণ করে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করার কোনো চেষ্টাই হয়নি—অলীক কল্পনা বলেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার বলছি, এই সেদিনও সৌরজগতের গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ চলেছিল—শান্তি ছিল না, শান্তি ছিল না, শান্তি ছিল না!

সাড়ে তিন হাজার বছর! হ্যাঁ, প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে তো বটেই, টাইম-মেশিনের ঘড়ির সঠিক হিসেবটা মনে নেই—কিন্তু অত্যন্ত অবিশ্বাস্য এই ঘটনার শুরু ঐ সময়েই। অনেকক্ষণ থেকেই টকটকে রক্তলাল বর্ণে উদ্ভাসিত হয়েছিল প্রফেসরের উত্তেজনা-থরথর মুখমণ্ডল। কিছুক্ষণ আগেই যে আকাশিক দেহটি সৌরপরিবারভুক্ত হয়েছে, সে ধেয়ে এসেছে পৃথিবীর অনেক কাছে। সময়ের পথে মুখোমুখি ধাবমান বলেই আমাদের কাছে মনে হয়েছে কিছুক্ষণ—প্রকৃতপক্ষে তা দীর্ঘ সময়।

আমি দেখলাম অনুসূর বিন্দু থেকে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে এল রক্তবর্ণ সেই ধূমকেতু। অনুসূর বা পেরিহিলীয়াম মানে যারা জানে না, তাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, ধূমকেতুর কক্ষপথের যে বিন্দু সূর্যের সবচেয়ে কাছে, তাকে বলে অনুসূর বা পেরিহিলীয়াম। আমি দেখলাম, বহু মাইল লম্বা ঝাঁটার পুচ্ছের আঘাত হেনে গেল সে পৃথিবীর বুকে।

যেন ঝাঁটার বাড়ি মেরে গেল রক্তদেহী ডাইনি। সরাসরি সংঘাত নয় —শুধু ঝাঁটার মার। সপাং করে আচমকা ঝাঁটা মারলে যেমন তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে ককিয়ে উঠতে হয়, পৃথিবী বেচারার অবস্থাও হল প্রায় তাই।

ধূমকেতুর মুণ্ড তখন রক্তোচ্ছ্বাস নিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। আগুন রাঙা নয়—রক্তের মত লাল। এছাড়াও প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ার ফলে অজস্র রঙের হোলিখেলায় মহাকাশ জুড়ে এক অতীব আশ্চর্য আতশবাজির মহড়া শুরু হয়ে গেছে যেন। ১৯৮২তে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ফায়ার ওয়ার্কের খেলা দেখেছিলাম কলাইকুণ্ডার ধু-ধু প্রান্তরে। কিন্তু সেদিন যা দেখলাম, তা কল্পনাতীত। যেন, লক্ষ লক্ষ ন্যাট, হান্টার, মিগ বিমান শব্দের গতিবেগের বহুগুণ বেশী গতিবেগে লক্ষ লক্ষ ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ করতে করতে ধেয়ে গেল আমার সামনে দিয়ে।

ঝাঁটার ঝাপটা লাগার সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর সময়-গাড়ী নিয়ে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ঢুকে পড়েছিলেন: বুঝতে পারি নি। সে চেষ্টাও করিনি।

অ্যাটেন্যুয়েটেড ডাইমেনশনে থাকার দরুন মহাপ্রলয়ের উৎসের মধ্যে দিয়ে ভীমবেগে চক্কর দিয়েছি পৃথিবীকে। কখনও থেমেছি, কখনো নেমেছি, কখনো উঠেছি। উন্মাদ-প্রায় প্রফেসর ঝাঁটার প্রহারে জর্জরিত পৃথিবীর অবস্থা কাছ থেকে দেখবেন বলেই এই কাণ্ড করেছিলেন—কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল সেই কারণেই।

সংঘাতের প্রথম চিহ্নটা চোখে দেখা গেল এইভাবে—সারা ভূপৃষ্ঠ লাল হয়ে গেল লাল ধুলোয়। মরচে রঙের রঞ্জক পদার্থ মিহিধুলোর আকারে ছড়িয়ে গেল ভূমণ্ডলের সর্বত্র। সমুদ্র, সরোবর, নদীর জল রক্তের মত লাল হয়ে গেল রঞ্জক পদার্থের অবিরাম বর্ষণে। লৌহময় অথবা অন্যান্য দ্রবণীয় রঞ্জক-বৃষ্টিতে রঞ্জিত হয়ে লোহিত গ্রহে পরিণত হল সবুজ গ্রহ এই পৃথিবী।

চিৎকার করে বলে চলেছিলেন প্রফেসর—"দীননাথ, দীননাথ, যা দেখছ, তা সত্যি, সত্যি, সত্যি! মধ্য আমেরিকা আর দক্ষিণ মেক্সিকোর সুপ্রাচীন রেড ইণ্ডিয়ানদের মায়া-সভ্যতার নাম নিশ্চয় শুনেছো? তাদের 'ম্যানুস্ক্রিপ্ট কুইচি' গ্রন্থে বর্ণনা আছে ভয়াবহ এই সংঘাতের। গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষের ফলে সেদিনও পৃথিবী ঠিক এমনিভাবে কাৎরে উঠেছিল—সূর্যের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছিল। নদীর জল রক্তে ভরে উঠেছিল। এ ঘটনা ঘটেছিল নাকি পশ্চিম গোলার্ধে। একই বিলাপ কাহিনী পাবে তুমি মিশরীয়দের প্যাপিরাসের পৃষ্ঠায়—রক্ত হয়ে গিয়েছিল নদীগুলো। খৃস্টানদের বুক অফ এক্সোডাস-য়েও পাবে সেই রক্তনদীর হাহাকার।"

প্রফেসর নিজেই তখন হাহাকার করে চলেছেন। তাঁর সব কথা গুছিয়ে লিখতে পারব না। মনেই নেই। রক্তের মত রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতিতে মৃত্যু হল নদীর জলের মাছের ঝাঁকের। মরামাছ পচে উঠে দুর্গন্ধে ভরিয়ে দিল আকাশ বাতাস। আমি দেখলাম, নদীর পাড় খুঁড়ে মিশরীয়রা পানীয় জল বার করছে—রক্তনদীর জল পান করা আর যাচ্ছে না। চারিদিকে ধ্বংস …ধ্বংস…ধ্বংস! জলাভাবের হাহাকার দেশে দেশে। রক্ত ধুলোর সংস্পর্শে এসে চিড়বিড়িয়ে জ্বলছে মানুষ আর জীবজন্তুর চামড়া—চুলকোতে চুলকোতে গায়ে ফোস্কা উঠে যাচ্ছে, চর্মরোগ মারাত্মক হয়ে উঠছে—শেষকালে সারা গা দগদগে ঘা-য়ে ভরে ওঠার ফলে মারা যাচ্ছে মানুষ আর পশু দলে দলে। শ্মশান হয়ে যাচ্ছে নগরের পর নগর, গ্রামের পর গ্রাম,

দেশের পর দেশ। আকাশ বিভীষিকায় আতংকিত বন্যজন্তুরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ছুটে আসছে গ্রাম আর শহরের মধ্যে।

এইসময়ে একটা পর্বতমালা দেখিয়ে প্রফেসর বললেন—"ঐ দ্যাখো থেসস পাহাড়ের চূড়া—ওর নাম 'হেমাস' হয়েছে কেন জানো? রক্তবন্যায় ঢেকে গেছিল বলে—'হেমাস' মানেই যে তাই—রক্তের মত। ঐ দ্যাখো, ঐ দ্যাখো, ঈজিপ্টের ঐ শহরটা—ওরও নাম হেমাস হয়েছে পরবর্তী কালে—রক্তবৃষ্টিতে স্নান করে রক্তলাল হয়ে গিয়েছিল বলে।"

সম্মোহিতের মত টাইম-মেশিন থেকে দেখেছি সেই রক্তদৃশ্য। ভাষার বর্ণনাতীত সেই দৃশ্য। ঠিক এই সময়ে অনেক নিচে দেখলাম একটা রক্ত-লাল সমুদ্র। প্রফেসর চেঁচিয়ে উঠলেন কানের কাছে—"রেড-সী! রেড-সী!"

ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলেছিলাম—"কিন্তু রেড-সী তো সত্যিই রেড নয়।"

সোল্লাসে বলেছিলেন প্রফেসর—"তাহলেই বুঝছো নামটা কেন অমন হয়েছে? রেড-সী তো ঘন নীল রঙের বর্তমানের পৃথিবীতে। তবুও তার নাম লোহিত সমুদ্র। বৈজ্ঞানিকরা ধাঁধার সমাধান করেছিল ছেলে-ভুলোনো ব্যাখ্যা দিয়ে—রেড-সীর তীরে নাকি কিছু লাল পাখী দেখা যায়, জলেও অনেক লাল প্রবাল আছে—তাই তার নাম রেড-সী। মূর্খ! মূর্খ! ঐ দ্যাখো, সত্যিই লালে লাল হয়ে রয়েছে রেড-সী! হাঃ হাঃ হাঃ! মূর্খ! মূর্খ! মূর্খ! র‍্যাফেল 'সী অফ প্যাসেজ' লাল রঙ দিয়ে এঁকেছিলেন কেন এখন বুঝতে পারছো? ভুল তিনি করেননি—করেছে ঐ মূর্খের দল।"

আমি জানি, যাঁদের উনি গায়ের ঝাল মিটিয়ে মূর্খ উপাধিতে ভূষিত করে গেলেন, আজও তাঁরা আমার এই কাহিনী পড়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসবেন, অবিশ্বাসের ভ্রূকুঞ্চন করবেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালেও কি তাঁরা তুষার ছাওয়া পর্বত আর মেরুপ্রদেশে লাল ধুলোর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন নি? উল্কা উধাও হওয়ার পর উল্কার ধূলিকণাই তো পড়ে আছে এই সব অঞ্চলে? তাহলে ব্যাবিলন বাসিন্দারা যখন লিখেছিল লাল ধুলো আর লাল বৃষ্টি পড়েছিল আকাশ থেকে, সেই কাহিনী শুনে অবিশ্বাস করা হয়েছিল কেন? নিশ্চয় তা মেঘ থেকে পড়েনি!

অবিশ্রান্ত লাল ধুলোর বর্ষণে সারা পৃথিবী লাল হয়ে গেল অবশেষে।

রক্তলাল গ্রহের ওপর রক্তকুজ ঝটিকার তাণ্ডব নৃত্য কিন্তু সমাপ্ত হল একসময়ে তারপরেই অল্প খানিকটা ধুলো তুমুল বৃষ্টিপাতের মতই ঝরে পড়ল যে দেশটার ওপর, নাম তার মিশর। কানের কাছে প্রফেসরের ম্যারাথন বক্তৃতা শুনে বুঝলাম, বুক অফ এক্সোডাস পুস্তকে এই ধুলোরও উল্লেখ আছে। যেন চুল্লি থেকে ছাই উড়ে এসেছিল সে-দেশে। ছাইপতন শেষ হতে না হতেই উল্কার ঝাঁক বর্ষণ শুরু হয়ে গেল পৃথিবীর দিকে। সভয়ে দেখলাম, আমার প্রিয় পৃথিবী ধূমকেতুর পুচ্ছদেশের আরও গভীরে প্রবেশ করেছে। চারপাশ দিয়ে কাতারে কাতারে উল্কাখণ্ড ধেয়ে যাচ্ছে পৃথিবী লক্ষ্য করে। প্রথমে ঝরেছিল ধুলো, এখন ঝরছে নুড়ি পাথর। লাখে লাখে। শিলা-বৃষ্টি অনেক দেখেছি, কিন্তু আকাশ অন্ধকার করে এরকম পাথর বৃষ্টি কখনো দেখিনি। ধ্বংসস্তূপ রচনা হয়ে চলেছে গোটা পৃথিবীপৃষ্ঠ জুড়ে। বিরামবিহীন আর্তনাদের সঙ্গে মিশেছে গুরু গুরু গুম গুম ধ্বনি। সে কি আওয়াজ! ধরণী যেন চৌচির হয়ে যাচ্ছে, টুকরো টুকরো অযুত উপলখণ্ডে যেন পর্যবসিত হবে যে কোনো মুহূর্তে। বরফের টুকরো নয়—তাহলে পাথরখণ্ড ঠাণ্ডা হত—বনজঙ্গলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠত না। তপ্ত গনগনে উল্কাখণ্ড জ্বলতে জ্বলতে নেমে এসে ছারখার করে দিচ্ছে সবুজ পৃথিবীটাকে—এ দৃশ্য দেখে যখন মন আমার অবসন্ন, ঠিক সেই সময়ে পরমোল্লাসে কানের কাছে প্রফেসর শোনালেন বুক অফ এক্সোডাসের উদ্ধৃতি—যার অর্থ, মহাপ্রলয়ের সেই দিনটাতেও গরম পাথরবৃষ্টি হয়েছিল আকাশ থেকে এমনিভাবে—যেমনটি দেখছি, শুনছি, ঠিক সেইভাবেই অগ্নিবেষ্টিত প্রস্তরখণ্ড আকাশ রাঙা করে লক্ষ বজ্র-হুংকার আর বিস্ফোরণের সমতুল্য কানের পর্দা ফাটানো আওয়াজে মুহুর্মুহু দুরমুশ পেটা করে গিয়েছিল মর্ত্যলোককে। মেদিনীজোড়া হাহাকারে সেদিনও ছায়াপথ ত্রস্ত চকিত ভয়ার্ত হয়েছিল যেমনভাবে—আজ, এই মুহূর্তে, হচ্ছি আমরা।

আমি দেখলাম পুরুষেরা মন্দিরে মন্দিরে ভজনা করছে ধ্বংসের দেবতার। নির্দেশ দিচ্ছে জনসাধারণকে গরুছাগল মোষদের গিরিকন্দরে নিয়ে যেতে। প্রলয়ের দেবতার রোষানল থেকে বাঁচতে যদি চাও—পালাও! পালাও! শহর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে, পালাও পাহাড় পর্বতের আশ্রয়ে—আগে মাথা বাঁচাও—তাহলেই প্রাণে বাঁচবে মুষলধারে প্রস্তর বৃষ্টির খপ্পর থেকে।

ভয়ার্ত মানুষরা তাই আগে নিজেদের মাথাই বাঁচাচ্ছে—গৃহপালিত পশুরা উন্মাদের মত ছুটোছুটি করছে ক্ষেতে খামারে মাঠে ময়দানে প্রান্তরে তেপান্তরে। মানুষ ছুটছে নিরাপদে আশ্রয়ের সন্ধানে। মাথার ওপর বাজছে প্রলয় বিষাণ কর্ণবধিরকারী বিস্ফোরণ আর বজ্র গর্জনের শব্দে—মাটি কাঁপছে থর থর করে। মুহুর্মুহু প্রস্তর সংঘাতে মাটিতে মিশে যাচ্ছে দেবালয়, ইমারত, শহর, গ্রাম। চাপা পড়ছে যারা, তাদের দিকে কেউ আর ফিরেও তাকাচ্ছে না। মর্মান্তিক সেই দৃশ্যের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে জল এসে গেল আমার। আমি জানি, এ দৃশ্য এখন ঘটলেও, ঘটেছে অতীতে। যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানের মানুষ যা কোনোদিনই বিশ্বাস করে উঠতে পারবে না, আমি তাই দেখছি দু-চোখ প্লাবিত করে। ব্যথায় টনটন করছে বুকের ভেতরটা পূর্বপুরুষদের অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে।

গাছ নেই, ফল নেই, ফুল নেই, শস্য নেই, পানীয় নেই—আগুন জ্বলছে সবুজ পৃথিবীর সর্বত্র—না, না, সবুজ নয়—এ তো লাল পৃথিবী! রক্তলাল তৃতীয় গ্রহে প্রলয় দেবতার উন্মাদ নাচন প্রত্যক্ষ করছি আর হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি কেন হিন্দুশাস্ত্রে মহাদেবকে ধ্বংসের দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে, কেন তাঁর ডমরু ধ্বনিকে প্রলয়-বাদ্য বলা হয়েছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আমি তো দেখছি সেই ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি-চক্ষু মহাকালাধিপতিরই রুদ্র মূর্তি—ঐ আগুন, ঐ ছাই, ঐ ভীষণ আওয়াজ—সবই তো রুদ্র দেবতারই কল্পনার সহায়ক।

এ হেন ম্রিয়মান মানসিক অবস্থার সময়ে অত্যন্ত বিরক্তিকর লাগছিল প্রফেসরের জ্ঞানের ফুলকিগুলো। বৌদ্ধ পুঁথিতে নাকি তিনি পৌরাণিক এই প্রলয় কাহিনী কোনকালে পাঠ করেছেন। ম্যানিলার বিজ্ঞান সভায় পৌরাণিক এবং লোককথার অন্বেষণ করলে পৃথিবীর বিস্মৃত ইতিহাসের সন্ধান মিলবে—এই বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপহাসিত হয়েছিলেন। কেমন? এখন কি দেখছে আহাম্মকরা? যদিও ধারে কাছে কোনো আহাম্মকের টিকি দর্শনের সম্ভাবনা নেই—কিন্তু ও'র তা খেয়ালও নেই। আত্মবিস্মৃত হয়ে চিৎকার করে যা বলে চলেছেন, তার সংক্ষিপ্তসার হল, 'বিশুদ্ধিমাগ্গ'তে বহু পূর্বেই লিখে গেছে বিশ্বচক্রের বিশদ বিবরণ। বিশ্বচক্রের সমাপ্তি সূচিত হবে ভীষণ ঝঞ্ঝায়,···আসবে ধ্বংসকারী বিপুল মেঘরাশি···প্রথমে বর্ষিত

হবে মিহি ধুলো, তারপর মোটাধুলো, তারপর মিহি বালি, তারপর মোটা বালি, তারপর নুড়ি, পাথর, পাহাড়…ভেঙে চুরমার করে দেবে মহীরুহ আর পর্বতমালা। ওপর নিচ হবে ভূতল, ফুটিফাটা হবে ভূপৃষ্ঠ, ধূলিসাৎ হবে ভূগোলকের সমস্ত সৌধ…এ ঘটনা ঘটবে কখন ? না, যখন গ্রহের সঙ্গে লাগবে গ্রহের সংঘর্ষ ! শুধু পুঁথি কেন, মেক্সিকোর প্রাচীন রেড ইণ্ডিয়ান থেকে আরম্ভ করে সুপ্রাচীন হিব্রু আর ভারতবর্ষের আদি পুরুষরাও কল্পান্তের এই বিবরণ দিয়ে যাননি পুরাণ-লোককথার ছত্রে ছত্রে ?

কান যখন ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে প্রফেসরের অবিশ্রান্ত বাক্যের উৎপাতে, ঠিক তখনি শুরু হল আর একটা বিপর্যয়। একেবারেই অভাবনীয় এবং ভয়ংকর।

সারা পৃথিবী তখন জ্বলছে দাউ দাউ করে। হেথায় হোথায় স্তিমিত-প্রায় অগ্নিকুণ্ডের ওপর ধোঁয়া উঠছে ঘন মেঘের আকারে ছাই আর তপ্ত পাথরের ওপর থেকে। এমন সময় শুরু হ'ল নতুন উৎপাত।

অবিশ্বাস্য সেই উৎপাত-প্রসঙ্গের প্রারম্ভে টীকা স্বরূপ একটু বক্তব্য সেরে নেওয়া যাক। এই জ্ঞান-স্ফুলিঙ্গটাও প্রফেসরের—আমি কেবল অনুলেখক।

ক্রুড পেট্রোলিয়ামের উপাদান দুটি, কার্বন আর হাইড্রোজেন। পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত মূল দুটি তত্ত্ব এই ঃ

অজৈব তত্ত্ব ঃ পৃথিবীর পাথুরে স্তরে হাইড্রোজেন এবং কার্বন মিলিত হয়েছিল প্রচণ্ড চাপ এবং তাপের ফলে।

জৈব তত্ত্ব ঃ উদ্ভিদ আর প্রাণীর দেহাবশেষ থেকেই এসেছে পেট্রোলিয়ামের উপাদান কার্বন আর হাইড্রোজেন। মূলতঃ এই দেহাবশেষ আণুবীক্ষণিক সামুদ্রিক প্রাণীর এবং জলাভূমির প্রাণীর।

ধুলো, ছাই এবং পাথরবৃষ্টির পরেই আচমকা চটচটে আঠার মত তরল পদার্থ পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসতেই বিমূঢ় হয়েছিলাম আমি। তারপরেই যখন দেখলাম, পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়ার আগেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সেই কালো আঠালো তরল পদার্থ—তখন দু'হাতে প্রফেসরের হাত খামচে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম সভয়ে—"ওকী ! ওকী ! ওকী !"

বরাভয় দিয়ে প্রফেসর বলেছিলেন—"মাভৈঃ, বৎস ! যা দেখছো, তা এই পৃথিবীর পেট্রল উৎসের আসল ইতিহাস।"

"পেট্রল !"

"হ্যাঁ, পেট্রল ! যার ওপর বেঁচে রয়েছে বিংশশতাব্দীর সভ্যতা—সেই পেট্রল। যে পেট্রোলিয়াম ছাড়া প্লেন উড়বে না, গাড়ী চলবে না, অনেক ওষুধপত্র তৈরী হবে না, বহু শিল্প সামগ্রীর উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে—সেই পেট্রোলিয়াম।"

"ধূমকেতু থেকে !"

"কেন নয় ?" বলে প্রথমে টীকা স্বরূপ যে বক্তব্যটি ইতিপূর্বে লিখেছি সেইটি আমার কর্ণকুহরে বর্ষণ করলেন প্রফেসর। অতঃপর বললেন—"ধূমকেতুর ল্যাজেও তো প্রধানতঃ কার্বন আর হাইড্রোজেন গ্যাস থাকে।"

"অ।"

"মানে, জানো না থাকে কি না। থাকে হে, থাকে। আমি বলছি থাকে। কিন্তু প্রশ্ন করতে পারো উজবুকের মত, তাহলে কেন উড়তে উড়তে ধূমকেতুর ল্যাজে পেট্রোলিয়ামের আগুন জ্বলে না ? কেন জ্বলে না বলো তো ?"

"তা তো—"

"জানো না। ঘটে বুদ্ধি থাকলে তো জানবে। একেবারেই আকাট—যাকগে, যা বলছিলাম। অক্সিজেন ছাড়া কি কিছু পোড়ে ? পোড়ে না। ধূমকেতুর ল্যাজেও তাই আগুন দেখা যায় না। কিন্তু গ্যাস দুটো তো দাহ্য ? কেমন ? তাই পৃথিবীর অক্সিজেন ঠাসা আবহমণ্ডলে যেই ঢুকেছে ল্যাজখানা, অমনি তাতে আগুন ধরে গেছে। কার্বন আর হাইড্রোজেন আলাদা আলাদাভাবে আর মিলিতভাবে বিপুল পরিমাণে অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসতেই ঐ দ্যাখো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে···দেখছো তো ? অক্সিজেন যতক্ষণ থাকছে, ততক্ষণ জ্বলছে—কিন্তু যেই সমস্ত অক্সিজেনটুকু শেষ করে দিচ্ছে, তখন আর জ্বলতে পারছে না। চক্ষের নিমেষে রূপান্তর ঘটছে—গ্যাস থেকে তরল হয়ে যাচ্ছে ! কোথায় যাচ্ছে এই তরল পদার্থ দেখতে চাও ? এসো দেখাচ্ছি।"

বলে হাহাকার, আর্তনাদ, বজ্রগর্জন আর হুতাশনের হুংকার-শ্বাসের মধ্যে দিয়ে টাইম-মেশিনকে স্পেশশিপের মত চালনা করেছিলেন প্রফেসর। আমি দেখলাম, আগে থেকেই চৌচির হয়ে যাওয়া ভূপৃষ্ঠের ফাঁক দিয়ে, বালির মধ্যে দিয়ে, পাথরের ফাটলের মধ্যে দিয়ে চটচটে তরল পদার্থটি

সেঁধিয়ে যাচ্ছে পাতালের জঠরে। জলে যখন পড়ছে, তা ভেসে রয়েছে—সমুদ্রপৃষ্ঠে, নদীপৃষ্ঠে, সরোবরপৃষ্ঠে ঢেকে যাচ্ছে কালো তরল পদার্থে—কিন্তু যেই নতুন অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসছে, আগুনের ছোঁয়া পাচ্ছে আকাশ থেকে স্ফুলিঙ্গের বর্ষণে—অমনি জ্বলে উঠছে দাউ দাউ করে। ধুলো মাখিয়ে, পিটিয়ে এবার যেন রুদ্রদেবতা মেদিনীকে পেট্রোলিয়ামে স্নান করিয়ে বলি দিচ্ছেন অগ্নিদেবতার জঠরে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে সারা পৃথিবী। ধোঁয়া! ধোঁয়া! শুধুই ধোঁয়া! তারই মধ্যে থেকে লক্ লক্ করে উঠছে দানবিক সর্প-জিহ্বার মত লেলিহান শিখা!

আচ্ছন্ন কণ্ঠে বলেছিলাম—"পেট্রোলিয়ামের আবির্ভাব তাহলে আকাশ থেকে?"

সংশোধন করে দিয়ে এক দাবড়ানি দিয়েছিলেন প্রফেসর—"শুধু আকাশ থেকে নয়—বলো, ধূমকেতুর ল্যাজ থেকে। পৃথিবীর যে কোনো দেশের প্রাচীন পুঁথিপুরাণ ঘাঁটলেই পাবে এই উপাখ্যান। মায়া-রা যা লিখে গেছে, তা কি দেখতে পাচ্ছো না? অন্ধ তো নয়। ঐ তো ধুলো আর পাথরবৃষ্টির পরেও যারা বেঁচে গেছে, এবার তারা ডুবে মরছে চটচটে তরল পদার্থে। না, না, ওদের বাঁচানোর ক্ষমতা তোমার আমার কারোরই নেই। যা দেখছো, সবই তো অতীতের দৃশ্য—তুমি তো অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশনের মধ্যে আছো বলেই রেহাই পেয়ে যাচ্ছো—দেখছো না তোমাকে ফুঁড়ে নেমে যাচ্ছে কালো স্রোত—তুমি, আমি, টাইম-মেশিন কিন্তু রয়েছি বহাল তবিয়তে। কিন্তু চোখ মেলে দ্যাখো হে অন্ধ, আকাশ কালো হয়ে গেছে তরল বৃষ্টিতে, ঘড়ির দিকে একটু নজর দাও না হে ছোকরা। ঐ দ্যাখো, দিন পেরিয়ে যাচ্ছে। রাত ভোর হয়ে যাচ্ছে—কালো বৃষ্টির কিন্তু বিরাম নেই। ঝমাঝম ঝম ঝমাঝম ঝম পেট্রোলিয়াম বৃষ্টি চলেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। মানুষ আর নেই—সব শেষ! সব শেষ!"

নির্নিমেষে আমি দেখছিলাম পূর্বপুরুষদের অসহায় মৃত্যুদৃশ্য। উন্মাদের মত ছুটছে যে যেদিকে পারে—বাড়ীর ছাদে ওঠবার চেষ্টা করছে কালো বন্যার কবল থেকে পরিত্রাণের আশায়, কিন্তু বাড়ী ভেঙে পড়ছে; গাছে উঠে বাঁচতে চাইছে—ঝড় আর তুমুল বৃষ্টির ধাক্কায় ঠিকরে যাচ্ছে অনেক দূরে; পাহাড়ের গুহায় আর খাঁজে যারা ঢুকছে, জীবন্ত চিঁড়ে

চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে আচমকা রন্ধ্রপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। সত্যিই মানুষ আর বেঁচে নেই কোথাও—সব শেষ! সব শেষ!

প্রফুল্ল কণ্ঠে কিন্তু প্রফেসর বলে চলেছেন তখন—"বিটুমেন বৃষ্টির এই বর্ণনা তুমি 'ম্যানুসক্রিপ্ট কুইচি'তেও পাবে। মেক্সিকো জনশূন্য হয়ে গেছিল এই কাণ্ডের পর। সাইবেরিয়া, ঈস্টইণ্ডিজ, মিশর—কেউ রেহাই পায়নি—সব জায়গার পুরাণেই লেখা আছে একই ভয়ংকর কম্পান্তের বিবরণ! শুনছো হে ছোকরা? মিদ্রাশিম কেতাব পড়া আছে? নেই? উত্তম! পাতাগুলো উল্টে দেখো, আমার লাইব্রেরীতে আছে। দেখবে লেখা আছে কিভাবে ন্যাপথা বৃষ্টি হয়েছিল মিশরে, গায়ে ফোস্কা পড়ে গেছিল গরম ন্যাপথায়। আরেমেইক আর হিব্রুতে ন্যাপথা মানে কি জানো? পেট্রোলিয়াম! পেট্রোলিয়াম।"

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল সময়-গাড়ীতে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে দেখলাম সেই একই দৃশ্য। দাহ্য পদার্থের প্লাবন বয়ে গেল ধরাপৃষ্ঠে। বাদ গেল না সমুদ্রপৃষ্ঠও। জমি টেনে নিল বেশীর ভাগ অংশ। আবার তাতে আগুন ধরল। আবার···আবার···এইভাবেই লঙ্কাকাণ্ড চলল পৃথিবী জুড়ে সাত-সাতটা বছর, সাতটা শীত, সাতটা গ্রীষ্ম, সাতটা বর্ষা অতিবাহিত হ'ল—গোটা পৃথিবীটা পুড়ে ছারখার হয়ে গেল এই ক'টা বছরে।

সাত বছরের হিসেব কিন্তু কাগজে কলমে আর ঘড়িতে—সময়-গাড়ীর বুকে বসে আমরা এই দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এলাম হু-হু করে। কানের কাছে ইতাবসরে ফিস্‌ফিস্ করে বাগ-বৈদগ্ধের নমুনা রেখে গেলেন নাট-বল্টু-চক্র মহাশয়—"সাইবেরিয়ান মিথলজির ৩৬৯ পৃষ্ঠায় ঠিক এই ঘটনাই লেখা আছে, দীননাথ। সাত-সাতটা বছর পৃথিবীকে পুড়িয়েছিল দাবানল।"

জীবন্ত বিশ্বকোষ নাকি? পৃষ্ঠা সংখ্যা পর্যন্ত মনে রেখে দিয়েছেন?

আরব মরুভূমির ওপর দেখলাম ভয়াবহ এক দৃশ্য। মরুভূমির মধ্যে বিচরণ করছে পলাতক ইহুদীরা। ঘরছাড়া দিকহারা বাউণ্ডুলের দল! কিন্তু পেছনের বিপদ থেকে পলায়ন করেও কি পরিত্রাণ আছে? বিপদ যে সামনেও। মাঝে মধ্যেই রহস্যময় অগ্নিশিখা ধরণী বিদীর্ণ করে আবির্ভূত হচ্ছে সামনে! লকলকিয়ে উঠছে মেঘলোক পর্যন্ত—পরমুহূর্তেই অদৃশ্য

হয়ে যাচ্ছে ছাইটুকুও ফেলে না রেখে! এ কোন্ আগন্তুক অগ্নিদেবতা? অগ্নিদেবের এহেন রূপের সঙ্গে তো পরিচিত নয় ইজরাইলবাসীরা! আগুন-টাও যেন কেমনতর। এই আসে, এই যায়।

একজায়গায় দেখলাম কয়েক-শ ইহুদী চলেছে দল বেঁধে। আচমকা পায়ের তলার মাটি মুখ ব্যাদান করল যেন—বিরাট ফাটলের মধ্যে মুহূর্তে বিলীন হল দলটার বেশীর ভাগ—বাকী ক'জন সঙ্গীদের মরণ-চিৎকার শুনে দৌড়ে এল ফাটলের চারধারে। দেবতার তুষ্টি সাধন দরকার নিশ্চয়। নইলে এমন অভাবনীয় বিপর্যয় ঘটবে কেন? দলপতি তাই ধূপ জ্বালিয়ে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল ফাটলের ওপর। পলকের মধ্যে প্রলয়ংকর বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল লেলিহান আগুন। আড়াইশ' জন ইজরাইলবাসী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ঐ একটা বিস্ফোরণে!

বেচারা! বোবা শোকে নিথর হয়ে রইলাম আমি। ওরা তো এই রহস্যময় আগুনের চরিত্র জানে না। এ যে দাহ্য গ্যাসের আগুন—তা তো জানে না। কোনোদিন এমন অদ্ভুত আগুন দেখেনি। ভূগর্ভ থেকে ভস্ ভস্ করে গ্যাস বেরিয়ে আসছে, তা জানে না বলেই তো ধূপ জ্বালিয়ে বাড়িয়ে ধরেছিল। পরিণামে ঐ বিস্ফোরণ!

ককেশিয়া, সাইবেরিয়া, আরবে দেখলাম রহস্যময় আগুনের মুহুর্মুহু আনাগোনা। যে-যে দেশে এইভাবে ঘটতে দেখলাম অঝোরধারা আগুন-বৃষ্টি, আজকের পৃথিবীতে কিন্তু ঠিক সেই-সেই জায়গাতেই পাওয়া গেছে পেট্রোলিয়ামের বিপুল সঞ্চয়ঃ মেক্সিকো, ঈস্টইণ্ডিজ, সাইবেরিয়া, ইরাক আর মিশর আজ এই পৃথিবীর তেলের রাজা। পেট্রল দিয়ে তাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছে গোটা পৃথিবীটাকে। মানুষের আকাশে ওড়ার স্বপ্ন সম্ভব হয়েছে এই তেলের দৌলতেই, পবনবেগে মোটর গাড়ীতে ধেয়ে যাওয়াও সম্ভব হয়েছে শুধু তেলের কল্যাণে। যে-তেল সুদূর অতীতে আগুন-বৃষ্টির আকারে পড়েছিল ধূমকেতুর পুচ্ছ থেকে—লেশমাত্র কালো দাগ অথবা ছাই ফেলে না রেখে যার পুড়ে যাওয়া দেখে ভয়ে বিস্ময়ে পুরাকালের মানুষ দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করতে শিখেছিল তাকে। তারপর একদিন বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছিল মূল্যবান এই তেলের ব্যবহার। ধূমকেতুর অবদান জঠরে আগলে রেখে দিয়েছিল ধরিত্রী দীর্ঘদিন। মানুষ আজ তার ব্যবহার শিখেছে, সভ্যতাকে কয়েক লাফ মেরে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে। একদিন যা

ছিল ধ্বংসদূত, আজ তা সভ্যতার ধ্বজাবাহক।

সজীব বিশ্বকোষটি ইত্যবসরে অনেক মূল্যবান তথ্যই বর্ষণ করে গেছিলেন কানের কাছে। একটা কথা এখনো মনে আছে। বলেছিলেন—"দীননাথ, লেখো তো ছাইপাঁশ, একটা কাজের কাজ কোরো ফিরে গিয়ে, উজবুক অবিশ্বাসীগুলোকে বলে দিও, ফারাও সিসোস্ট্রিসের মন্ত্রী অ্যাশ্টি-ফোকারের সমাধি মন্দিরটা যেন একটু দেখে আসে। আগুন লেগেছিল সেখানেও—পাতাল ঘরের আগুনের কালো দাগ সামান্যই আছে নিচের দিকে—ওপরের দিকে নয়। ছাইও নেই। কি করে থাকবে? হাল্কা গ্যাসের আগুন তো। তাদের বোলো, আরবের মরুভূমি আর মিশরের পাতাল সমাধি কক্ষে তেল ঢুকে গিয়েছিল বলেই আগুনের চিহ্ন এখনো দেখা যায় অ্যাশ্টিফোকারের সমাধি মন্দিরে। স্বচক্ষে তো দেখলেই কালো তেলের বান বয়ে গেল দেশগুলোর ওপর দিয়ে।"

তা আর দেখিনি! দেখে তাজ্জব হয়ে গেছি। অগ্নিউপাসকদের উৎপত্তি হ'ল কিভাবে, তাও বুঝতে আর বাকী নেই!

কিন্তু বিপর্যয়ের বাকী এখনো আছে। শুধু ধুলো, পাথর আর তৈল বর্ষণ করেই ক্ষ্যামা দেয়নি ধূমকেতুর পুচ্ছদেশ—নিবিড় আঁধারে আচমকা ঢেকে গেল গোটা পৃথিবীটা!

গম্ভীর কণ্ঠে কানের কাছে বলে উঠলেন প্রফেসর—"ল্যাজের আরো ভেতরে ঢুকে পড়েছে পৃথিবী—এগিয়ে যাচ্ছে তার দেহের দিকে।"

শুনে হাত-পা হিম হয়ে এল আমার। ল্যাজের ঝাপটাতেই এই কাণ্ড, মাথায় ধাক্কা লাগলে তো গোটা পৃথিবীটাই কক্ষচ্যুত হয়ে ছিটকে যাবে মহা-শূন্যে!

নিরন্ধ্র অন্ধকারে অকস্মাৎ জাগ্রত হ'ল মত্ত প্রভঞ্জনের হুংকার। দূরে, কাছে, সর্বত্রই ঝড় উঠেছে, আতীক্ষ্ম নিনাদে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে চাইছে, উন্মত্ত বেগে ধেয়ে চলেছে পৃথিবীর ওপর দিয়ে। গ্যাস, ধুলো আর ধূমকেতুর ভস্ম ভীমবেগে প্রদক্ষিণ করছে পৃথিবীকে। যেন হাজার হাজার দানো অমানবিক গলায় চেঁচিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর আকাশে।

একী ঝড়! ঝড়ের এমন চেহারা তো কখনো দেখিনি! ঝড়টাই বা

হঠাৎ এলো কেন ?

"পাল্টে গেল ! পাল্টে গেল ! পৃথিবীর আবর্তনের কৌণিক গতি-বেগ বদলে গেল !" দামাল হাওয়ার অট্ট-অট্ট হাসির ওপর গলা চড়িয়ে সোল্লাসে বললেন প্রফেসর। "হেলে পড়ছে পৃথিবী। আবর্তন একেবারে বন্ধ হয়নি—তাই সূর্যের মুখ আর চট করে দেখা যাচ্ছে না।"

আমরা তখন ইরানের ওপর। তিন দিন তিন রাত্রি সূর্যের মুখ দেখা গেল না সেখানে, আরও পশ্চিমে নামল ন-দিন ব্যাপী একটানা রজনী, চীন দেশে আর ভারতবর্ষে সূর্য অন্তর্হিত হল দীর্ঘ দশদিন ধরে। ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউফ্রেটিস আর সিন্ধুর অববাহিকায় এইভাবেই সূর্য উধাও হয়ে রইল দিনের পর দিন।

অবশেষে অবসান ঘটল কালরাত্রির। এলো ভূমিকম্প !

আমরা জানি পৃথিবীটা রয়েছে বাসুকির ফণার ওপর। সেই ভদ্রলোক মাথা নাড়ান বলেই মেদিনী প্রকম্পিত হয়—ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু আজ বুঝছি, এ সব কল্পনারই সৃষ্টি সেই দিনের সেই ভয়ংকর ঘটনা থেকে। দেশ বিদেশের পুরাণ কাহিনীতে এক কল্পের মহাপ্রলয়ান্তে অবসানের পর আর এক কল্পের শুরু হওয়ার বর্ণনারও উৎপত্তি ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতার পর থেকে। মানুষ মরেও মরে নি। ডাইনোসর লোপ পেয়েছে কেন, সে রহস্যও আর রহস্য নয় অন্ততঃ আমার কাছে। যে যাই বলুক, কিন্তু আমি যে স্বচক্ষে দেখে এসেছি সৃষ্টি ধ্বংসের প্রলয়ংকর দৃশ্য ! ডাই-নোসর, ম্যামথ সহ পুরাকালের বহু জীবই লোপ পেয়ে গেছে—বেঁচে গেছে মুষ্টিমেয় মানুষ—আবার ভরিয়ে তুলেছে পৃথিবীকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর গিয়ে চলছে কলি যুগ—কিন্তু এরও শেষ হবে মহাপ্রলয়ের মধ্যে দিয়ে—এই তো ভবিষ্যদ্বাণী মহাপুরুষদের। কিন্তু তার সূচনা ঘটবে কি নতুন এক ধূমকেতুর আবির্ভাবে ? কে জানে !

এখন যা জানি, যা দেখেছি, তা বলা যাক !

নিয়মিত গতিবেগের বাইরে গলা ধাক্কা খেতেই ধূমকেতুর মূলদেহের নিকট সান্নিধ্যে এসে নিমেষ মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল ভূগোলক। প্রচণ্ড কম্পনে দুমড়ে মুচড়ে তেউড়ে গেল পাথুরে স্তর—সারা ভূমণ্ডল জুড়ে ছড়িয়ে

পড়ল ভূমিকম্প। এক মিনিটের মধ্যেই ধূলিসাৎ হতে দেখলাম মিশরের উপরদিকের অংশ, পেল্লায় প্রস্তর সৌধগুলো ধরাশায়ী হল চক্ষের নিমেষে। কিন্তু মাটির বাড়ি, কুঁড়েঘর, নিচু ছাউনিগুলো টিঁকে গেল ভূমিকম্পের ধাক্কার পরেও। ইজরাইলে দেখলাম এই দৃশ্য। গ্রামপ্রধান ভারতবর্ষেও বাসুকির রোষে প্রাণাহুতি দিল সামান্য ব্যক্তি—যারা ছিল প্রস্তর সৌধে।

এদিকে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা, ওদিকে হারিকেন ঝড়ের প্রলয়নাচন। ধূমকেতুর পুচ্ছের সংঘাতে তোলপাড় হয়ে গেল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, কিছু বায়ু নিজের দিকে টেনে নিল ধূমকেতুর দেহ, সেইসঙ্গে মন্দীভূত হল পৃথিবীর আবর্তন বেগ—এইসবের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অকল্পনীয় হারিকেন ঝড়ের নাচন আরম্ভ হয়ে গেল পৃথিবীর ওপর। সমুদ্র উথলে উঠে আছড়ে পড়ল মহাদেশের ওপর! ভাসিয়ে দিল শহর, জঙ্গল, পর্বত। ফেটে উড়ে গেল আগ্নেয়গিরির পর আগ্নেয়গিরি। মানুষ মরল পিঁপড়ের মত, লোপ পেতে বসল বহু প্রাণীর অস্তিত্ব। পালটে গেল ভূগোলকের চেহারা। ধসে পড়ল পাহাড়, ধেয়ে আসা মহাসমুদ্রের তলদেশ থেকে উঠে এল মহা-পর্বত। শুকিয়ে গেল নদীর খাত। দামাল টর্নাডো আকাশ থেকে নেমে এসে ধেয়ে গেল ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে।

"ওহে ছোকরা, বেদ পড়েছো, বেদ? পারসীকদের আবেস্তা?"

"অ্যাঁ?" সম্বিৎ ফিরল প্রফেসরের তারস্বরে।

"পড়ে দেখো, কল্পকাহিনী বলে উড়িয়ে দিতে আর পারবে না। এ সমস্তর বর্ণনা পাবে সেখানে। গিলগামেশ মহাকাব্যে আছে হে, সব আছে।"

ধুত্তোর গিলগামেশ! আমার তখন মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে ঝড় ভূমিকম্পের দাপটের সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্লাবনের আবির্ভাব দেখে।

সূর্য আর চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা খেলে যায়, এ তো সবারই জানা। কিন্তু যে ধূমকেতুর মাথা চাঁদের চেয়ে বড় এবং পৃথিবীর কাছাকাছি, তার আকর্ষণ তো প্রবলতর হবেই। তাই সমুদ্রের জল ফুলে উঠল কয়েক মাইল উচ্চতায়; একই সঙ্গে পৃথিবীর আবর্তন মন্থর হতেই মাইল কয়েক উঁচু জলরাশি ধেয়ে গেল সুমেরু কুমেরুর দিকে—পৃথিবীর অন্যান্য প্রতিবেশীদের আকর্ষণে মন্দীভূত হল প্লাবনের বেগ। বিরাট বিরাট পাথর ভেসে গেল জলের তোড়ে—ভাসিয়ে দিল গোটা এশিয়া, জলের

পাহাড় আছড়ে পড়ল চীন সাম্রাজ্যের ঠিক মাঝখানে। জল আটকে গেল উপত্যকায়—ডুবে গেল স্থলভূমি। দেশে দেশে দেখা গেল বিপুল জল-স্তম্ভ। ভূমধ্যসাগর আছড়ে পড়ল লোহিতসাগরে। দু-ভাগ হয়ে যাওয়া সমুদ্রপথে দাসত্বের বন্ধন মোচন করে পলায়ন করল ইজরাইলবাসীরা—কিন্তু পেছন পেছন ধাওয়া করার সময়ে খাড়াই সমুদ্রের প্রাচীর ভয়াবহ গর্জনে আছড়ে পড়ল তাদের ওপর। বারো জায়গায় সমুদ্র দু-ফাঁক হয়ে গিয়ে পথ করে দিল ইহুদিদের—সেইপথে তারা এসে উঠল আমেরিকায়। আজও সেই বিশ্বাস রয়ে গেছে রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে।

আমি দেখলাম, বিপুল জলরাশির সঙ্গে হাল্কা সোলার মত বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই ভেসে যাচ্ছে দিকে দিকে। বিশেষ করে উত্তর দিকে বিপুলের ওজনের পাথরগুলো ঠিকরে গিয়ে আশ্রয় নিল এখানে সেখানে—ছত্রাকান অবস্থায়। বুঝলাম, কেন বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকরা হতভম্ব হয়ে যা ডোলরাইটের উচ্চ অঞ্চলে গ্র্যানাইটের স্তূপ দেখে, কেন স্থানীয় পাথরের মধ্যে উড়ে এসে-জুড়ে-বসা মনে হয় বহু শিলাস্তূপকে, কেন বীরভূমের মামা-ভাগ্নে পাহাড়ের গ্র্যানাইট স্তূপের ধারে কাছেও গ্র্যানাইট দেখা যায় না। ঠিক যেন আকাশ থেকে বড় বড় গোলাকার পাথর টপটাপ খসিয়ে ওপর ওপর ফেলে রেখেছে কেউ। পৃথিবীর নানান জায়গায় দানবিক উপলখণ্ডগুলি ওজনে দশ হাজার টন পর্যন্ত, যা কিনা একলক্ষ তিরিশ হাজার মানুষের সমান! ওয়েলস্ আর ইয়র্কশায়ারের চুনা পাথরের স্তরের ওপর জমা হতে দেখলাম গ্র্যানাইটের গোল চাঁই। সামুদ্রিক প্রাণীরা প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেল ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে হিমালয় পর্বতে, কালো মহাদেশ আফ্রিকার তৃণভূমি, মরুভূমি, অরণ্যের ওপর দিয়ে ঊর্ধ্ব অঞ্চলে!

মুহ্যমানের মত আমি দেখলাম ভয়াবহ সেই দৃশ্য এবং শিহরিত হলাম। ধূমকেতুর মাথা তো এখনো স্পর্শ করেনি পৃথিবীকে—তাইতেই এই প্রলয়!

শুরুতেই বলেছিলাম, আমার এই প্রলয়-বর্ণনায় কিন্তু কিছু উল্টোপাল্টা ব্যাপার থেকে যাবে, ঘটনা পরম্পরা রাখতে পারব না। যেমন ধরো, একটু আগেই বললাম, মাইল কয়েক উঁচু মহাসমুদ্র আচমকা আছড়ে পড়েছিল ইহুদী অনুসরণকারীদের ওপর। কিন্তু কেন পড়েছিল, তা বলা হয় নি! ভূগোলক জুড়ে চাঁকপাক দিতে দিতে সব জায়গা থেকেই দেখেছিলাম এক

অদ্ভুত আকাশযুদ্ধ। যেন, আলোর দেবতার সঙ্গে বজ্র বিনিময় চলছে সরীসৃপদানবের। সূর্যের কাছ দিয়ে আসার সময়ে দ্যুতিময় হয়ে উঠেছিল ধূমকেতুর মাথা। পৃথিবীর টানে পুচ্ছদেশ চলে এসেছিল মাথার কাছে কাস্তের আকারে—আবহমণ্ডলের মধ্যে থাকায় সহসা বিদ্যুৎশক্তির বিনিময় ঘটল পুচ্ছ আর মস্তকের মধ্যে—পর-পর দু-বার। প্রথমবারে আরও কাছাকাছি এসেই দ্বিতীয়বারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছিটকে গেল মাথা আর ল্যাজ। সেইসঙ্গে আর এক পশলা উল্কাবর্ষণ ঘটল পৃথিবীর ওপরে—তড়িৎ-শক্তি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে, তীব্র ফ্ল্যাশে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মাইল কয়েক উঁচু জলস্তম্ভ ভেঙে পড়ল সগর্জনে। তড়িৎ সঞ্চার নিষ্প্রভ হল ধূমকেতুর মাথায়, ল্যাজের গুঁড়ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল মহাশূন্যে। পৃথিবীর আকর্ষণে কিন্তু নিজের কক্ষপথ থেকে সরে এসে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলল ধূমকেতু। ঘন মেঘে আকাশ ঢাকা থাকায় দেখা গেল না তার ম্রিয়মান মাথা। ছ-দিন এইভাবে কাছাকাছি ছুটে চলার পর দূরে সরে গেল—ছ-হপ্তা পর আবার এল কাছাকাছি। সারা পৃথিবী জুড়ে তখন সব কটা আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয়ে গেছে। ধুলো, ধোঁয়া মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন। তাই সুস্পষ্ট দেখা গেল না আবার তড়িৎশক্তি বিনিময় ঘটল ফ্ল্যাশের আকারে পুচ্ছদেশ আর মস্তকদেশের মধ্যে। এবার কিন্তু ঐ ধাক্কাতেই পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল ধূমকেতু—বিচ্ছিন্ন হল সহাবস্থান।

গুরুগম্ভীর বজ্রনাদে কানে তালা ধরার উপক্রম হয়েছিল। তার মাঝেই শুনলাম প্রফেসরের উন্মত্ত চিৎকার—"দেখলে দীননাথ, দেখলে? ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিল ১৭৬৭ সালে। লেক্সেল ধূমকেতুকে আটকে রেখেছিল বৃহস্পতি আর তার চাঁদেরা—বেচারা ছাড়া পায় ১৭৭৯ সালে। কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জ তখন দেখা যায়নি—আধুনিক যুগে কেউ দেখেনি—দেখলাম আমরা। কি নাম জানো আজকের এই ধূমকেতুর?"

"না," বললাম রুদ্ধকণ্ঠে।

"টাইফন! টাইফন! টাইফন!"

পৃথিবী তখন গোঙাচ্ছে। অদ্ভুত ভয়াবহ সেই গোঙানির ওপর গলা চড়িয়ে টাইফন-টাইফন করে চেঁচাতে লাগলেন প্রফেসর। আমি কিন্তু ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম পৃথিবীর আর্তনাদ শুনে। এ কিসের আওয়াজ? পৃথিবী

যেন অসীম যন্ত্রণায় দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, কাৎরাচ্ছে, কাঁদছে ! কেন ? কোত্থেকে আসছে এই রক্তহিম করা শব্দ ?

কান খাড়া করে আওয়াজটা শুনছিলেন প্রফেসর। আমার মুখ চোখের অবস্থা দেখে এমন একটা মুচকি হাসি হাসলেন যে ঐ অবস্থাতেও গা জ্বলে গেল আমার। তেড়িমেড়ি করে বসতাম, তার আগেই উনি রহস্যতরল কণ্ঠে কেবল বললেন—"থিওগানি !"

"সেটা আবার কী ?" ঢোঁক গিলে বললাম আমি।

"ভগবানের স্বস্তির নিঃশ্বাস—পুরাকালের মানুষরা অন্ততঃ তাই বলত।"

"চুলোয় যাক পুরাকালের মানুষ। আপনি কি বলেন তাই শুনি।"

"১৮৮৩ সালে ঈস্ট ইণ্ডিজের ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের আওয়াজ পেঁছেছিল তিন হাজার মাইল দূরে জাপানে, জানো তো ?"

"আজ্ঞে না। কিন্তু তার সঙ্গে পৃথিবীর গোঙানির—"

"দূর বোকা, পৃথিবী গোঙাবে কেন ?" সস্নেহে বললেন প্রফেসর। "সারা পৃথিবী জুড়ে আগ্নেয়গিরিগুলো একসঙ্গে বমি করতে আরম্ভ করলে বিচ্ছিরি আওয়াজ তো হবেই ! হাজার হাজার আগ্নেয়গিরি একসঙ্গে গ্যাস ছাড়ছে, বাষ্প ওগড়াচ্ছে, লাভা বমি করছে, পাথর ছুঁড়ছে। এক ক্রাকাতোয়ার আওয়াজ যদি তিন হাজার মাইল পর্যন্ত যেতে পারে, হাজার ক্রাকোতোয়ার আওয়াজ তো এই রকমই হবে। হাজার নাক দিয়ে পৃথিবীর নিঃশ্বাস ফেলা আর নাক ঝাড়ার আওয়াজও বলতে পারো।"

আহা, কি রসিকতা ! ভয়াবহ এই গর্জনের সঙ্গে নাক ঝাড়ার উপমা মাথায় আসে কি করে ভেবে পেলাম না। সাহিত্যিক উনিও নন, আমিও নই। কিন্তু এহেন উদ্ভট উপমা ঐ রকম একটা লোমহর্ষক পরিস্থিতিতে আমার মাথাতেও আসতো না।

হঠাৎ ঘটাংঘট করে কলকব্জা টিপতে লাগলেন প্রফেসর।

অবাক হয়ে বললাম—"কি করছেন ?"

"টাইম-মেশিন দাঁড় করাচ্ছি।"

"কেন ? কেন ?" আঁৎকে উঠলাম আমি। "মরবার সাধ হয়েছে নাকি ?"

"পাগল নাকি ! এখনও কত কাজ বাকী জানো ?"

"তবে থামাচ্ছেন কেন ?"

"কাঁহাতক আর ছুটোছুটি করা যায়। একটু ভাল করে দেখা যাক।"

"না, না, না, !"

কথা ফুরোলো না। ঝাঁকুনি মেরে দাঁড়িয়ে গেল টাইম-মেশিন। ডিগবাজী খেল না—ছিটকেও ফেলে দিল না। ফ্লাই-হুইল কিন্তু ঘুরতে লাগল আস্তে আস্তে।

আকাশ জোড়া ঘনঘটা আরও ভাল করে দেখা গেল এবার। অদ্ভুত কালো মেঘ যেন মাটির কাছে নেমে এসেছে। ভয় হল মাথার ওপর ঝুপ করে পড়ে যাবে না তো? টাইম-মেশিন কিন্তু স্থির নেই। কাঁপছে থর থর করে। সারা পৃথিবী তো কাঁপছে হাজার আগ্নেয়গিরির আগুন বমির ঠেলায়। পৃথিবীর আর্তনাদে আকাশ বাতাস ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে। মত্ত প্রভঞ্জনের সঙ্গে লক্ষ বংশী ধ্বনি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাজার হাজার বিস্ফোরণের বিরামবিহীন আওয়াজ। সব মিলিয়ে এমনই একটা ভয়াবহ ঐকতান যে শোনা মাত্র লোমখাড়া হয়ে যায়।

সভয়ে প্রফেসরের হাত আঁকড়ে ধরলাম—"আর না, আর না—"

অদ্ভুত চোখে দিগন্তের পানে চেয়েছিলেন প্রফেসর। বললেন অন্যমনস্ক সুরে—'অটোমেটিক রিটার্ণ চালু আছে—তিন মিনিট ধৈর্য ধরো।"

"তিন মিনিট!" তিন সেকেণ্ডও থাকবার ইচ্ছে তখন আমার নেই। কিন্তু প্রফেসর একদৃষ্টে অমন ভাবে কি দেখছেন?

দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, আমরা নেমেছি একটা ধু ধু মরুভূমির মধ্যে। দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা তেকোনা পাহাড়। না, না, পাহাড় নয়—পিরামিড। বিদঘুটে স্ফিংক্স মূর্তিও দেখলাম একটা—ওৎ বসে যেন জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছে আমাদের দিকেই। কিন্তু প্রফেসর এ সবের ওপর দিয়ে চেয়ে আছেন দূর দিগন্তের যেদিকে—সে দিকে সূর্য উঠছে ঘন কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে।

চোখ দুটো কুঁচকে গেল প্রফেসরের। তোবড়ানো গাল নেড়ে কি যেন বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন।

উদ্বিগ্ন হলাম। শুধোলাম—"কি হয়েছে প্রফেসর?"

ঠিক এই সময়ে ঝাঁকুনি দিয়ে প্রায় উল্টে পড়তে পড়তে অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশনে ফিরে গেল টাইম-মেশিন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম—

"যাক বাবা, বাঁচা গেল। অটোমেটিক রিটার্ণ চালু আছে।"

"তুমি কি ভেবেছিলে চালু নেই ?" বলে কণ্ট্রোল প্যানেলের যন্ত্রপাতিতে হাত দিলেন প্রফেসর। চোখ রইল কিন্তু সূর্যোদয়ের দিকে। বৃদ্ধি পেল সময় গতির। দিগন্ত ছাড়িয়ে সূর্য বিদ্যুৎ বেগে মাথার ওপর দিয়ে অস্ত গেল অপর দিকে। পরমুহূর্তেই আবার সূর্যোদয়, দিবাবসান, সূর্যাস্ত। তারপরেই ঘটল অঘটন।

লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটে গেল আকাশে বাতাসে। গোটা ভূমণ্ডলটা কেঁপে উঠল ভয়ংকরভাবে। দামাল হাওয়ায় বালির ঝড় বয়ে গেল মরুভূমির ওপর দিয়ে। অন্ধকারে ঢেকে গেল চারিদিক।

পরক্ষণেই অপসৃত হল তমিস্রা। সূর্য উঠে এল যেদিকে অস্ত গেছিল, সেদিক দিয়েই !

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলাম না। এই তো পশ্চিমে ডুব দিল সূর্য—আবার পশ্চিমেই উঠে এল !

প্রফেসর কিন্তু নির্নিমেষে চেয়ে আছেন ধাবমান সূর্যের দিকে। বিদ্যুৎ বেগে আকাশে জ্বলন্ত রেখা টেনে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য অস্ত গিয়েই আবার উঠে এল…আবার…আবার…বার বার…কিন্তু এবার আর উদ্ভট ব্যাপারটা ঘটতে দেখলাম না। অবিরাম রইল উদয় আর অস্ত পরম্পরা স্ব-স্ব দিগন্তে।

গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে প্রফেসর বললেন—"এখন যদি বলি ম্যানিলার মূর্খ বৈজ্ঞানিকগুলোকে যে, হেরোডোটাস তাঁর ইতিহাসে যা লিখেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, তাও ওরা বিশ্বাস করবে না। এমনই পাঁঠার দল।"

কি বলতে চান প্রফেসর? আমতা আমতা করে বলেই ফেললাম—"কিসের ইতিহাস প্রফেসর ?"

"ঈজিপ্টের পুরুতদের সঙ্গে কথা বলার ইতিহাস। ওঁরাই প্রথম হেরোডোটাসকে জানিয়েছিলেন, দু-দুবার সূর্য অস্ত গেছিল পূবে, উঠেছিল পশ্চিমে।"

"পূবে অস্ত, পশ্চিমে উদয় ! বলছেন কি ?"

"ম্যানিলার মূর্খদের খাতায় নাম লেখালে নাকি ? নিজের চোখে দেখলে না ? পূব হয়ে গেল পশ্চিম, দক্ষিণ হয়ে গেল উত্তর ? কেন হ'ল তাও কি বলে দিতে হবে ?"

"আ-আ—"

"শাট আপ ! পৃথিবীটা উল্টে গেলেও তুমি টের পাও না, কি রকম আহাম্মক তুমি !"

"পৃথিবী উল্টে গেল !"

"জী হ্যাঁ, বোকচন্দর ! পৃথিবীটা উল্টে গেল। ইলেকট্রিক ডিসচার্জ-গুলো দেখলে তো চোখের সামনে। একটা ম্যাগনেটের ওপর ইলেকট্রিক-ডিসচার্জ দিয়ে দেখো না, পোলারিটি পালটে যাবে। পৃথিবীও নিজের চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে একটা বিরাট ম্যাগনেট। টাইফনের ইলেকট্রিক ডিসচার্জ তার মেরুপ্রবণতা পালটে দিয়ে গেল বলেই গোটা পৃথিবীটা ঘুরে গেছিল। তাই সূর্যকে দেখলে পশ্চিমে উঠতে, পূবে নামতে। ঠিক যেমন কুমোরের চাকায় মাটির হাঁড়ি উল্টে যায়, সেইভাবে।"

"পৃথিবী উল্টে গেছিল !" বোকার মত পুনরাবৃত্তি করে ফেলেই দাব-ড়ানি খেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

"বিশ্বাস হল না গজমূর্খ ? আকাশের তারাগুলো দেখলেও তো বিশ্বাস হত।"

"তা তো দেখিনি।"

"তা আর কেন দেখবে, হাঁদারাম কোথাকার ! উল্টে গেছিল ! সব উল্টে গেছিল। পুরো রাশিচক্রটাই উল্টোপাল্টা হয়ে গেছিল। প্লেটো তো তাই লিখেছিলেন 'স্টেটসম্যান' কেতাবে, এই ব্রহ্মাণ্ডটা যেন উল্টোদিকেও ঘুরপাক খেয়েছিল কোনো একসময়ে। আসলে পৃথিবীটা উল্টে যাওয়ায় ঐরকমই মনে হয়েছিল। উত্তরের তারামণ্ডল চলে এসেছিল দক্ষিণের আকাশে, দক্ষিণের তারামণ্ডল গিয়েছিল উত্তরের আকাশে। সেনমুট্‌স-য়ের সমাধি মন্দিরের কড়িকাঠে সেই উল্টো ছবি দেখে তো তাক লেগে গিয়েছিল বৈজ্ঞা-নিকদের। বলেছিল, সব নাকি ভুল। কিন্তু কোরানেও কি ভুল লিখেছিল ?"

পৃথিবী নামক সুবৃহৎ চুম্বকের সঙ্গে বহিরাগত ধূমকেতুর শর্টসার্কিট নিয়ে মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করার সময় কি তখন আমার আছে ? ভুবনজোড়া লণ্ডভণ্ড কাণ্ড দেখে তখন আমার মুণ্ড ঘুরছে। সূর্য তো এখনো সিধে পথে চলছে না ! গতিপথ বেঁকে যাচ্ছে। আকাশপথে মাতালের

মত ছুটছে। টলতে টলতে উঠে আঁকাবাঁকা পথে ছুটে গিয়ে অস্ত যাচ্ছে। কেন? কেন এরকম হচ্ছে? সেইসঙ্গে পৃথিবীর গোঙানি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আকাশপথে চক্কর মারতে মারতে দেখলাম হাজার হাজার আগ্নেয়গিরি থেকে ভলকে ভলকে আগুন আর লাভা আর জ্বলন্ত পাথর বৃষ্টিও বৃদ্ধি পেয়েছে। নদী সাগর সরোবরে জ্বলন্ত পাথর পড়তেই জল বাষ্প হয়ে যাচ্ছে, বনে জঙ্গলে আগুন ধরে যাচ্ছে। কেন? কেন এমন মাতালের মত সূর্যের পথপরিক্রমা? চাঁদও তো দেখছি মত্ত! একি সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড? সবশুদ্ধ ছ-বার এই রকম মাতলামি করে গেল আমাদের সূর্য আর চন্দ্র। তারপর আবার যে কে সেই—অব্যাহত রইল দীর্ঘ টানা-রেখায় সূর্যের পথ পরিক্রমা, চন্দ্রের কলা পরিবর্তন।

"বিশুদ্ধমাগ্গ পড়েছো?" কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন প্রফেসর—"বৌদ্ধ গ্রন্থ। সেখানেও লেখা আছে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কাহিনী। বেশী দূরে যেতে হবে না, ঘরের কাছে আন্দামানে গিয়ে নেটিভদের কাছে খোঁজ নিও। আজও তারা মনে রেখেছে সাড়ে তিন-হাজার বছর আগেকার এই বিপর্যয়। আজও তারা বলে, প্রকৃতি যেদিন ক্ষেপে যাবে, পৃথিবী সেদিন উল্টে যাবে।"

"সমুদ্র ফুটছে!" রুদ্ধশ্বাসে পায়ের তলায় পুঞ্জ পুঞ্জ বাষ্পের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম প্রফেসরের—"বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে সমুদ্র!"

"তা তো উড়বেই, বৎস!" হৃষ্টকণ্ঠে বললেন প্রফেসর। "ধূমকেতুর কাছাকাছি আসতেই, আবর্তনের বেগ কমে আসতেই পৃথিবী যে গরম হয়ে গেছে। তাই তো সমুদ্রের জল উবে যাচ্ছে।"

বাষ্প শুধু উড়েই যাচ্ছে না, ভূমণ্ডলকে মেঘের আকারে পাক দিতে দিতে শীতল হয়ে বরফের আকারে ঝরে পড়ছে যেখানে, সেখানে মেরু অঞ্চল নেই। সুমেরু কুমেরুর বরফ গলে যাচ্ছে হু-হু করে পৃথিবীর অক্ষরেখা হেলে পড়ায়—নতুন সুমেরু কুমেরু সৃষ্টি হচ্ছে পাশে পাশে। সেইসঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে ঋতু পরিবর্তন। মিশরের ওপর দেখলাম গ্রীষ্মের বদলে হানা দিল শীত। মাসগুলোও পাল্টে গেল—ঘণ্টার হিসেব গেল গোলমাল হয়ে। পৃথিবীর যেখানে তাপ থাকার কথা যে সময়ে, সেখানে এল শৈত্য—বিপরীত দেখা গেল অন্যত্র। টাইফনের মহিমা দেখে হতভম্ব হয়ে স্থাণুর মত সময়-গাড়ীতে বসে রইলাম আমি।

আপন মনে বললেন প্রফেসর—"৩৬০ দিনের হিসেবে বছর হচ্ছে এখন—৫ দিন হারিয়ে গেল ক্যালেণ্ডার থেকে।"

"একেবারে তো নয় ।"

"সাতশ বছরের জন্যে—"

"আপনি কোত্থেকে জানলেন ?"

"পুরাণ ঘেঁটে, দেশবিদেশের প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান ঘেঁটে। এই ৫ দিনের হারিয়ে যাওয়া নিয়ে ম্যানিলার মুর্খগুলো—"

পঁচিশ বছর আকাশ কালো হয়ে রইল ঘন মেঘে। একা ক্রাকাতোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের জের চলেছিল পুরো একটা বছর—গোটা পৃথিবীর আকাশ কালো করে রেখেছিল। আর, হাজার হাজার ভলক্যানোর যুগপৎ অগ্ন্যুদ্গারের রেশ তো পঁচিশ বছর থাকবেই। ঘন মেঘের ওপরের দিকে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়ে ম্লান আভার আকারে ঠিকরে এল মর্ত্যলোকে। সূর্যাস্তের পর এই আভাই হল রক্তবর্ণ।

এই পঁচিশ বছরে বহুবার টাইম-মেশিন দাঁড় করিয়েছেন প্রফেসর। হাওয়ার মধ্যে পেয়েছি বড় মিষ্টি একটা গন্ধ। ঠিক যেন পদ্মের সৌরভ। সেইসঙ্গে আকাশ থেকে ঝরে পড়তে দেখেছি অমৃত !

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ ! অমৃত ! ভোরের শিশিরের সঙ্গে দেখেছি ঝুর ঝুর করে শস্যের বীজ খসে পড়ছে মাঠে, বনে, প্রান্তরে, জলে। হলদেটে রঙ। এক খামচা তুলে নিয়ে মুখ পুরে চিবোতে শুরু করেছিলেন প্রফেসর পরম তৃপ্তির সঙ্গে—"আঃ ! এই হল গিয়ে তোমাদের দেবতাদের অমৃত।"

অমৃত ! আকাশ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ! সৌগন্ধ্যে দিকবিদিক মাৎ হয়ে গেছে। আমার আর তর সয়নি। খপাৎ করে এক খামচা কুড়িয়ে নিয়ে মুখে পুরে দিয়েছিলাম। কি মিষ্টি খেতে। ঠিক মধুর স্বাদ। অপূর্ব গন্ধ। শরীর চাঙা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

"এরই নাম অমৃত ? অমর হয়ে যাবো তো এখন থেকে ?" বলেছিলাম পুলকিত চিত্তে।

"ঘোড়ার ডিম হবে," আমাকে একেবারে নিভিয়ে দিয়ে বলেছিলেন প্রফেসর। "পঁচিশ বছরের অন্ধকার কেটেছে তো এইভাবেই। পঁচিশ বছরের ঘোমটা খুলেছে একটু একটু করে বাষ্প, শিশির, বৃষ্টি, শিলা আর তুষার পাতের মধ্যে দিয়ে। সেইসঙ্গে বায়ুমণ্ডলের উপাদানও মুক্তি পেয়ে নেমে

এসেছে একই ভাবে—"

"বায়ুমণ্ডলের উপাদান !"

"খুব সম্ভব হাইড্রোজেন আর কার্বন। এক কথায় কার্বোহাইড্রেট।"

"কার্বোহাইড্রেট ! যা আমাদের মূল খাদ্য ?"

"আরে হ্যাঁ। পর-পর দু-বার ধূমকেতুর কাছে এসে পৃথিবী যখন খাদ্যহীন, ঠিক তারপরেই আকাশ থেকে কার্বোহাইড্রেট ছড়িয়ে গিয়েছে ভোরের শিশিরের সঙ্গে। তাই তো বুভুক্ষু মানুষের কাছে তা অমৃত সমান। তাই তো ইহুদিদের কাছে যার নাম 'ম্যান্যা', গ্রীকদের কাছে সেই স্বর্গীয় রুটির নাম 'অ্যামব্রোসিয়া'।"

"স্বর্গীয় রুটি !"

"রুটিই তো। আমরা কচমচ করে কাঁচা খেলাম বটে, কিন্তু ঠিক ক্ষেতের গমের মতই আকাশে গমকে যাঁতায় গুঁড়িয়ে, চাটুতে সেঁকে, রুটি বানিয়ে নেওয়া হত। দেখাবো, দেখাবো, সব দেখাবো।"

"কার্বোহাইড্রেটের নাম অমৃত !"

"আঃ ! আর কত অবাক হবে বলতে পারো ? জ্বালালে দেখছি। বৌদ্ধ পুঁথি খুললেও দেখতে পাবে পরিষ্কার লেখা আছে, স্বর্গের খাবার পৌঁছেছিল মর্তে যখন পৃথিবী ধ্বংস হয়েছিল, দিন আর রাত কএ হয়ে গেছিল, মহাসাগর শুকিয়ে গেছিল।"

"কিন্তু অমৃত তো সমুদ্রমন্থন করে উঠেছে।"

"উজবুক কাঁহাকার ! সমুদ্র বাষ্প হয়ে গিয়েছিল বলেই সমুদ্র মন্থনের কল্পনা। দেবতা দানবের লড়াই তো চোখের সামনে দেখলে। আকাশিক সংঘর্ষের ফলে অনিষ্ট যেমন হয়েছে, ইষ্টও তেমনি হয়েছে। অনিষ্টের নাম গরল, ইষ্টের নাম অমৃত।"

"অ।"

গজগজ করতে করতে প্রফেসর বললেন—"ঋগবেদ অথর্ব বেদগুলো পড়লেও তো সন্দেহের অবসান ঘটত। সে বিদ্যেও নেই। ঋগ্বেদে স্পষ্ট বলেছে, মধু পড়েছিল মেঘ থেকে। মধুর স্বাদ তো পেলে এখুনি। অথর্ব বেদ তো স্পষ্টই বলছে, স্বর্গ মর্ত বাতাস সমুদ্র আগুন থেকে মধুর উৎপত্তি। এই মধু অমৃতের আকারে বাঁচিয়ে দিয়েছে জীবজগৎকে। এই যে মিষ্টি গন্ধটা পাচ্ছো বাতাসে, বেদের অগ্নিস্তোত্রে তারও উল্লেখ আছে।

হিন্দুর ছেলে না তুমি ?"

ঠিক সেই সময়ে তিন মিনিটের মেয়াদ ফুরোতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। পৃথিবীকে চক্কর দিতে দিতে দেখেছিলাম, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রফেসর একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। সারা ভূমণ্ডল যখন পুড়ে কালো, তখন ভোরের শিশিরের সঙ্গে বিরামবিহীনভাবে কার্বোহাইড্রেট ঝরছে শস্যদানার আকারে। রোদ উঠলে কিছু গলে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। কিন্তু তার আগেই বুভুক্ষু মানুষরা কুড়িয়ে নিয়ে ঢেকে রেখে দিলে আর কিছু হচ্ছে না। সেই শস্য খাচ্ছে ঘোড়া, গাঁজিয়ে মদ করে খাচ্ছে যোদ্ধারা, নিংড়ে তেল বার করে মলম বানিয়ে গায়ে মাখছে মরুপ্রান্তর আর পর্বতাঞ্চলের মেয়েরা। প্রকৃতই অমৃত, এক বস্তু বহুবস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে কাজে লাগছে জীবজগতের। এ-দৃশ্য দেখলাম দেশে দেশে ; দেখলাম প্রশান্তের মাওরিদের মধ্যে, এশিয়া আর আফ্রিকার সীমান্তে ইহুদীদের মধ্যে ; হিন্দু, ফিন্, আইসল্যাণ্ডার সব্বাই মৃত্যুবরণ আকাশ থেকে বর্ষিত শস্যদানাকে অমৃতজ্ঞানে পুজো করছে। মেঘাবৃত ভূমণ্ডলের উত্তাপে কিছু শস্য গলে বাষ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে, শিশিরকে যেভাবে মাটি শুষে নেয়—সেইভাবে শুষে নিচ্ছে। তবুও সারা পৃথিবী জুড়ে ভোরের শিশিরের সঙ্গে বর্ষিত হয়ে চলেছে মধু-তুষার বিপুল পরিমাণে।

প্রফেসরের একটা কথা কিন্তু এখনও মনে আছে। মধু-তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে ধেয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ শুধিয়েছিলেন—"স্বর্গের রুটির পরিমাণটা জানো ?" বলেই জবাবটা নিজেই দিয়েছিলেন—"হ্যাগ্‌গাডিক সাহিত্যে বলে নাকি পৃথিবীর তাবং মানবকে দু'হাজার বছর ধরে আহার জুগিয়ে দেওয়ার মত শস্য পড়েছিল আকাশ থেকে।"

আমি তখন বিস্ফারিত চোখে দেখছিলাম আরও একটা অভূতপূর্ব দৃশ্য। দুধের নদী বইছে পায়ের তলায়।

দুধের নদী ! সাদা দুধই তো বটে। চক্ষের নিমেষে ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল টাইম-মেশিন। লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন প্রফেসর নদীর তীরে।

হাঁ-হাঁ করে উঠলাম আমি—"অটোমেটিক রিটার্ন চালু রয়েছে যে !"

ভ্রূক্ষেপ না করে নদীর জলে হাত ডুবিয়ে দিতে দিতে প্রফেসর বললেন—"না, নেই। নেমে এসো। দেখে যাও রূপকথার দুগ্ধনদীর চেহারা।"

ভয়ে ভয়ে নামলাম বিজন বিভুঁয়ে। আঁজলা ভরে জল নিয়ে পান করলেন প্রফেসর—"আঃ! কি মিষ্টি! ঠিক যেন মধু! তাই তো অথর্ববেদে বলেছে মধু-ফুল আগুন আর বাতাসের মধ্যে দিয়ে নেমে এসেছিল ধরাতলে—অমৃত বর্ষণে মধু হয়ে গেছিল নদীর জল।"

চড় চড় দড়াম করে আওয়াজ হ'ল পেছনে। চমকে ফিরে দেখলাম মাটি দু-ফাঁক হয়ে গেছে। ফোয়ারার মত দুগ্ধ ছিটকে আসছে বাইরে।

"প্রফেসর। প্রফেসর!" হ্যাঁচকা টান মারলাম ও'র হাত ধরে।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলেন প্রফেসর—"এমন ভীতু আর দেখিনি। দুধ এলো কোত্থেকে জেনে যাও।"

ঝুরঝুর করে অ্যামব্রোসিয়া পড়ছে সারা গায়ে, হাতে, মাথায়, মুখে। পড়ছে নদীর জলে। হাত তুলে দেখিয়ে বললেন প্রফেসর—"ঐ দ্যাখো, জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জল দুধের মত সাদা হয়ে যাচ্ছে। তাই ওপর থেকে মনে হয়েছে দুধ—যেমন মনে হয়েছিল মিশরীয় আর ইহুদীদের।"

চড়-চড়াৎ-দুমদাম শব্দটা এবার শোনা গেল ঠিক পেছনে। হুড়মুড় করে ধসে পড়ল ডানদিকের পাড়। পায়ের তলার মাটি হেলে পড়তেই চক্ষের নিমেষে প্রফেসরকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে একলাফে পেরিয়ে এলাম মাটির ফাটল। টাইম-মেশিনও হেলে পড়েছিল। ধড়মড় করে ভেতরে উঠেই প্রফেসরকে বলতে গেলে ছুঁড়ে সিটের ওপর ফেলে দিয়ে বললাম—"চালান!"

কঁকিয়ে উঠে প্রফেসর বললেন—"লাগে না বুঝি?" হাত দুটো কিন্তু গিয়ে পড়ল কন্ট্রোল প্যানেলে। মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁকুনি দিয়ে ফিরে গেলাম অ্যাটেনুয়েটেড ডাইমেনশনে।

কপালের ঘাম মুছে বললাম—"খবরদার আর কোথাও গাড়ী থামাবেন না।"

মিনমিন করে বললেন প্রফেসর—"সে দেখা যাবে।"

হু-হু করে পেরিয়ে গেল আরও পঁচিশটা বছর। মনটা এখন প্রফুল্ল। বর্তমানে ফিরে যাচ্ছি। পৃথিবীর আকাশও পরিষ্কার হয়ে এসেছে। সেই বারোমেসে ঘনঘটা আর নেই। এমন সময়ে দূর আকাশে দেখা গেল একটা ধূমকেতু!

প্রফেসর আগেই দেখেছিলেন। একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন সেই দিকে। আমি অস্ফুট চীৎকার করে উঠতেই বললেন মৃদু কণ্ঠে—"টাইফন ফিরে আসছে।"

"টাইফন! আবার!"

জবাব দিলেন না প্রফেসর। পলকের মধ্যে পেরিয়ে এলাম দু-দুটো বছর। ধূমকেতু এসে গেছে পৃথিবীর খুব কাছে। ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কা খসে পড়ছে ভূমণ্ডলের সর্বত্র। বড় বড় জ্বলন্ত পাথরের চাঁই যেখানে পড়ছে, সেখানেই আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বাষ্প ছিটকে যাচ্ছে শূন্যে।

আচম্বিতে স্থির হয়ে গেল সূর্য আর চন্দ্র।

আঁৎকে উঠলাম—"আবার পৃথিবী উল্টে গেল নাকি?"

ভয়াবহ ঘূর্ণি ঝড়ে পৃথিবী তখন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। জনপদের পর জনপদ শ্মশান হয়ে যাচ্ছে। মেদিনী আবার গোঙাচ্ছে। থর থর করে কাঁপছে···কাঁপছে···কাঁপছে! দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেল গোটা পৃথিবীতে!

মহাশূন্যে জ্বলতে লাগল সবুজ গ্রহ পৃথিবী!

পরমুহূর্তেই নড়ে উঠল সূর্য। আবার শুরু হল অস্তাচল যাত্রা।

কিন্তু পৃথিবী তো তখন অগ্নিগোলকে রূপান্তরিত হয়েছে। ভূস্তর ফাটছে চড়-চড় দমাদম শব্দে—প্রথমে ওপরের স্তর তারপর নিচের স্তর। জলাভূমি, ভিজে মাটি শুকিয়ে খটখটে হয়ে যাচ্ছে—মাঠ আর প্রান্তর সাদা ছাইয়ে ঢেকে যাচ্ছে···তরুলতা পুড়ছে, শ্যামল বৃক্ষপত্র পুড়ছে···মাঠের সোনালী ধান পুড়ছে···বড় বড় শহরগুলো নিমেষে ভেঙে পড়ে মাটিতে মিশিয়ে যাচ্ছে···আগুন জ্বলছে পাহাড়ে, জঙ্গলে, মাঠে, প্রান্তরে। অপরিসীম উত্তাপে ইথিওপিয়ার মানুষগুলোর চামড়া কালো হয়ে যাচ্ছে। লিবিয়া মরুভূমি হয়ে গেল, ডন নদীর জল বাষ্প হয়ে উড়ে গেল, ব্যাবিলোনিয়ান ইউফ্রেটিস পুড়তে লাগল; গঙ্গা, ড্যানিউব, ফাসিস, আলফিয়াস ফুটতে লাগল টগবগ করে; নদীর পাড় বরাবর দেখা দিল দাবানল, সৈকতভূমির বালি দারুণ উত্তাপে গলে গিয়ে হ'ল কাঁচ। সাগর উবে গিয়ে দেখা দিল বালুকাময় মরুপ্রান্তর, কোথাও নিতল সমুদ্র-গর্ভ থেকে মাথা তুলল পর্বত: কোথায় অগ্নুত্তি ফোয়ারা আবির্ভূত হল মেদিনী

ফাটিয়ে। আগ্নেয়গিরিরা পাগল হয়ে লাভা উগরোচ্ছে, দ্বীপের পর দ্বীপ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। একটা দিন···মাত্র একট দিন সূর্য স্থির হয়ে থেকে ছিল এক গোলার্ধে—আর এক গোলার্ধে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা বিরাজ করেছিল রাত্রি। মাত্র ঐ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই লোপ পেল গ্রীক সভ্যতা···

আমরা তখন আটলাণ্টিকের ওপরে। পৃথিবীটাকে চাকিপাক দিতে দিতে আশ্চর্য এক মহাদেশ দেখেছিলাম সেখানে—আধুনিক মানচিত্রে যার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করায় বলেছিলেন—"ঐ হল গিয়ে আটলান্টিস যে-আটলাণ্টিসের গল্প বলে গেছেন প্লেটো—কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেনি। ঐ সেই আটলাণ্টিস। আফ্রিকা শাসন করেছে, ঈজিপ্ট আর ইউরোপের বর্ডার পর্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। যে আটলাণ্টিসের অস্তিত্ব মানতে চাননি ম্যানিলার মূর্খরা, কিন্তু যে মহাদেশকে নিয়ে চুটিয়ে গল্প উপন্যাস কাব্যরচনা করে গেছেন দেশ বিদেশের কবি আর লেখকরা। ১৯২৬ সালের একটা অসম্পূর্ণ তালিকা অনুসারে এ-রকম রচনার সংখ্যা ১৭০০।"

"১৭০০! বলেন কী!" সত্যিই অবাক হয়ে গেছিলাম আমি।

উনি বলেছিলেন—"হ্যাঁ ১৭০০। আরও বেশী আছে। যাঁরা কল্পনাবিলাসী, লস্ট আটলাণ্টিস তাদের কল্পনার খোরাক জুটিয়েছে হাজার হাজার বছর। কেউ বলেন, এই মহাদেশ ছিল আটলাণ্টিকে, কারও কারও মতে তিউনিসিয়া, প্যালেসটাইন, সাউথ আমেরিকা, সিলোন, নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড, স্পিটবার্জেনে। মানে, সমুদ্র ছেড়ে ডাঙার ওপরেও আটলান্টিসকে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু তুমি তো দেখছো আটলান্টিস রয়েছে আটলাণ্টিকেই। যুগ যুগ ধরে কত বীর্যবান রাজা রাজত্ব করে গেছে এখানে, দ্বীপের পর দ্বীপ জয় করেছে, মহাদেশের অংশ কেড়ে নিয়েছে। লিবিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপেও বিজয় কেতন উড়িয়েছে—সেই তাসকানি পর্যন্ত। এখন বুঝতো তো কেন আমেরিকান, ঈজিপ্সিয়ান আর ফিনিসিয়ানদের মধ্যে সংস্কৃতির এত সাদৃশ্য? যোগাযোগ ছিল তো এই আটলাণ্টিসের মধ্যে দিয়েই।"

আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার সেই বিশাল আটলাণ্টিস সাম্রাজের ওপর এসে দেখলাম কল্পনাতীত এক দৃশ্য।

তখন গভীর রাত্রি। সৃষ্টি ধ্বংস হচ্ছে। পৃথিবী জোড়া লণ্ডভণ্ড

কাণ্ড ঘটছে। কানের পর্দা ফাটিয়ে দেওয়ার মত আওয়াজ শুনলাম নিচে। বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ। আগুন আর জ্বলন্ত পাথর ধেয়ে গেল মেঘলোক পর্যন্ত। নিমেষে মধ্যে তাথৈ তাথৈ সমুদ্র নাচতে লাগল বিরাট সাম্রাজ্য যেখানে ছিল—সেখানে। সমুদ্র গর্ভে নিমেষে মধ্যে তলিয়ে গেল আটলাণ্টিস। পর-পর আরো কয়েকটা বিস্ফোরণ ঘটল। দূরে দূরে আরো কিছু ভূখণ্ডকে গ্রাস করল রাক্ষস আটলাণ্টিক। আর কোথাও ডাঙা নেই। শুধু সমুদ্র! শুধু সমুদ্র! শুধু সমুদ্র!

হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম—"আটলাণ্টিস লস্ট হয়ে গেল!"

"হ্যাঁ, দীননাথ, লস্ট হয়ে গেল আটলাণ্টিস," অদ্ভুত গম্ভীর গলায় বললেন প্রফেসর। গম্ভীর, কিন্তু ভারাক্রান্ত। পৃথিবী জোড়া অনেক ধ্বংস লীলা দেখেও যিনি প্রসন্ন ছিলেন, তাঁর এখনকার বিষণ্নতা মনকে নাড়া দিয়ে গেল। বললেন আবার মন্দ্র মন্থর কণ্ঠে—"হারিয়ে গেল একটা উন্নত সভ্যতা—চিহ্নমাত্র না রেখে। মহাকাল, তোমাকে প্রণাম!"

"কিন্তু কেন? পৃথিবী কি আবার উল্টে গেল?"

"না, দীননাথ। পৃথিবীর অক্ষরেখা শুধু হেলে পড়ল। তাই একদিনের জন্য সূর্য দাঁড়িয়ে গেল মনে হল। অক্ষরেখার চারধারে লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে ধাক্কা খেল বলেই ভূস্তর হড়কে সরে গেল—গলন্ত পাথর তলা থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসে আগুন ধরিয়ে দিল পৃথিবীতে! আনফরচুনেট! মোস্ট আনফরচুনেট!"

কিন্তু ঐ শেষ!

বাহান্ন বছরের ব্যবধানে এসে আগন্তুক টাইফন টলটলায়মান অবস্থায় পৃথিবীকে ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে দিয়ে তো গেলই, নিজেও পৃথিবীর আকর্ষণে নিজের ছুটে চলার পথ ছেড়ে ধরল অন্যপথ।

সেই দৃশ্য বিহ্বল হয়ে দর্শন করলাম আমরা! দ্বিতীয় সূর্যের মত সমস্ত সৌরজগৎ আলোকিত করে দূর হতে দূরে এঁকেবেঁকে টলতে টলতে ছুটে গেল টাইফন। তখনও তার ল্যাজ রয়েছে—কিন্তু আকারে অনেক ছোট হয়ে গেছে। দু-দুবার পৃথিবীর ওপর উল্কার পাথর খসিয়ে গেছে ঐ ল্যাজ থেকে—ছোট তো হবেই। শূকর-পুচ্ছের মত খাটো ল্যাজ, কিন্তু অতীব দ্যুতিময় মাথা নিয়ে সূর্যের টানে তার চারদিকে পরিক্রমা শুরু

করল টাইফন।

জন্ম নিল শুক্র গ্রহ। শুক্রের-পুচ্ছ আস্তে আস্তে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। কিন্তু মাথা জ্বলছে সূর্যের মত। সে কী আলো! চড়া রোদের মত চোখ ধাঁধানো। অথচ আমরা যে গ্রহকে কখনো দেখি ভোরের তারা অথবা সাঁঝের তারা রূপে বছরের বিভিন্ন সময়ে, তার আলো সূর্যের আলোর দশ লক্ষ ভাগের একমাত্র। সাড়ে তিন হাজার বছরের ব্যবধানে জারিজুরি অনেক কমে এসেছে সৌরজগতের নবীন গ্রহের।

নতুন গ্রহ বলেই কিন্তু শুক্র চক্রাকার পথে ঘুরছে না সূর্যকে ঘিরে—ঘুরছে ডিমের মত কক্ষপথে। বড় বিপজ্জনক কক্ষপথ। সৌরজগতের সব গ্রহেরই নির্দিষ্ট কক্ষপথ রয়েছে। উটকো উৎপাতটা পৃথিবীর সর্বনাশ করতে করতে বেরিয়ে গিয়ে না জানি আবার কোন্ গ্রহের সঙ্গে ধাক্কা লাগায়।

প্রফেসর এই সময়ে বলে উঠলেন—"এখন বুঝছো তো পাঁচ হাজার বছর আগেকার জ্যোতির্বিজ্ঞানে কেন শুক্রগ্রহের উল্লেখ নেই? কেন শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল আর বুধ—এই চার গ্রহকে নিয়ে জ্যোতিষীরা আঁক কষেছেন ভারতবর্ষে আর ব্যাবিলনে? পাকা গণিতবিদ ছিলেন তাঁরা—অথচ শুক্রকে তাঁদের গণনার মধ্যে আনেননি শুধু এই কারণে—শুক্রের জন্ম হয়েছে অনেক পরে—আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। বেদে অবশ্য বলেছে, শুক্রের নাকি ল্যাজ ছিল। দেখতেই পাচ্ছো, রয়েছে। একই কথা বলেছেন ইউফ্রেটিস আর মেক্সিকান উপসাগরের উপকূলবাসীরাও। শুক্রের ল্যাজ ছিল এককালে—ধূমকেতু ছিল যে।"

দিনের বেলাতেও সদ্যোজাত শুক্রের আলোয় আকাশ ছেয়ে রয়েছে তখনও।

"শুক্র যে এককালে ধূমকেতু ছিল, তা শুক্রের দেশ বিদেশের নাম বিশ্লেষণ করলেও ধরা যেত—এতদূর আসার দরকার হত না," বললেন প্রফেসর—"শুক্রর পেরুভিয়ান নাম 'চাসকা'—মানে, ঢেউ খেলানো চুল। তাছাড়া, 'কোমা' শব্দটা গ্রীক, যার মানে, চুল। 'কোমা' থেকে 'কমেট' শব্দের উৎপত্তি।"

আমি তখন ওঁর কথা শুনছিলাম না। পলকহীন চোখে দেখছিলাম ডিমের মত কক্ষপথে ছুটতে ছুটতে যতবার পৃথিবীর কাছে আসছে নতুন গ্রহ

শুক্র, ততবারই খানিকটা অংশ আলোয় থাকছে, খানিকটা থাকছে ছায়াচ্ছন্ন। ঠিক চন্দ্রকলার মতন। পৃথিবীর কাছাকাছি আসতেই কলা-র প্রান্ত দুটো ঝকঝক করছে দুটো শিংয়ের মত। ঠিক যেন মোষের শিং অথবা গরুর শিং।

আঙুল তুলে দেখালাম প্রফেসরকে—"দেখেছেন?"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রফেসর বললেন—"তোমার আগেই দেখেছি। মাউণ্ট সিনাইতে ষাঁড়কে আর দেশ বিদেশে গরু আর ষাঁড়কে দেবতাজ্ঞানে কেন পুজো করা হয়, এখন তোমারই বোঝা উচিত।"

"গরু-ষাঁড়ের পুজোর সঙ্গে শুক্রের শিংয়ের কি সম্পর্ক?"

ক্ষেপে গেলেন প্রফেসর—"তোমার মাথায় দুটো শিং থাকলে সম্পর্কটা অনেক আগেই বুঝতে। শুধু গরু আর ষাঁড় কেন, ছাগল আর সাপকেও বহু দেশে পুজো করা হয় শুধু শুক্রের ঐ চেহারা দেখে। সাপের মত কিলবিলে চেহারা নিয়ে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড বাঁধিয়ে গেছিল যে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরাকালের মানুষ তাই সর্পদেবতার পুজো করে তুষ্ট করতে চেয়েছে তাকে। গরুকেও হিন্দুরা ভগবান বলে শুধু এই কারণেই। কেন করবে না বলো? শিংওলা যে গ্রহ দুধ উৎপাদন করে গেছে, তার সঙ্গে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য তো গরুর। অথর্ববেদে তাই তো আকাশ থেকে অমৃত বৃষ্টির অত ফলাও বর্ণনা, দুধ দিয়েছে বলে দেবতাকে বিশাল গাভী রূপে কল্পনা। স্বর্গ থেকে আগুন বৃষ্টি করেছে বলে রুদ্ররূপী ষাঁড় হিসেবেও কল্পনার উৎস ঐ শুক্র। কামধেনু কল্পনার আদি কোথায় এবার বুঝেছো হাঁদারাম?"

কাঁহাতক গালাগাল সহ্য করা যায়। তেড়িয়া মেজাজে বললাম—"অত পড়াশুনার সময় নেই আমার।"

"না পড়েই সায়ান্স-ফিকশন লেখো বলেই সাহিত্যের বাজারে বস্তাপচা সস্তামাল ছেড়ে যাচ্ছো সমানে। রামায়ণ পড়েছো?"

"স্কুলেই পড়েছি।"

"মাথা কিনে নিয়েছো। সম্পূর্ণ রামায়ণটা পড়ে দেখো হে পণ্ডিত। সেখানেও বলা হয়েছে, স্বর্গের গাভী নাকি মধু দেয়, সেঁকা শস্য দেয়... দই দেয়, চিনি মিশোনো দুধ ঢালে সরোবরে। স্বর্গের গরুরই তো আরেক নাম সুরভি, তাই না? যে সৌরভ বিতরণ করে? মহাকাব্যে তো স্পষ্ট বলেছে, উৎকৃষ্ট সুগন্ধ বিতরণ করে সুরভি। সুগন্ধ টের পাওনি আকাশে

বাতাসে ?"

"পেয়েছি, পেয়েছি।"

"তবে আর গরু-ষাঁড়ের পুজোর সঙ্গে শুক্রের শিংয়ের সম্পর্ক আছে শুনে আকাশ থেকে পড়লে কেন ? এই জন্যেই তো অথর্ব বেদের বিধান অনুযায়ী হিন্দুরা গরু-ষাঁড় মারে না—তাদের বিষ্ঠা আর মূত্রও পবিত্র তাদের কাছে। অথচ বেদেই উল্লেখ আছে, শুক্রের আবির্ভাবের আগে গরু বলি হত, মাংসও খাওয়া হত। কেন না, তখনো শুক্র তার শিং নিয়ে আবির্ভূত হয়নি।"

রাগে ফুঁসতে লাগলেন প্রফেসর। রাগ প্রশমনের জন্যে একটু মন জোগালাম। জিজ্ঞেস করলাল—"ধ্বংসের দেবতা শিবের কল্পনাও কি ঐ শুক্র থেকে ?"

অমনি স্বয়ং শিবের মত জল হয়ে গেলেন প্রফেসর—"মন্দ বলোনি। এদিকটা এখনো ভেবে উঠিনি। শিবের চেহারাখানা কল্পনা করো। মিলে যাচ্ছে না ঐ শুক্রের সঙ্গে ? মাথায় আধখানা চাঁদ। চুলের জটা, কখনো তা সাপের মত, বাহন ষাঁড়। হাতে ডম্বরু—প্রলয়কালে যে শব্দ শুনে এলে কিছু আগে। বাঃ, বাঃ, এই তো বুদ্ধি খুলেছে। আসলে কি জানো, সৎসঙ্গে বুদ্ধি ঠিক খুলে যায়। একেবারে নির্বোধ তো তুমি নও—হলে কি আমার ধারে কাছে রাখতাম তোমাকে।"

এই প্রথম প্রফেসরের মুখে আমার বুদ্ধির প্রশংসা শুনলাম, হ্যাঁ, সেই প্রথম। উপর্যুপরি অ্যাডভেঞ্চার আর কল্পনাতীত দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে আর ম্যারাথন বক্তৃতা ঝাড়তে ঝাড়তে ওঁর নিজের বুদ্ধির গোড়াও বোধ হয় আলগা হয়ে এসেছিল—তাই বেফাঁস বলে ফেললেন। প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল আমার।

কিন্তু অঘটনের তো শেষ হল না। ভেবেছিলাম, আপদ বিদায় হল—সৌরজগতে শান্তি ফিরে এল। কিন্তু না, না! দামাল শিশুর মতই টলতে টলতে ডিমের মত কক্ষপথে ছুটতে ছুটতে আবার এক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসল শুক্র। সেই কথাতেই এবার আসা যাক।

২৩ ॥ নেকড়ে-নক্ষত্র

দীর্ঘ সাতশটা বছর সময় পথের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল দেখতে দেখতে। এই সাতশ বছরে পৃথিবীর ভয়ার্ত মানুষগুলো ভয়ে কাঠ হয়ে চেয়ে রইল শিং-ওলা শুক্রগ্রহের দিকে। নিঃসীম উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে রইল ডিম্বাকার কক্ষপথে জ্বলন্ত শুক্রগ্রহের পানে। শুকর-পুচ্ছ নিয়ে যতবার পৃথিবীর নিকটবর্তী হল শুক্র, ততবার বিষম আতংকে যেন নির্জীব হয়ে রইল সারা পৃথিবীর মানুষ। প্রতি বাহান্ন বছর অন্তর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেখলাম প্রত্যেককে। বাহান্ন বছরের ব্যবধানেই তো টাইফন ধূমকেতু ফিরে এসেছিল। দু-দুবার পৃথিবীকে ল্যাজের ঝাপটায় মৃতপ্রায় করে দিয়ে গেছে যে উৎপাত, বাহান্ন বছর অন্তর অন্তর তার ফিরে আসার সম্ভাবনায় ভয়ে উদ্বেগে বিশ্বের মানুষ আধমরা হয়ে রইল এই সাতশ বছর ধরে। আকাশে আরও গ্রহ তো রয়েছে, কিন্তু ভোরের তারার মত ধূম্র-পুচ্ছ তো কারোর নেই। ধ্বংসের দেবতারূপে তাই তাকে সমীহ করতে শিখল দেশ বিদেশের মানুষ। দেখলাম, আমেরিকার রেডইন্ডিয়ানদের লোককথায় বিশেষ স্থান নিল শুক্রগ্রহ। সাবধান! সাবধান! বাহান্ন বছর অন্তর আবার ঐ তারা ধূমকেতুর পুচ্ছ নেড়ে ধেয়ে আসতে পারে পৃথিবীর দিকে। আবার আগুন জ্বলবে, আবার সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হবে, মহাপ্লাবন ঘটবে, পাথর সৃষ্টি হবে, আকাশ মাথায় ভেঙে পড়বে। একই কাহিনী ঘুরে ফিরে বিভিন্ন আকারে স্থান পেল বিশ্বের সমস্ত মানুষের লোককথায়। একই অভিজ্ঞতা লাভ ঘটেছে যে প্রত্যেকেরই, একই বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে প্রত্যেককেই। তাই একই ধাঁচের বিভীষিকা কাহিনী ফিরতে লাগল লোকের মুখে মুখে ভূমণ্ডলের সর্বত্র। ভোরের তারাকে তুষ্ট করার জন্যে বিবিধ উপাসনা পদ্ধতিও প্রবর্তিত হতে দেখলাম এই সাতশ বছরে। অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল পনি ইন্ডিয়ানদের বীভৎস বলিদান-প্রথা দেখে। ঘটনাটা ঘটল এইভাবে।

মর্নিংস্টারকে তুষ্ট করার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করার অভিলাষ নিয়ে টাইম-মেশিন পাহাড়ের মাথায় নামিয়েছিলেন প্রফেসর। নিচের উপত্যকায় জড়ো হয়েছে কাতারে কাতারে পনি ইন্ডিয়ান। হাত-পা মুখ নেড়ে সর্দার মর্নিংস্টারের ভজনা করল অনেকক্ষণ ধরে। মাথামুণ্ড কিছু বুঝলাম না।

অত উঁচু থেকে শুনতেও পেলাম না। প্রফেসর কিন্তু আমাকে বললেন —"ওরা যা বলছে, তা কিন্তু এক বৃদ্ধ ইণ্ডিয়ানের মুখে শুনে লিখে নেওয়া হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে। ওরা বলছে, মনিংস্টার স্বর্গের অন্য সমস্ত দেবতার প্রভু। বলছে, মনিংস্টারের বিধান অনুযায়ী, জগৎ যেদিন ধ্বংস হবে, সেদিন চাঁদ লাল হয়ে যাবে। চাঁদ যেদিন লাল হবে, সেদিন বুঝবে পৃথিবীরও শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। সেদিন কিন্তু কুমেরু আর সুমেরুর ওপর যে দুটি তারাকে মনিংস্টার পাহারায় রেখেছে পৃথিবীর ওপর নজর রাখার জন্যে, তারা জায়গা বদলা বদলি করবে! সাবধান! সাবধান ভোরের তারাকে সাবধান! জগৎ ধ্বংস করবে ঐ ভোরের তারা বাহান্ন বছরের ব্যবধানে যে কোনো দিন। তাই এসো তাকে ঠাণ্ডা করি বলি দিয়ে।"

কিন্তু বলি মানে যে মানুষ বলি, তা তো ভাবিনি। দৃশ্যটাও যে এমন বীভৎস হবে, কল্পনাও করতে পারিনি। মনিংস্টার যা-যা করে গিয়েছে অতীতে, সেই সবেরই নাটক উপস্থাপিত হল যেন বলিদান অনুষ্ঠানে। ভোরের তারা তখন খুব বেশী জ্বল জ্বল করছে আকাশে, পুচ্ছদেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ডিমের মতন পথে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর খুব কাছে আসতেই বলিদানের হিড়িক উঠেছে। একটি মেয়েকে ঠেলে দেওয়া হল একজন পনি ইণ্ডিয়ানের দিকে। নেকড়ের মত গর্জাতে লাগল লোকটা—যেন ছিঁড়ে খাবে মেয়েটাকে। তারপর তাকে লাল রঙ মাখিয়ে কালো পোশাক পরানো হল। লোকটাও মুখে মাথায় লাল রঙ মেখে নিলে। বারোটা ঈগলের পালক লাগানো শিরস্ত্রাণ পরলো মাথায়। মনিংস্টারকে নাকি এই বেশেই দেখা যায়।

চারটে খুঁটি পোঁতা ছিল একটা মঞ্চের চারপাশে। মেয়েটাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হল মঞ্চের ওপর। প্রধান পুরোহিত তার লাল রঙ মাখানো দেহের ডানদিকে কালো রঙ মাখিয়ে দিলে—বাঁ দিক লালই রইল। ছড়ানো পাখার মত বারোটা ঈগলপাখীর পালক লাগানো শিরস্ত্রাণ পরিয়ে দেওয়া হল মাথায়।

এরপরেই শিউরে উঠলাম আমি। লাফ দিয়ে এগিয়ে এল একজন কৃপাণধারী। এককোপে উন্মুক্ত করল মেয়েটির বক্ষদেশ। প্রধান পুরোহিত হাত গলিয়ে দিয়ে তাজা রুধির আঁজলা করে এনে মাখাল নিজের মুখে,

মাথায়, গায়ে। চারদিক থেকে তীর ছুঁড়তে লাগল ইণ্ডিয়ানরা মেয়েটার বিগতপ্রাণ দেহ লক্ষ্য করে। এমন কি বাচ্চাদের হাতেও ধনুক ধরিয়ে দিয়ে মায়েরা তীর নিক্ষেপ করতে ছাড়ল না।

আর সহ্য হল না। প্রফেসর নিজেও কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। পলকের মধ্যে টাইম-মেশিন স্পেশরকেটের মত ধেয়ে গেল পৃথিবীর অন্য প্রান্তে।

সংঘর্ষটা লাগল তারপরেই!

কি করে বর্ণনা দিই সেই দৃশ্যের ভেবে পাচ্ছি না। আমার ভাষায় কুলোবে না। মহাকবিরা রূপকের মাধ্যমে জ্যোতিষ্ক যুদ্ধের সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাঁদের মহাকাব্যে। হোমার আর কালিদাসের রচনার সঙ্গে যারা পরিচিত, তাদের তা অজানা নয়। জ্যোতির্বিদ্যার সুপ্রাচীন গ্রন্থ "সূর্যসিদ্ধান্তেও" একটি অধ্যায় আছে—যা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অধ্যায়টার নাম 'গ্রহ মিলন সম্পর্কে'। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা খবর রাখে কেবল এক ধরনেরই গ্রহ-সান্নিধ্যের—সূর্য যখন দুটো গ্রহের মধ্যে এসে পড়ে—সেই অবস্থার। প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্বিদরা কিন্তু গ্রহ-সান্নিধ্যকে অনেকগুলো শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। যেমন, সম্যোগ, সমাগম, যোগ, মিলক, যুতি এবং যুদ্ধ। যুদ্ধ-সান্নিধ্যের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, গ্রহে গ্রহে যখন লড়াই লাগে। একালের জ্যোতির্বিদরা কিন্তু সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যায় কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজে পাননি। গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষ তো তাঁরা দেখেননি।

কিন্তু আমরা দেখলাম এবং হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিন্দুমাত্র নেই—মন গড়া কথা একটাও নেই। জ্যোতিষ্ক যুদ্ধ সত্যিই ঘটেছিল পৃথিবীর আকাশে—একবার নয়, বার বার।

আরও একটা হেঁয়ালীর অবসান ঘটল সেই সঙ্গে। প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের অন্তরে কোনোদিনই আতংক জাগ্রত করতে পারেনি মঙ্গলগ্রহ। নিশ্চয় আতংকজনক ছিল না বলেই পারেনি। কিন্তু আজ থেকে ২৬০০ কি ২৭০০ বছর আগে কি এমন ঘটেছিল যে তারপর থেকে লাল গ্রহ মঙ্গল তাদের কাছে আতংক-গ্রহে পরিণত হল? সুদূর পথের পথিক মঙ্গল কি

তাহলে আপন কক্ষপথ ছেড়ে হানা দিয়েছিল পৃথিবীর আকাশে ? কিন্তু কেন ? কিসের তাড়নায় অভ্যস্ত পথ পরিক্রমা স্থগিত রেখে অজানার অভিযানে রওনা হয়েছিল মঙ্গল ?

জবাবটা অতিশয় সোজা, কিন্তু দুঃখের বিষয় কারো মাথায় আসেনি। ডিমের মত কক্ষপথে পাগলা ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে মঙ্গলের পথ মাড়িয়ে ফেলেছিল দামাল শুক্র।

পরিণাম ঃ সংঘর্ষ !

চোখ ধাঁধানো দ্যুতিটাই প্রথমে চোখে পড়েছিল। সমস্ত সৌরজগৎ অবর্ণনীয় আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল পলকের জন্যে। তার পর লম্বা লম্বা লাফ মেরে সময় পথে এগিয়ে গেল টাইম-মেশিন। মঙ্গলও রক্তরাঙা দ্যুতি নিয়ে যেন লাফ মেরে মেরে এগিয়ে এল পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীজোড়া লণ্ডভণ্ড কাণ্ডের পুনর্ঘটন দেখলাম। ভূমিকম্প। অগ্ন্যুৎপাত। সমুদ্রোচ্ছ্বাস। হারিকেন। উল্কা বৃষ্টি। বজ্রপাত। একটা বজ্র এসে পড়ল তাসকানির সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহর বোলসেনা-র ওপর। পুরো শহরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সহসা ধ্বংস হল বিশাল ইট্রাসকান সভ্যতা। উদ্বাস্তুরা ইটালি গিয়ে পত্তন করল রোম সাম্রাজ্যের। কালিদাস কি সাধে লিখেছিলেন গ্রহদেব শিবের ঔরসে অগ্নির গর্ভে জন্ম নিয়ে কুমার লড়ে গিয়েছিল দৈত্যের সঙ্গে—যে দৈত্য অনেক কষ্ট দিয়েছে পৃথিবীকে ! মঙ্গলই সেই কুমার—যাকে বেমক্কা ধাক্কা মেরে নিজেই ঢিট হয়ে গেল শুক্র গ্রহ। ডিমের মত কক্ষপথ পরিত্যাগ করে সুবোধ বালকের মত বেছে নিল গোলাকার কক্ষপথ।

কিন্তু রুদ্ররূপী মঙ্গল অত সহজে নিস্তার দিল না শুক্রকে। নিস্তার দিল না পৃথিবীকেও। বারংবার সংঘটন ঘটালো শুক্রের সঙ্গে। ছিনিয়ে নিয়ে গেল পৃথিবীর চাঁদকে ! শূন্যপথে যেন গেণ্ডুয়া খেলা আরম্ভ হয়ে গেল বেচারী চন্দ্র দেবতাকে নিয়ে। মুহুর্মুহু বজ্রপাতে বিদীর্ণ হল তার পৃষ্ঠ দেশ—মুহুর্মুহু উল্কাপাতে চৌচির হয়ে গেল তার সাধের দেহখানা। চাঁদের জ্বালা মুখ নিয়ে গবেষণা করেও একালের বৈজ্ঞানিকরা অকাট্য কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। কেউ বলেন, নিভন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালা-মুখ ওগুলো। কেউ বলেন, বিরাট বিরাট উল্কাপাতের পরিণাম। ছোট

বড় জ্বালামুখের সংখ্যা সেখানে ত্রিশ হাজারেরও বেশী। কোনোটা বিশ হাজার ফুট উঁচুতে। কোনোটার ব্যাস দেড়শ মাইল। অথচ পৃথিবীর সব চাইতে বড় জ্বালামুখের সন্ধান পাওয়া গেছে অ্যারিজোনায়—যার ব্যাস মোটে একমাইলের চার পঞ্চমাংশ। প্রায় দশমাইল চওড়া রশ্মিরেখার মত ফাটল বিস্তৃত চাঁদের জ্বালামুখের চারধারে—পৃথিবীর কোনো জ্বালামুখেই যা দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিকরা তাই হতভম্ব হয়েছিলেন এতকাল।

কিন্তু আমি দেখলাম কিভাবে চাঁদকে ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়ল লড়াকু মঙ্গল। হোমার কি সাধে ইলিয়াড কাব্য গ্রন্থে চাঁদের সঙ্গে মঙ্গলের ক্রীড়ার অমন চিত্তাকর্ষক রূপক বর্ণনা লিখেছেন? শুধু মঙ্গলই নয়, স্মরণাতীত-কাল থেকে আরও কত খবর রচিত হয়েছে চন্দ্রপৃষ্ঠে—কে তার হিসেব রেখেছে? তাই তো চাঁদের অমন চেহারা!

সেই তুলনায় মঙ্গলের চেহারা কেন যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল ব্যাবিলনের আর ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের, তা সমস্ত অণুপরমাণু দিয়ে উপলব্ধি করলাম। কী ভয়ংকর মূর্তি! ব্যাবিলনে মঙ্গলকে শেয়াল নামে ডাকা হত কেন, মিশরে তাকে নেকড়ে বলা হত কেন তা সভয়ে লক্ষ্য করলাম সেদিন!

ধাক্কা তো মেরেছে শুক্র, পৃথিবীকে অত ভয় দেখানোর কি দরকারটা পড়ল বুঝলাম না। কখনো সিংহ, কখনো শিয়াল, কখনো নেকড়ে, কখনো মাছ, কখনো শূকর, কখনো ড্রাগনের মূর্তি ধরে গোটা পৃথিবীবাসীদের হৃৎকম্প উপস্থিত করল একা মঙ্গল। শুক্রের শূকর পুচ্ছ থেকে ক্ষুদে-ধূমকেতুদের খসিয়ে এনে টেনে আনল পেছন পেছন—যেন দেবরাজের পেছন পেছন মার মার করে তেড়ে আসছে অগুন্তি সৈন্য। আর্যরা যুদ্ধ-দেবতা ইন্দ্রকে কল্পনা করেছিল কি থেকে, সেদিন তা বুঝলাম ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে! বুঝলাম কেন দেবরাজকে মারুৎ বলা হয়েছে বৈদিক স্তোত্রে, আর কেনই বা ভারতীয় মারুৎ থেকে এসেছে মঙ্গল গ্রহের পাশ্চাত্য নাম—মার্স। দেখলাম, দেবরাজ সদলবলে বিশাল বিশাল প্রস্তর বৃষ্টি করে চলেছে পৃথিবীতে। সেই শিলাখণ্ডদের দেবতা রূপে পূজা করছে দেশে দেশে। বুঝলাম, বরাহমিহিরের বর্ণনা মিথ্যে নয়। আমার চোখের সামনেই যেন একটা কালো পাহাড় খসে পড়ল মক্কার কাবা-য়। পাথরটা লাল—কিন্তু ধুলো, ধোঁয়ায় কালচে মেরে রয়েছে। মুসলমান

ধর্মের চেয়েও প্রাচীন এই কাবার কালো পাথরের রহস্য কিন্তু কেউ জানল না···পরবর্তীকালে দেখলাম দেবতা জ্ঞানে পূজিত হচ্ছে বিশাল কৃষ্ণশিলা, দেখলাম মহম্মদ স্বয়ং তাঁর জীবনের প্রথম ভাগে বন্দনা করছেন শুক্রকে। আজও কিন্তু মুসলমান কিংবদন্তী অনুসারে সবার বিশ্বাস, এ পাথর এসেছে শুক্র থেকে। আমি তা দেখেছি! আমি তা দেখেছি! বিশ্বাস করো আমার ছোট্ট বন্ধুরা—কাবা-রহস্য আর কোনো রহস্য নয় আমার কাছে।

মঙ্গল, শুক্র, পৃথিবীর লড়াই চলল দীর্ঘকাল ধরে। টানা হ্যাঁচড়ায় বাফিন আয়ল্যাণ্ড থেকে মেরু সরে এল বর্তমান অবস্থানে। সাইবেরিয়া মহাদেশ চালান হয়ে গেল মেরুপ্রদেশে। সেইসঙ্গে পালে পালে ম্যামথ মারা গেল অকস্মাৎ অক্সিজেনহীনতা আর প্রলয়ংকর বজ্রপাতে—জমে শক্ত হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শুধু ম্যামথ নয়, আরও অনেক প্রাণীরও হাল হ'ল একই রকম—আজও তাদের তুহিন-কঠিন অবিকৃত দেহ আবিষ্কৃত হচ্ছে মেরু-প্রদেশে—যে অঞ্চলে চোখের সামনেই স্থানান্তরিত হতে দেখলাম আটশ গৃহ সহ বিশাল একটা শহরকে—আলাস্কার পয়েণ্ট হোপ প্রহেলিকার সৃষ্টি কিন্তু সেদিন থেকে—প্রহেলিকার সমাধান ঘটল আমার বিহ্বল চক্ষুর সামনেই।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে উলুখড়ের প্রাণ তো যাবেই। পৃথিবীবাসীদের দুর্দশার জন্যে কেঁদে আর লাভ নেই। কিন্তু রাজারাও লুঠপাট থেকে বাদ যায় না। লুঠপাটের জন্যেই তো যুদ্ধ, যুদ্ধের জন্যেই তো লুঠপাট। তাই পৃথিবী ছিনিয়ে নিল শুক্রের কার্বন মেঘ, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের কিছুটা। মঙ্গলই বা কম যায় কেন, শুক্রের ল্যাজ থেকে কার্বন কেড়ে নিয়ে বানিয়ে নিলে নিজের মেরুকিরীট। শুক্র বেচারী পুচ্ছহীন হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালটে নিল গতিপথ—গোল হয়ে ঘুরতে লাগল সূর্যের চারদিকে। যুদ্ধে জিতে গেল মঙ্গল। তাই দেশে দেশে যুদ্ধদেবতা মঙ্গলের তরবারি কল্পনার এত বন্দনা।

মুহ্যমানের মত এই দৃশ্য দেখতে দেখতে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র যে টাইম মেশিনকে হু-হু করে বর্তমান পেরিয়ে আরও ভবিষতের গর্ভে নিয়ে যাচ্ছেন টের পাইনি, টের যখন পেলাম, তখন সৌর-পরিবারের শেষের সেদিন শুরু হয়ে গেছে, দেখলাম, নেপচুনের উপগ্রহ

হতে হতে বেঁচে গেল প্লুটো। তারপরেই প্লুটোর সঙ্গে সংঘর্ষ লাগল—না, নেপচুনের নয়—নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটনের সঙ্গে—আয়তনে যে প্লুটোর এক তৃতীয়াংশ। ঝাঁকে ঝাঁকে ধূমকেতু ছুটে গেল দিকে দিকে। এসে পড়ল বৃহস্পতি উপগ্রহদের ওপর—ষষ্ঠ আর সপ্তম উপগ্রহ এমনিতেই উল্টোপাল্টা কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছিল—ধূমকেতুদের ধাক্কায় তারা ছিটকে গেল সৌরজগতের ভেতর দিকে—একটা এসে সটান আছড়ে পড়ল পৃথিবীর ওপর……

আর তার পরেই…কতকাল পরে সে খেয়াল নেই…বিস্ফোরিত হল স্বয়ং সূর্যদেব।

এইচ জি ওয়েলস্ তাঁর 'টাইম মেশিন' উপন্যাসের অন্তে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সূর্যের নিভে যাওয়া—শেষের সেদিন নাকি সেই দিনটাই। কিন্তু তা ভুল—একেবারে ভুল!

সূর্য সুপারনোভা হয়ে গেল। নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটল। মৃত্যু ঘটল সমস্ত সৌরপরিবারের।

জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম আমি।

চোখ মেললাম।

সেই পরিচিত ল্যাবরেটরী। পুরোনো আকাশ। চেনা পৃথিবী।

আর টাইম মেশিন। উজ্জ্বল। অটুট। স্তব্ধ।

ইলেকট্রিক কেটলিতে চায়ের জল ঢালছিলেন প্রফেসর। ঘাড় ফেরালেন আমার দিকে।

"দেখলে?"

"দেখলাম। কিন্তু বুঝলাম না।"

"এখনো বুঝতে বাকী?"

"হ্যাঁ, এখনো বুঝতে বাকী।"

"কি বুঝতে বাকী জানতে পারি?"

"এখনো যা বলেন নি। কৌ জিজ্ঞেস করেছেন, বলেন নি। আমি জিজ্ঞেস করেছি, বলেন নি।"

"কি বলো তা?"

"ভাইরাস-হুজুরকে তার ডেরায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তার ডেরার

ঠিকানাটা কিন্তু পেট থেকে বার করেন নি।"

"তা করিনি। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবো বলেই করিনি।"

"দেখিয়েছেন?"

"আলবৎ দেখিয়েছি।"

"আমি দেখিনি।"

"চোখ থাকতে অন্ধ বলেই দ্যাখোনি।"

"আঃ প্রফেসর, প্লীজ, আর মুখনাড়া দেবেন না।"

"দেবো না মানে? একশবার দেবো, হাজার বার দেবো। অন্ধ কোথাকার! ড্যাবডেবে চোখ দুটো দিয়ে দেখলে না শুক্রের ল্যাজ থেকে জীবাণু ছড়িয়ে গেল পৃথিবীময়!"

"শুক্রের ল্যাজ থেকে জীবাণু! কই দেখিনি তো!"

আমার মুখের অবস্থা দেখেও সদয় হলেন না প্রফেসর। ঝাঁ ঝাঁ করতে করতে বললেন—"দেখবে কি করে? জীবাণু কি দেখা যায় যে দেখবে? কিন্তু পেটে একটু বিদ্যে থাকলে ব্যাপারটার জন্যে চোখ খোলা রাখতে পারতে। ল্যাজের ঝাপটায় পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল কি শুধু ধোঁয়া ধুলো মেঘ পাথরের জন্যে? সেই সঙ্গে মাছি কীটপতঙ্গের উৎপাতটা বেড়ে গেল কিভাবে, সেটা দেখলে না? ঝাঁকে ঝাঁকে হঠাৎ তারা এল কোত্থেকে!"

আমি খাবি খেলাম বারকয়েক। স্বরযন্ত্র বিকল হল বিমূঢ় বিস্ময়ে। বলেন কি প্রফেসর! মাছি কীটপতঙ্গ ধূমকেতুর পুচ্ছ থেকে!

বাগ-বৈদগ্ধ তখন পুরোদমে চলছে—"আধুনিক জীবতত্ত্ববিদরা মশগুল হয়ে আছেন একটা ধারণা নিয়ে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবরা নাকি আবির্ভূত হয়েছিল পৃথিবীর বাইরে থেকে—আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাশূন্য থেকে। আলোর চাপে তারা এসে পড়েছে পৃথিবীতে। নক্ষত্রলোক থেকে সজীব প্রাণীর আগমন সম্পর্কিত ধারণা তাই নতুন কিছু নয়—তা সত্ত্বেও তুমি ভূত দেখার মত চমকে উঠলে। আশ্চর্য! শুককীটের সংক্রমণে পৃথিবী আক্রান্ত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে—এই ধারণা নিয়ে অনেকে অনেক অনেক অনুমান করেছে। এমন কি তোমার মত কল্পবিজ্ঞান লেখকরা অনেক উদ্ভট কাহিনীও ফেঁদে বসেছে। কিন্তু এটা তো ঠিক যে অক্সিজেনহীন পরিবেশে প্রচণ্ড উত্তাপ আর ঠাণ্ডার মধ্যে ছোট ছোট কীটপতঙ্গের আর শুককীটের টিঁকে থাকার ক্ষমতা দেখে এহেন অনুমিতির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ

থাকা উচিত নয় ? আগমন তাদের শুক্র থেকে, এটাই বা অসম্ভব হবে কেন ? শুক্রের জন্ম তো বৃহস্পতির গা থেকে—তাহলে সেখানেই বা ক্ষতিকারক পোকামাকড় থাকবে না কেন ?''

নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করলাম।

''ভোরের শুকতারা সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে শয়তানের নানা নামের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে দেশবিদেশের লোককথায়। বাইবেলের ত্রিকালজ্ঞরা যে দেবতাকে দুচক্ষে দেখতে পারেনি, তার নাম দিয়েছে 'বাল্'। ক্যানাইট্স-য়ের সেই দুষ্ট দেবতা বাল্-য়ের আর এক নাম বীলজিবাব বা বালজিভাভ। 'বাল্' মনে কি জানো ?''

''না।''

''মাছি।''

''অ।''

''ফিলিসটানদের দেশ ইক্রনে মাছের দেবতা বালজিভাভের একটা মন্দির আছে। ইরানের বুন্দাহিস গ্রন্থে আছে দুষ্ট উপদেবতা আহরিমান নাকি গা-ঘিন ঘিনে প্রাণীদের ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল পৃথিবীতে। বাইবেলে লেখা আছে মাছি, উকুন, মশা, ডগফ্লাই, পঙ্গপাল, ব্যাঙেরা ছারখার করে দিয়েছিল মিশর। অতবার প্লেগ শুরু হয়েছিল তো ঐ কারণেই। আরব দেশের অ্যামালিকাইটরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল অত্যন্ত ছোট্ট পিঁপড়েদের আক্রমণে। পৃথিবী যখন অন্ধকার হয়ে গেছিল, মেঘ যখন ঝুলে পড়েছিল, অগুন্তি জঘন্য কদর্য পোকা মাকড়ে পৃথিবী তখন ছেয়ে গেছিল। ড্রাগনফ্লাই আর সাপের উৎপাতও বেড়েছিল।''

আমতা আমতা করে বললাম—''পৃথিবীর তাপ বাড়লে পোকামাকড়দের উৎপাত তো বাড়বেই।''

''ইডিয়ট। মরুভূমিতে যখন ইলেকট্রিক ঝড় 'খামাসিন' শুরু হয়, তখন আশেপাশের গ্রামগুলোতে জঘন্য পোকামাকড়ের সংখ্যা বেড়ে যায় ঠিকই, কিন্তু ভূগোলকের সব দেশের মানুষ শুক্র গ্রহের সঙ্গে মাছির সম্পর্ক আবিষ্কার করেছে কেন বলো ? কেন বুন্দাহিসে আঁধার দেবতা আহ্‌রিমানকে মাছির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ? কেন মধ্য ব্রেজিলের বোরোরো মানুষরা শুক্রগ্রহকে বালুকা মাছি বলে ? কেন মধ্য আফ্রিকার বান্টু উপজাতিরা আকাশ থেকে আগুন নিয়ে এসেছিল বালুকা মাছি ? কেন মেক্সিকোর

মানুষরা বিশ্বাস করত ধূমকেতু সংক্রমণ ছড়িয়ে দিয়ে যায় জীবদেহে—। সেই ভয়ে চিমনি ঢাকা দিয়ে রাখত পাছে নক্ষত্রলোকের আগন্তুকদের সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে উৎপাত না ঢুকে পড়ে ? পৃথিবীর দুই গোলার্ধেই শুক্রগ্রহের সঙ্গে মাছির এই তুলনা দেখে কি মনে হয় না, মাছিদের জন্ম শুধু পৃথিবীর উত্তাপেই নয় অন্যান্য পোকামাকড়ের মত—অন্য গ্রহের আগন্তুক তারা ? এবং সেই গ্রহ ঐ শুক্রগ্রহ ?"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," আমতা আমতা করে বললাম—"কিন্তু ভাইরাস-হুজুর তো আর মাছি নয়।"

"কিম্ভু লার্ভা। শূক কীট। জীবাণু। ভাইরাস। যা খুশী তাই বলতে পারো। বহু বছর সে ভেসে ভেসে বেরিয়েছে মহাশূন্যে। তাপ আর শৈত্যে টিঁকে গেছে। কি আছে বৃহস্পতিতে ? কেউ তা সঠিক জানে না—কিন্তু প্রাণ যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। নইলে পেট্রোলিয়াম থাকবে কেন ? সেখানকার পেট্রোলিয়াম নিয়েই কমেট টাইফন ঢেলে দিয়ে গেল পৃথিবীতে। পেট্রোলিয়াম যদি জৈব বস্তুর দেহাবশেষ থেকে উৎপন্ন হয়—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পোকামাকড় কল্পনা করা কি অন্যায় ? অন্য নক্ষত্রলোক থেকেও এসে থাকতে পারে ভাইরাস-হুজুর, কিন্তু আমি প্রথম থেকেই আঁচ করেছিলাম এই সৌরজগতেই তার আদি নিবাস—টাইফনের ল্যাজের সঙ্গে ছিটকে গিয়ে ভেসে ভেসে বেরিয়েছে মহাশূন্যে। তাই তাকে জ্যান্ত নিয়ে গিয়ে তার শোচনীয় দশাটা দেখাতে চেয়েছিলাম বৃহস্পতি আর শুক্রে তার সাঙ্গপাঙ্গদের। তাই তোমাকে দেখালাম বিশ্ববিপর্যয়, জ্যোতিষ্ক যুদ্ধ, শুক্রের জন্ম, সূর্যের বিস্ফোরণ। এখন বাকী রইল আর একটা কাজ না, না, দুটো কাজ।"

"কী ?" জিজ্ঞেস করলাম সন্দিগ্ধ কণ্ঠে।

"বৃহস্পতি বেড়িয়ে আসতে হবে। আর—"

"আর ?"

"রক্তরাঙা গ্রহ মঙ্গল থেকেও উৎপাতরা পৃথিবীতে হানা দিয়েছিল কিনা দেখে আসতে হবে—অনেকদিক দিয়ে পৃথিবীর মতই ছিল মঙ্গল এককালে—শুক্রের ধাক্কা খেয়ে হয়ত এখন মরা গ্রহ। তাই—"

"না !"

ইলেকট্রিক কেটলির ফুটন্ত জলের বাষ্পের দিকে অন্যমনস্ক চোখে চে রইলেন প্রফেসর।